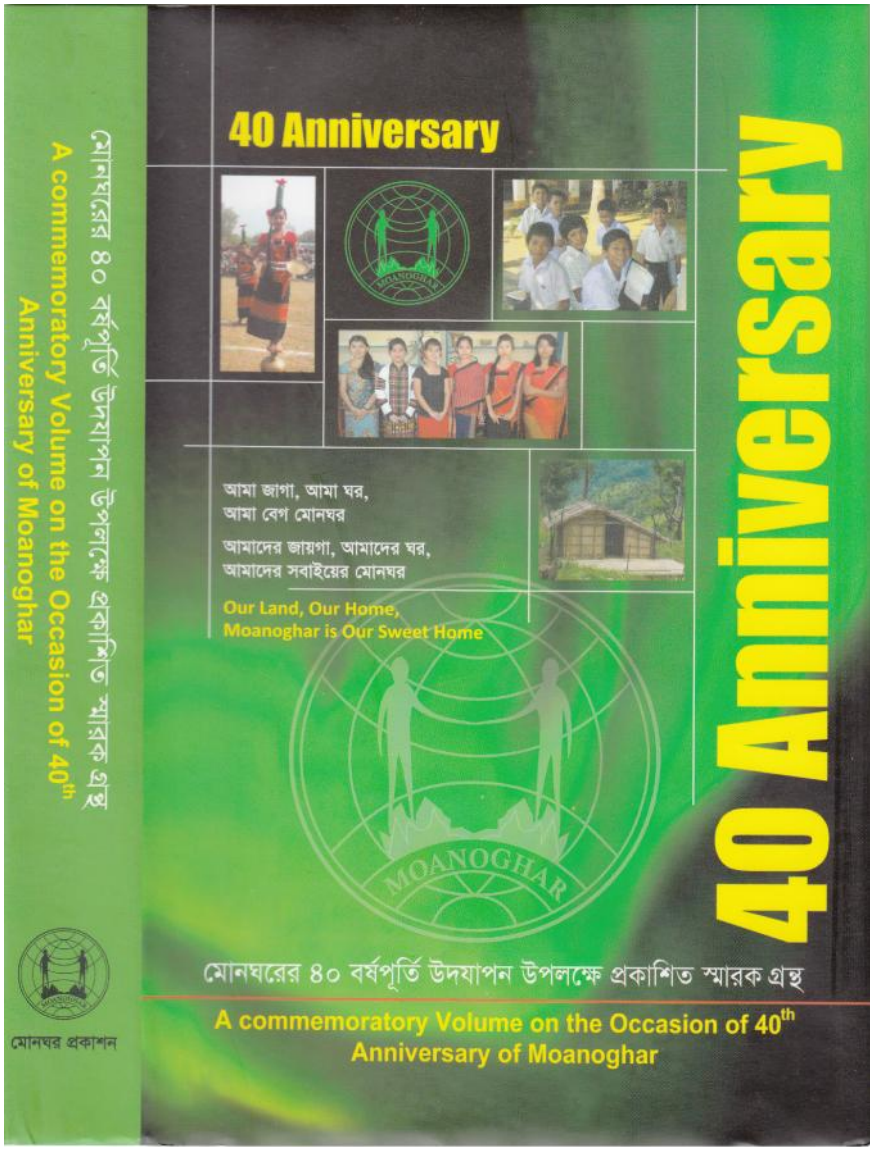

Cover Page(front)

মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতামন্ডলী

সদ্ধর্মাদিত্য শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথের

শ্রীমৎ বিমল তিষ্য মহাথের

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথের

শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথের

স্বাগতম

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভৌগোলিক, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরম বৈচিত্র্যপূর্ণ। মোনঘর এই বৈচিত্রেরই ধারক এবং বাহক। মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত এই সংকলনটিতে এই বৈচিত্র্যকেই বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। লেখাগুলো চিন্তাশীল মানস থেকে রচিত। এই লেখাগুলির মাধ্যমে পাঠক মোনঘরের কর্মকান্ড ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন, সর্বোপরি পাবেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ ও এগুলোর উত্তরণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ চিন্তার খোরাক।

ঐতিহ্যবাহী পোষাকে মোনঘরের ছাত্রীবৃন্দ

Cover Page(Inner)

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ

A Commemoratory Volume on the Occasion of 40th Anniversary of Moanoghar

মোনঘর প্রকাশন

মোনঘর, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশকাল:
১৬ জানুয়ারী ২০১৫ খ্রী:
৩ মাঘ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক:

মোনঘর প্রকাশন
মোনঘর
রাঙ্গাপানি, রাঙ্গামাটি-৪৫০০
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ।
ফোন:+৮৮ ০৩৫১ ৬১০৪৩
E-mail: moanoghar@gmail.com
www. moanoghar.org

স্বত্ব:
মোনঘর প্রকাশন, মোনঘর, রাঙ্গামাটি।

প্রচ্ছদ:
বিমলেশ্বর চাকমা

শব্দ বিন্যাস ও মুদ্রণ:
ওয়ার্ক স্টেশন
৮ নং সিরাজুদ্দৌলা রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
workstationbdctg@yahoo.com/@gmail.com

মূল্য: ৪০০.০০
US$ 12.00

সম্পাদকীয় পরিষদ

কীর্তি নিশান চাকমা	প্রধান সম্পাদক
শশাংক বিকাশ চাকমা	সদস্য
বিপ্লব চাকমা	সদস্য
অশোক কুমার চাকমা	সদস্য
ঝিমিত ঝিমিত চাকমা	সদস্য
শিশির চাকমা	সদস্য
অনুমোদর্শী দেওয়ান	সদস্য
চঞ্চু চাকমা	সদস্য
নন্দ কিশোর চাকমা	সদস্য
সুপর্ণা চাকমা	সদস্য

ঞ্জুঅ্যাগ্ন ৎঅ

অঞ্জ ঞৎ অঞ্জ ঝাগ্ন,
অঞ্জ ৎৎৎ ঞ্জুঅ্যাগ্ন
ঝ্যাঝ ঝ্যাঝ অঁঝ ৎৎ্যা
ৎৎৎ্ঞঅ ন্যঞ্জি ৎৎ্যা ৎৎ্যঅঁ ।।

অঁঝ ৎৎৎ্যে ঝ ঞঅ্ঞ,
ৎৎৎ ন্যগ ৎৎৎ ঞ্জগ ।।

অ্ঞ ৎ্যৎদগ্ন ৎদগ্নি
ন্যঞ ৎৎৎ ন্যঞ ৎগ্নি
ঞদ্ব্যৎদে ন্যৎ ৎৎ্যৎ
অ ৎৎৎ্যৎ ন্যঅ ৎগ্ন ।।

ৎ্যৎদ ঞ্জি ঝ্যন্ন ৎৎ্যৎ
ঝাগ্নৎ ঝ্যন্নৎ ৎগ্ন ঞ্জ্যৎ
ঝাগ্নৎ ন্যঞ্জ ন্যগ্নিৎ
ঞঅ্ঞ্যৎ ঞঅ্ঞ ঞগ্ন ।।
ঞ্জুঅ্যাগ্ন ৎঅ
অঞ্জ ঞৎ অঞ্জ ঝাগ্ন,
অঞ্জ ৎৎৎ ঞ্জুঅ্যাগ্ন
ঝ্যাঝ ঝ্যাঝ অঁঝ ৎৎ্যা
ৎৎৎ্ঞঅ ন্যঞ্জি ৎৎ্যা ৎৎ্যঅঁ ।।

ঞঅেৎ্যে ঃ ঝ্যৎগ্ন অঁঞ্জ (অঅদঅ)
ঝ্যঞ ঃ ঞঅঞিন্ন ৎ্যৎঅ

মোনঘর সংগীত

আমা জাগা, আমা ঘর
আমা বেগ মোনঘর
সুঘে দুঘে ইদু থেই
বেক্কুন আমি ভেই ভেই।।

ইদু থেলে এ জনম
পেবং আর গমে পহ্‌র।।

নম বুদ্ধর পথ ধরি
এজ বেগে হ্যাম গরি
মধ্য পধে হ্যাদি যেবং
ন থেবদে হ্‌ন দর।।

বুদ্ধ পুজি সুঘ পেবং
সর্ব দুক্‌খ পার অবং
সর্বকালত তরিবং
পূন্য পেবং জনম ভর।।

আমা জাগা, আমা ঘর
আমা বেগ মোনঘর
সুঘে দুঘে ইদু থেই
বেক্কুন আমি ভেই ভেই।।

কথা: সুগত চাকমা(ননাধন)
সুর: রঞ্জিত দেওয়ান

মোনঘর সংগীত (বাংলা অনুবাদ)

আমাদের জায়গা, আমাদের ঘর
আমাদের সবাইয়ের মোনঘর
সুখে-দুঃখে আমরা এখানে সবাই বাস করি
সবাই আমরা পরস্পরের ভাই-বোন।।

এখানে পড়াশুনা করে আমরা সবাই
জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হবো।।

বুদ্ধের পথ অনুসরণ করে
আমরা সবাই মিলে কাজ করি
আমরা সবাই মধ্য পন্থা অনুস্মরণ করবো
এবং কোন কাজে ভয় পাবো না।।

বুদ্ধকে পূজা করে সুখ পাবো
সকল বাধা অতিক্রম করবো
সর্বকালে বেঁচে থাকবো
সারা জীবন পূণ্য লাভ করবো।।

আমাদের জায়গা, আমাদের ঘর
আমাদের সবাইয়ের মোনঘর
সুখে-দুঃখে আমরা এখানে সবাই বাস করি
সবাই আমরা পরস্পরের ভাই-বোন।।

কথা: সুগত চাকমা(ননাধন)
সুর: রঞ্জিত দেওয়ান

লেখক কর্তৃক বাংলা অনুদিত

Moanoghar Anthem

Our land, our home
Moanoghar is the home to all
We live here amidst hardships and happiness
We all are brothers & sisters in the community

If we live here(together)
We shall all be enlightened

By following the path shown by the Buddha
Let’s all strive for the betterment of many
We shall follow the middle way
And shall have no fear

We shall find happiness if we respect principles of the Buddha
We shall overcome all sufferings
We shall endure all challenges of out time
And we shall find bliss in our life

Our land, our home
Moanoghar is the home to all
We live here amidst hardships and happiness
We all are brothers & sisters in the community

Text: Sugata Chakma(Nonadhan)
Music: Ranjit Dewan

সম্পাদকীয়

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান **'মোনঘর'**। এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনের প্রধান পদ্ধতি জুমচাষের ফসল ঘরে তোলার জন্য অস্থায়ী স্থাপনা **'মোনঘর'** নামের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিষ্ঠানের নাম। এ অর্থে মোনঘর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্খা'রও প্রতীক।

মোনঘরের প্রতিষ্ঠা ১৯৭৪ সালে। প্রতিষ্ঠাতারা সবাই বৌদ্ধ ভিক্ষু। কিন্তু সংকীর্ণ ধর্মীয় নিয়মে তাঁরা মোনঘরকে কোনদিনই পরিচালিত করেন নি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মোনঘরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু সকল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠিভূক্ত শিশুদের জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া এবং এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন ও ধারণ করা এবং বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। গৌতম বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্র ছিল এক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান শক্তি।

মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তির অংশ হিসাবে প্রকাশিত এই প্রকাশনার প্রথম অংশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, আদিবাসী সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে লেখা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে মোনঘর ও তার আদি প্রতিষ্ঠান **" পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম"** এর বিষয়ে বিভিন্ন লেখা এবং প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও পরিচালকদের স্মৃতিচারণা ও স্বাক্ষাৎকার। এই লেখাগুলো শুধুমাত্র মোনঘরের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং দর্শনকে জানার ক্ষেত্রেই সহায়ক নয়, তা' বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক সময়ের উত্তাল ইতিহাসেরও স্বাক্ষ্য।

প্রতিশযশা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের এক করুণ ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি লিখেছিলেন। আমরা তাঁর কাছে যোগাযোগ করেছিলাম এই সংকলনের জন্য একটি লেখা দিতে। তিনি পুরো উপন্যাসটি পুন:মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমাদেরকে চিরতরে বাধিত করেছেন।

সূচীপত্রঃ

প্রথম অংশ
পার্বত্য চট্টগ্রাম, ইতিহাস, জনগোষ্ঠি এবং আর্থ-সামাজিক চিত্র

১. পাদি সাহ্বাং: চাকমা ঐতিহ্যের জীবন বৃক্ষ ১৫
- কবিতা চাকমা

২. বাংলা হরফে চাকমা ভাষা উচ্চারণের সমস্যা ও তার সমাধান ২৫
- দেবাশীষ ওয়াংঝা

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন নুতনভাবে সাংস্কৃতিক গণজাগরণ জরুরীভাবে প্রয়োজন: জাক (Jum Aesthetic Council:JAC) এর প্রতিষ্ঠাতামন্ডলী ও নতুন প্রজন্মের সদস্যদের সাথে স্বাক্ষাৎকার ৩৩

৪. আমি ও আমার পৃথিবী(কাপ্তাই লেইক, পরবর্তী পরিবেশ ও পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম) ৪৭
- অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬৫
- শান্তি কুমার চাকমা

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নকে কিভাবে দেখতে চাই? ৭১
- প্রশান্ত ত্রিপুরা

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও এর নির্মূলে আমাদের করণীয় ৭৯
- ঝুমা দেওয়ান ও সিনোরা চাকমা

৮. The significance of oral traditions, homeland, identity and culture for Chakma people ৮৯
- Arshi Dewan

৯. Land, forest & indigenous peoples ৯৯
- Prof. Mong Shanoo Chowdhury

১০. An Introduction to the early history of the Tribal people of Chittagong Hill Tracts from 10th to 18th Century ১০৯
- Sugata Chakma

১১. Women Negotiating Change: the structure and transformation of gendered violence in Bangladesh ১২১
- Meghna Guhathakurta

১২. Children, Peace Initiative and Activism ১৪৩
- Bina D'costa

১৩. Walking to Feed the Hungry ১৫৯
- Ven. Bhikkhu Bodhi

দ্বিতীয় অংশ

মোনঘর ও প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি

১. The Value of Moanoghar ১৬৯
- Mujin Sunim

২. My Discovery of Non-Violence, from Vietnam War to Moanoghar and Chittagong Hill Tracts ১৭৩
- Pierre Marchand

৩. My beloved Chittagong Hill Tracts ১৮১
- Sueti Zadjian

৪. A personal journey to the discovery of the Chittagong Hill Tracts and its peoples ১৯৩
- Elisabeth and Paul Nicholas

৫. A Family Reminisces..... ১৯৯
- Martine and Bernard Zadjian

৬. Adoption of a Boy from Chittagong Hill Tracts; testimony of a French family ২১১
- Marie-Claude and Francois Rubin

৭. সদ্ধর্ম চেতনা ধারণ করতে হলে সাধারন শিক্ষা অপরিহার্য: সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরর সাথে স্বাক্ষাৎকার ২১৭

৮. মোনঘরে সোনালী দিনগুলো ২২৫
- ডা: পরশ খীসা

৯. আমার স্মৃতিতে গাঁথা এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান-"মোনঘর" ২৩৭
- ছানোঅং চাক

১০. এক রূপোলি নদী (উপন্যাস) ২৪৩
সেলিনা হোসেন

লেখক পরিচিতি: ৩০১

প্রথম অংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম: ইতিহাস, জনগোষ্ঠি, সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্য এবং আর্থ-সামাজিক চিত্র

পাদি সাহ্‌বাং: চাকমা ঐতিহ্যের জীবন বৃক্ষ

কবিতা চাকমা

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পে (বেন) 'পাদি সাহ্‌বাং' বৃক্ষটির আবেদন জীবন-বৃক্ষ (Tree of Life) হিসেবে। জীবন-বৃক্ষ সম্পূর্ন প্রতীকধর্মী এক বৃক্ষ।[১] এ প্রতীকে বৃক্ষ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। বৃক্ষ ছায়াদানকারী, ফুল ও ফল দানকারী হিসেবে জীবন লালন করে। বৃক্ষ পৃথিবী মন্ডল পরিচ্ছন্ন রেখে নিশ্চয়তা দেয় সুষ্ঠু, ভারসাম্যপূর্ন পরিবেশের ও জীবনের। পৃথিবী যদি বৃক্ষহীন হত তবে জীবনহীন এক পৃথিবীর তুল্য হত। জীবনের সাথে নিবিড় সম্পর্কের বৃক্ষকে বিশ্বের বহু ঐতিহ্যে প্রাচীনকাল থেকে কখনও মাতৃরূপে, দেবী ও দেব রূপে পূজা করেছে, স্তুতি করেছে কথায়, গীতে, শাস্ত্রে ও কাব্যে। বৃক্ষের জীবন সম্পৃক্ত শক্তির তুলনা কখনও হয়েছে সূর্যের সাথে। এক্ষেত্রে জীবন ও আলো ব্যবহৃত হয়েছে সমার্থক অর্থে, একে অপরের পরিপূরক অর্থে। সূর্যের অমিত তেজে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার, বৃক্ষ পল্লবিত হওয়ার, ফুল প্রস্ফুতিত ও ফল বিকশিত হওয়ার নিয়মকে কেন্দ্র করে জীবনের উপমা হয়েছে সূর্য। সূর্য তার জ্যোতি ছড়িয়ে জীবন-বৃক্ষতে কখনও মূর্ত করেছে আলোময় জ্ঞান-বৃক্ষরূপে। দক্ষিণ এশিয়ায়, স্বল্প পরিচিত ও আলোচিত চাকমা ঐতিহ্যে শিল্প ও আচারেও জীবন-বৃক্ষ রূপ পেয়েছে বিভিন্ন নামে ও মাধ্যমে। এ প্রবন্ধে চাকমা ঐতিহ্যের শিল্প ও আচারের জীবন-বৃক্ষকে বেন শিল্পের 'পাদি সাহ্‌বাং' নক্সাকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হল।

দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যে জীবন-বৃক্ষ :

দক্ষিণ এশিয়ার সব প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে জীবন-বৃক্ষ সমাদৃত হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ঐতিহ্যে জীবন-বৃক্ষকে নিখুঁত আঁকা হয়েছে ভাস্কর্যে, তুলিতে, লেখনীতে, এমনকি সূচিকর্মে। বিভিন্ন রূপে ও নামে জীবন-বৃক্ষ শিল্পীর হৃদয়ে ও হাতে নন্দিত হয়েছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার শিল্পীরা জীবন-বৃক্ষকে আশ্চর্য নিপুনতায় খোদাই করেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ঐতিহ্যে জীবন-বৃক্ষ শুধু খোদাই হয়নি, প্রাণ পেয়েছে ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, তুলিতে, ধুলিতে, ধর্মশাস্ত্রে, শিল্পশাস্ত্রে ও সুঁই সুতোয়। সারা ভারতে মন্দির স্থাপত্যে জীবন-বৃক্ষ অতি সুচারু কারুকাজে খোদাই হয়েছে। বাংলার মন্দিরে ও বিহারে টেরাকোটায় এ বৃক্ষ

ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমে বৃক্ষটি ফুটে উঠেছে কখনও বটবৃক্ষ, কখনও তমাল, পারিজাত, কল্পতরু বা অন্য কোন স্বর্গলোকের বৃক্ষ অবলম্বনে।

স্থাপত্যে জীবন-বৃক্ষ তৈরী হয়েছে সুদৃশ্য স্তম্ভ হিসেবে। হিন্দু স্থাপত্যে এ বৃক্ষকে পাওয়া যায় 'সূর্য-স্তম্ভ' বা 'অরুন-স্তম্ভ' হিসেবে। এ স্তম্ভ আছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে, কোনারকের সূর্য মন্দিরে। সূর্য স্তম্ভের ডিটেইল আঁকা হয়েছে তালপাতার পান্ডুলিপির বিখ্যাত শিল্পশাস্ত্র 'শিল্প প্রকাশ' এ। এ ধরনের প্রতিটি স্তম্ভ চুড়ায় সুর্য মুকুট হয়ে আছে। স্থাপত্যের সূর্য স্তম্ভ যে জীবন-বৃক্ষের অপর রূপ তা বর্নিত আছে বহু প্রাচীন শাস্ত্রে। যেমন আছে মৈত্রী উপনিষদের চতুর্থ খন্ডের, চতুর্থ সূত্রে।[২] এই সূত্রে ঋষি-কবি জীবন-বৃক্ষকে বটবৃক্ষ সাজে রূপায়িত করেছেন একপায়া সূর্য হিসেবে। ভারতে বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরে বটবৃক্ষের পূজা হয় 'অর্ক-বট' বা 'সূর্য-বট' নামে। 'সূর্য তন্ত্র' বা 'সূর্য তন্ন বিস্তার' নামক শাস্ত্রেও অর্ক-বটের উল্লেখ আছে। এইভাবে জীবন-বৃক্ষ সূর্য-বৃক্ষ নামে "এক পায়া সূর্য" হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধ ঐতিহ্যেও জীবন-বৃক্ষ বট-বৃক্ষ আদলে রূপায়িত হয়েছে প্রভাদানকারী বৃক্ষ হিসেবে: এ ঐতিহ্যে জীবন-বৃক্ষ শুধু জীবন সঞ্চারী মহীরুহ নয়, আলো সঞ্চারী, বোধ সঞ্চারী 'বোধি-বৃক্ষ' (Tree of Awakening) এর তলে ধ্যানমগ্ন গৌতম বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে অর্জন করেছিলেন সম্যক সম্বোধি। জীবন-বৃক্ষ বৌদ্ধ স্থাপত্যে বোধি-বৃক্ষ রূপে ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয়েছে সাঁচী, অমরাবতী ও বুদ্ধগয়ার স্তুপার দেয়ালে। এছাড়া জীবন-বৃক্ষ এসেছে চক্র-স্তম্ভ হিসেবে। যেমন সারনাথ, সাঁচী ও অমরাবতীতে চক্র-স্তম্ভ ও সূর্য-স্তম্ভের নন্দন-কলাও গঠন একই ধরনে চক্রের প্রতিটি অংশ সূর্য রশ্মির মত একটি মধ্য বিন্দু থেকে উৎসারিত হয়ে একটি বহিবৃত্তে আবদ্ধ হয়ে স্তম্ভের শীর্ষে শোভা পেয়েছে। সম্রাট অশোকের আমলে, খ্রিষ্টপূর্ব দু'শ বছর আগে চক্র স্তম্ভের সার তীর্থ স্থানের নির্দেশ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সান্তাল ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও নেপালের নারীরা জীবন-বৃক্ষকে এঁকেছেন ধুলিচিত্রের আল্পনায়। বাঙালী, বিহার, উড়িশ্যা ও বহু অঞ্চলের নারী জীবন-বৃক্ষকে প্রাণ দিয়েছেন সুঁই-সুতোর কাঁথায়। পন্ডিত স্টেলা ক্রামরিস অনায়াসে বাঙালী নারীর সৃষ্টি জীবন-বৃক্ষকে কাঁথার শিল্পে চিনে নিয়েছেন।[৩]

চাকমা বেন-শিল্পে পাদি সাহ্‌বাং :

বেন চাকমাদের এক প্রাচীন শিল্প যার ব্যবহারিক সংজ্ঞা হচ্ছে 'কোমর তাঁত' (Backstrap Loom)। বেন শুধু চাকমা ঐতিহ্যে নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সব আদিবাসী ও দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় বহু জাতীর ঐতিহ্য। 'বেন' শব্দটি একটি প্রাচীন চাকমা শব্দ। চাকমা শব্দ গঠনের এক ধারা অনুয়ায়ী বেন এর ধারন ও লালনকারী বা অধিকারী নারীকে বলা যায় ***'বেনবি'***, 'বি' প্রত্যয় যোগে নারী বিষয়ক শব্দ, বিশেষ করে নাম গঠনের রীতি রয়েছে চাকমা ধারায়। যেমন নাম দোলবি

(সুন্দরী, দোল/সৌন্দয্যের অধিকারী, রাঙাবি(রাঙামেয়ে, রাঙা গায়ের রঙের অধিকারী), কালবি(কালোমেয়ে) ইত্যাদি। বেনবি-র পাত্রী হিসেবে যে সমাদর রয়েছে তা বুঝা যায় একটি ছড়ার মাধ্যমে।" ধুরুজ ধুরুজ বেন বুনং/কার্বারী ঘরত বৌ পরং" অর্থাৎ " ধুরজ ধুরজ বেন বুনি/কার্বরীর(গ্রাম প্রধান) ঘরে বৌ বনি"।[৪]

প্রসঙ্গক্রমে 'বেনবি' শব্দটি এক বৌদ্ধ সিদ্ধ, চর্যাকবি তান্তিপাদ[৫] বা Tha-ga ব্যবহার করেছেন, বা মতান্তরে 'তান্তী' (তাঁতী) নামের চর্যাপদ বা চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে।[৬] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবার গ্রন্থাগারে আবিস্কৃত চর্যাগীতিকোষ বা 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' বা 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' পুথির ৫১টি পদ বা গীতিকার মাঝে 'তান্তী' হচ্ছে ২৫ নং পদ। এ গীতিকোষের রচনাকাল বিভিন্ন পন্ডিতের গবেষণায় এক ব্যাপক অনুমিত সময়, খ্রীষ্টিয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপৃত। তবে তান্তীপাদ যদি এ পদের রচয়িতা হন তবে তার সময় নবম শতাব্দী। তান্তীপাদ বা তান্তীপা ছিলেন মহান আচার্য কাহ্নপাদ/পা'র শিষ্য। কাহ্নপাদের রাজা দেবপালের সময় ৮৪০ সালের সময়কাল বলে অনুমিত।[৭] এভাবে 'বেন' শব্দটির চার্যাসাহিত্যে উদ্ভব নবম শতাব্দীতে বলে অনুমান করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় 'বেন' শব্দটির সমসাময়িক ব্যবহার নেই। বাংলা ভাষার মত দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য ভাষা, বিশেষত: যে সব ভাষা চর্যাগীতিকোষের ভাষাকে তাদের প্রাচীন ভাষা বলে আখ্যায়িত করেছে যেমন মৈথালী, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী ও নেপালী ভাষায় ব্যবহৃত হয় কিনা জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে।[৮] চাকমা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে (১৬০০-১৯০০)[৯] 'বেন' এর উল্লেখ করা হয়েছে বহু রচনাতে। বিখ্যাত 'রাধামন ধনপুদি' পালার 'সাপ্রেকুল' পর্বে ধনপুদি তার স্বামী রাধামনের জন্য 'সাজন্যা গামছা' বা 'সন্ধ্যা গামছা' বুনার স্থান পেয়েছে।[১০] এই বিশেষ গামছা একদিনে তুলো থেকে সুতো বানিয়ে, বেনের মাধ্যমে বুনতে হয় ও সূর্য ডোবার আগে শেষ করতে হয়। লোক বিশ্বাস রয়েছে যে এ কাপড় রক্ষাগুন সম্পন্ন। ধনপুদির এই উপহার সেনাপতি রাধামনকে যুদ্ধে কোন রকম ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছে ও বিজয়ী করেছে বলে বিশ্বাস সমাজে ও সাহিত্যে প্রচলিত রয়েছে। 'তান্যাবি' উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বারমাসী রচনা যাতে তান্যাবির বেন বুনা ও 'পাদি সাহ্বাং' নক্সাটি বুনাকে গ্রন্থনা করা হয়েছে।[১১]

তান্যাবি ফুল তুলে আলামত্তুন সাহ্বাং গাচ
বো'চা এলে কথা দিদং ও তান্যাবি কেজান পাচ
অর্থাৎ
তান্যাবি নক্সা তুলে আলাম থেকে সাহ্বাং গাছ
বৌ দেখতে এলে কথা দেব কি ও তান্যাবি মত জানাস

আধুনিক চাকমা সাহিত্য ও চাকমা সম্পর্কীয় লেখায় বেন/পাদি সাহ্বাং ও আলাম-এ উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেন এর একচ্ছত্র শিল্পী চাকমা রমণী। কেননা এ ঐতিহ্যে নারীই প্রজন্ম থেকে

প্রজন্মে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। নারী হাতে-কলমে শিখিয়েছেন ও শিখেছেন, পুরুষ সে শিল্পের অন্যতম সমঝদার ও কর্ণধার। চাকমা নারী জীবন সম্পৃক্ত প্যাটার্ন সৃষ্টি করেন সুতোর টানা পোড়েনের সুক্ষতায়, অন্যদিকে যেমন তিনি জীবন প্রতিপালন করেন সংসারের টানা পোড়েনের স্থুলতায়। নদীর মত বহমান ঐতিহ্যে- প্রজন্মের পর প্রজন্ম - মাতা-কন্যা সূত্রে, এবং মাতৃতান্ত্রির উত্তরাধিকার চাকমা নারীর অপূর্ব সৃষ্টি এই বেন শিল্প।

চাকমা নারী জীবন-বৃক্ষ, 'পাদি সাহ্বাং', রচনা করেছেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ বেন শিল্প 'আলাম' এ। আলাম হচ্ছে সাদার উপর লাল, সবুজ, নীল, কাল রঙের সুতোয় বোনা বেন, যাতে চাকমা ঐতিহ্যের বহু নক্সা তুলে রাখা হয়। প্রায় শতের কাছাকাছি বা শতাধিক সব নক্সার সমন্বয়ে এক একটি আলামকে বলা যেতে পারে চাকমা বেন-শিল্পের এনসাইক্লোপেডিয়া, প্রতিটি প্যাটার্ন বুননে আলামের সাহায্য নেয়া হয়। আলাম তাই এই শিল্পের অনিবার্য গাইড। ঐতিহ্যের বাইরের কোন প্যাটার্ন সাধারনত: আলামে তুলা হয় না। এতে করে পূর্বসুরীদের সৃষ্ট প্যাটার্নগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্মে পুন:রাবৃত্ত হয়ে এক চিরায়ত, শ্বাশ্বত প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে। প্যাটার্নগুলোর শতাব্দীর পর শতাব্দী দীর্ঘ ধারাবাহিকতা এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের দাবী রাখে।

বেনের আন্তর্জাতিক শিল্প স্বীকৃতি সম্ভবত: প্রথম এসেছিল ১৮৮৩ সালে, যখন দয়াময়ী দেওয়ানের কাজ, মনে হয় আলাম, বিখ্যাত কলিকাতা ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশনে পুরস্কৃত হয়।[১৩] পরবর্তীতে এই বেনবি দয়াময়ীর বিয়ে 'কার্বারী' বা গ্রাম প্রধান, বা হেডম্যান, যিনি কয়েকজন কার্বারীর প্রধান, কারো সাথে হয়নি। কিন্তু, ১৮৮৫ সালে পূর্বে উল্লেখিত চাকমা ছড়াটির অবমাননা করে তার বিয়ে হয় রাজ্য প্রধান রাজা ভূবন মোহন রায় এর সাথে। তখনকার রাঙ্গামাটির ব্রিটিশ ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী স্বয়ং এ বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন।[১৪] রাজা ভূবন মোহন রায়ের কনিষ্ট ভ্রাতা কুমার রমণী মোহন রায় বিয়ে করে আরেক নিপুন বেনবি ষোড়শী বালা দেওয়ানকে। তিনি প্রখ্যাত কবি অরুন রায় ও সলিল রায়ের জননী। তার বেন ১১৫টি নক্সার এক আলাম রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। রাজা ত্রিদিব রায়ের স্ত্রী রানী আরতি রায়, বর্তমানের রাজমাতাও একজন সুদক্ষ বেনবি। ১৯৫১ সালে আরতি দেওয়ান তার বেনের জন্য রাঙ্গামাটির এক প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়। ১৯৫৩ সালে রাজা ত্রিদিব রায়ের সাথে আরতির বিয়েতে রাঙ্গামাটির ডেপুটি কমিশনার লে. কর্নেল হিউম আরতির বেনের প্রশংসা নিয়ে ঘটকালি করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৮০ শতকের প্রথমার্থে বীনাপানি চাকমা (১৯৩১-২০০৩, ডিএসপি হরিলাল চাকমা স্ত্রী) 'পাদি সাহ্বাং' সহ ৮০টির বেশী নক্সা নিয়ে একটি আলাম বুনেছিলেন যা তার কন্যা রীতা চাকমা(আর্কিটেক্ট ও উন্নয়নকর্মী) উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। প্রখ্যাত বেনবি পঞ্চলতা খীসা, জন্ম ১৯১৯ সাল(রাঙ্গামাটির বেইন টেক্সটাইলের মালিক বেনবি মঞ্জুলিকা চাকমার মাতা) ১৯৬০ এর দশকে ১০১টি নক্সার একটি আলাম বুনেছিলেন।[১৫] সম্ভবত: ১৯৬৪ সালে পঞ্চলতা খীসা, আরেক বেনবি বাসন্তী দেওয়ান(ডা: হিমাংশু দেওয়ানের স্ত্রী) বেন প্রদর্শনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যান। তারা দু'জন আরও চারজন বাঙ্গালী কারুশিল্পীর সাথে 'Artisans from East Pakistan'

নামের সংবাদে ছবিসহ The Pakistan Times এ উপস্থাপিত হন। অনেক সম্মানে ভূবনের মাঝে পঞ্চলতা খীসার ১৯৬৪ সালে 'East Pakistan Small Industries Corporation' এর জন্য প্রথম পুরস্কার ও ১৯৮২ সালে 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা' থেকে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পীর সম্মানে ভূষিত হওয়া উল্লেখযোগ্য। তেমনি আরেক বেনবি শরৎ মালা চাকমা (শিল্পী কনকচাঁপা চাকমার মা) ১৯৮৪ সালে BSCIC এর 'Master Craft persons' 'সম্মান' অর্জন উল্লেখযোগ্য। এই বেনবি তার আলামের জন্য খ্যাতি কুড়িয়েছেন প্রচুর। তার আলামে 'পাদি সাহ্বাং' ফুটে উঠেছে কালো সুতোয় সাদা ভূমির উপর। ২০০১ সালে বেনবি মঞ্জুলিকা চাকমা তার আলামের জন্য পুরস্কৃত হন। সাম্প্রতিক সময়ে, ২০০৯ সালে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা কর্তৃক আয়োজিত 'আদিবাসী বয়নশিল্পের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি' প্রতিযোগিতায় 'পাদি সাহ্বাং' নক্সাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে রেখে একমাস সময়ের মধ্যে আলাম বুনা হয়। এতে কনিকা চাকমার ৪৫টি নক্সাসম্পন্ন আলাম প্রথম, দিপালী চাকমা ৪৪টি নক্সা সম্বলিত আলাম দ্বিতীয় ও ঝর্ণা চাকমা ৩৬টি নক্সাযুক্ত আলাম তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এভাবে বেনবিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী বেনকে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন ঘরে ও বাইরে, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সোপানে। চাকমা বেনশিল্পে 'পাদি সাহ্বাং' নক্সাটি 'গাচ' বা 'বৃক্ষ' ও আরেকটি নক্সা 'কল্পতরু' বৃক্ষ হিসেবে রূপায়িত। অন্যান্য শত শত, কারো মতে মোট ২১০টি [১৬] নক্সায় বিভিন্ন ছোট, বড় ফুল ফল, পাতা, সব্জী, প্রাণি, অলংকার ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি চিত্রিত হয়েছে। 'পাদি সাহ্বাং' নক্সাটি আলামের মধ্যমনি, এটি সবচেয়ে বড় নক্সা ও আলামের মাঝামাঝি অবস্থানে বুনা হয়। এ নক্সাটি আলামে 'ফুলর-বাজা' বা 'শ্রেষ্ঠ নক্সা' হিসেবে পরিচিত। এভাবে বেন শিল্পে 'পাদি সাহ্বাং' জীবন-বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

বেন ঐতিহ্যের মত চাকমা প্রাচীন কল্প-কথা বা পজ্জন ঐতিহ্যে বৃক্ষ কখনও রূপায়িত হয়েছে জীবন-সঞ্চারী হিসেবে এবং কখনওবা মাতারূপে। [১৭] 'ক'বি, ধ'বি' পজ্জনে বৃক্ষ মাতারূপে 'আশাপূরণকারী বৃক্ষ' হিসেবেও পরিচিত। 'ক'বি, ধ'বি' দুই বৈমাত্রেয় বোন। জৈষ্ঠজন ক'বি মাতৃহারা সত্যযুগের অপূর্বসুন্দরী এক নারী। তাকে কেন্দ্র করে এই পজ্জন সৃষ্টি হয়েছে। সত্যযুগ এমন এক যুগ যখন প্রত্যেকে সত্যি কথা বলত ও তার বাক্য সত্যে পরিণত হত। ক'বির মাকে পজ্জনে পাওয়া যায় দুপুরের খড়রোদে তার স্বামীর সাথে জুম পরিষ্কার করতে। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে স্বামীকে তাগাদা দেয় আর স্বামীও বলছিল 'এ বাগকো ধুযোক' অর্থাৎ 'এ অংশটা শেষ হোক', এরপর স্বামী-স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ি, পাহাড়ের নীচে নামে পানির খোঁজে। এখানে হরিণের পায়ের খুঁড়ে তৈরী দু'টো কুয়োর সন্ধান মেলে। পানি নাড়ার সাথে সাথেই বুড়ির কুয়োর পানি ঘোলাটে হয়ে যায়, কিন্তু বুড়োর কুয়ার পানি থাকে পরিষ্কার। বুড়ো যখন কুয়োর ঠান্ডা , স্ফুটিক স্বচ্ছ পানি পান করছিল বুড়ি বায়না করছিল তাকে পানি খেতে দেওয়ার। এতে বিরক্ত হয়ে বলে 'দুর' অর্থাৎ 'দুরে সর' এ শব্দটির আরেকটি চাকমা অর্থ হচ্ছে 'কচ্ছপ', বুড়ি এতে কচ্ছপে রূপান্তিরিত হয়ে উপত্যকার ছড়ায় নেমে যায়। বুড়ো, বুড়িকে হারিয়ে মনোকষ্টে বাড়ী ফিরে। দিন কাটে তার কষ্টে বিহ্বল হয়ে। কিন্তু এক

সময়ে বুড়ো আবার বিয়ে করে। এ ঘরানায় জন্ম নেয় ধ'বি। বুড়োর নতুন বৌ ধ'বিকে চোখের মনি করে রাখে আর ক'বিকে নিয়ত অবহেলা ও উপেক্ষা করে। ঘরে বাইরের সমস্ত কাজ করায়। বুড়ো সব বুঝতে পেরেও মুখ বুজে থাকে।

নতুন বৌ একদিন বুঝতে পারে তার সতীন কচ্ছপ হয়ে নদীতে আছে, সে তখন তার সতীনকে মেরে ফেলার জন্য বুদ্ধি আঁটে। হিংসায় অন্ধ নতুন বৌ বুড়োকে ছিপ বানিয়ে দেওয়ার আবদার করে। ছিপ তৈরী হলে নতুন বৌ ক'বিকে নদীর ধারে বসিয়ে দেয় কচ্ছপ ধরার জন্য। ক'বিকে একবুক আশংকা, ভয়, কষ্ট নিয়ে ছিপ পেতে বসে থাকতে হয়। সে তার কচ্ছপ-মাকে ডেকে সতর্ক করে দেয়, 'ও মা হ্দেদি ন যেচ তেরাত বাযিবে, আগারে ন যেচ চেইঅত বাযিবে, কুলদি ন যেচ বচ্যিত বাযিবে, মধ্যে মধ্যে থেচ' অর্থাৎ 'ও মা স্রোতের দিকে যেও না তেরায় (এক ধরনের ফাঁদ) ধরা পড়বে, উজানে যেও না চেই (ফাঁদ) এ আটকাবে, কুলে এসো না বড়শীতে বিঁধবে, মাঝ নদীতে থেক।' কিন্তু একদিন কচ্ছপ-মা কুলে এসে বড়শীতে ধরা পড়ে। নতুন বৌ মহাখুশীতে কচ্ছপের মাংস রান্নায় চড়িয়ে দেয়। রান্না ফুটতে থাকলে এক অদ্ভুদ শব্দে ছড়া কাটা শোনা যায়: 'ববক ববক বক, বুড়ি মাধা হাঙ/ববক ববক বক, বুয্যে মাধা হাঙ', 'ববক ববক বক, বুড়ির মাথা খাই/ববক ববক বক,বুড়োর মাথা খাই'। নতুন বৌ, চমকে উঠে- একি কথা? সে পাতিলসহ রান্না ইজোর(বাঁশের তৈরী ঝুলন্ত বারান্দা) থেকে ছুড়ে দেয়। সেখানে বেড়ে উঠে এক বিশাল বিরিচ গাছ, যার বুকে আছে বিরাট ফাটল। বাড়ীর সব কাজ সেরে ক'বি ভরদুপুরে গাছের ছায়ায় বসে। [১৮] তার মা রূপী বিরিচ গাছ তখন তাকে মমতায় ছায়া দেয়, বাতাস দেয়। এমনি করে দিন কাটে ক'বির।

একদিন খবর আসে রাজকুমার রাজ্যের সব সুন্দরীদের রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাদের মাঝ থেকে বেছে নেবেন তার বধূ, ভাবী রাণী। বুড়োর বাড়ীতেও নিমন্ত্রণ আসল। নতুন বৌ ধ'বিকে সিন্ধুকে তোলা নতুন, জমকালো পিনোন-খাদি পরালো, সাজালো বাহারী গয়না দিয়ে। আর ক'বির জন্য জুটলো পুরনো, জীর্ন, পিনোন-খাদি। ক'বি ভাবে সে কি করে এই সাজে নিমন্ত্রণে যাবে। তার মা যদি বেঁচে থাকতো তার এই অবস্থা হতো না। এইসব ভেবে সে বিরিচ-বৃক্ষের তলে এসে গাছকে জড়িয়ে মনে মনে বলে-'মা আমাকে রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত সাজসজ্জা দাও' থর থর কেঁপে উঠল বৃক্ষের ডাল-পালা, সবুজ পাতা, ঠান্ডা শীতল হাওয়ায় ভরে যায় চারিদিক। ক'বি চোখ খুলে দেখে গাছের ফাটল ভরে তার জন্য উপহার- নানা রঙের পিনোন-খাদি, কানের অলংকার- কজফুল, বাজ্জুর, গলার অলংকার,- হ্জুলী, টেঙা ছড়া, চিক ছড়া, সীতা হার, হাতের বালা, কুজি হারু, বাহুর জন্য তাজ্জুর, পায়ের জন্য থেং খারু, নাকের নচ- আরো অনেক কিছু। ক'বি চন্দন স্নান সেরে পড়ে নেয় পিনোন-খাদি, সূক্ষ রুচির অলংকার। অতিরিক্ত সব জমা দেয় গাছের ফাটলে। রাজবাড়ীর উৎসবে জ্হানী, মানী, অপূর্ব সুন্দর রাজকুমার, ভাবী রাজা, ক'বির

ব্যবহারে, স্বভাবে ও রূপে মুগ্ধ হয়। ক'বির পরিচয় নিয়ে বিয়ের দূত পাঠানো হয় রাজবাড়ী থেকে। ক'বির বিয়ে হয় সেই রাজকুমারের সাথে ও পরে রাণী হয়ে সুখে শান্তিতে রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করে। [১৯]

বিরিচ বৃক্ষের মত 'আশাপূরণকারী' আরেক বৃক্ষ আছে। প্রধানত: বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে। এ বৃক্ষের নাম 'কল্প-বৃক্ষ' বা 'কল্প-তরু'। বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রে এই বৃক্ষ স্বর্গোদ্যানের এক বৃক্ষ হিসেবেও উল্লেখ আছে। বিজু উৎসবের শেষ দিন বা বৈশাখের প্রথম দিনে, বৈশাখী ও মাঘী পূর্ণিমায় দায়ক-দায়িকরা পাতা ও ফুলের মত বৃক্ষ সাজায় বিভিন্ন দানসামগ্রীতে- বিদ্বান হওয়ার মানসে ঝুলানো হয় বই, ধনী হওয়ার মানসে অর্থ, উজ্জ্বল রং হওয়ার মানসে কাঁচা হলুদ ইত্যাদি। মানস পূরণকারী এই বৃক্ষ চাকমা ঐতিহ্যে নারীরূপী বিরিচ বৃক্ষের মতই এক মঙ্গল-বৃক্ষ। বেনের 'কল্প-তরু' নক্সা এই দেববৃক্ষের স্বরণে চিত্রিত। জীবন বৃক্ষ 'পাদি সাহ্বাং গাচ' এর প্রতীকী মর্মার্থ (Sutitle Bold)।

যদিও নক্সাটি সংক্ষেপে 'পাদি সাহ্বাং' হিসেবে পরিচিত এর পুরো নাম 'পাদি সাহ্বাং গাচ', অন্যসব নক্সার মত এটি প্রস্থজুড়ে বুনে এক প্রশস্ত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আলামে ফুটিয়ে তোলা হয়। নক্সার এ চিত্রটির পাদদেশ ত্রিকোণাকার। এ হতে উৎসারিত সরল, স্তম্ভের মত মধ্যকান্ড হতে তিনপর্বে দুইপাশে সমতায় ডাল বের হয়েছে মোট ছয়টি। প্রতিটি ডালের শাখা ফুলকুঁড়ির মত নেমেছে নিম্নমুখী হয়ে। কিন্তু মধ্যকান্ডের চুড়ায় মুকুট হয়ে থাকা অনেকটা হৃদয় আকৃতির ফুটন্ত পদ্মের মত ফুলটি রয়েছে আকাশমুখী হয়ে। এছাড়া দুইপাশে সমতায় ডায়মন্ড আকৃতির তিনটি প্যাটার্ন উর্ধ্বপথে সাজানো। সর্বনিম্ন প্যাটার্নটি বড়, বাকী দু'টি ছোট ও সমান আকারের। এই ডায়মন্ড প্যাটার্নগুলোর উন্নতির শিখরে ভেসে রয়েছে আরেকটি আকাশমুখী ফুটন্ত পদ্ম। এই উর্ধ্বপথের ত্রয়ী-ডায়মন্ড ও ফুটন্ত পদ্ম, মধ্যকান্ডযুক্ত প্রতিটি বৃক্ষ প্যাটার্নকে আলাদা করেছে। প্রবন্ধের এই অংশে 'পাদি সাহ্বাং গাচ' নক্সার প্রতীকী মর্মার্থ আলোচনা করা হল।

'পাদি সাহ্বাং গাচ' পদটির মূল-বুৎপত্তি বিশ্লেষণে (etymological analysis) প্রথম পদ 'পাদি' এর উৎপত্তি হতে পারে 'পাদা' অর্থাৎ 'পাতা' থেকে। 'পাদি' নারী সম্পর্কিত শব্দ। চাকমা ভাষায় সচরাচর নারী সম্পর্কিত শব্দে ই-কার বা 'ই' প্রত্যয় যোগ থাকে। যেমন ডাকে বা নামে, মামি (মামী), হাক্কি (কাকী), ভুজি (বৌদি), ঝি (কন্যা), পুদি (কন্যা এর বিপরীত শব্দ 'পুদ' মানে 'পুত্র') ইত্যাদি। দ্বিতীয় পদ 'সাহ্বাং' অর্থ হতে পারে '(স্বয়ং) ছাপ দিই' বা '(স্বয়ং) চিত্রিত করি'। তৃতীয় পদ 'গাচ' অর্থ 'গাছ' বা 'বৃক্ষ'। এভাবে এর পুরো অর্থ দাঁড়ায় ' স্বয়ং চিত্রিত পত্র বৃক্ষ', যেখানে 'পাদি' শব্দের মাধ্যমে এটিকে নারী হিসেবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবার দ্বিতীয় পদ 'সাহ্বাং' এর উদ্ভব হতে পারে 'সাহ্ব+আঙ' থেকে। 'সাহ্ব' অর্থ 'ছান দেওয়া বা চিত্রিত করা' ও 'আঙ' হচ্ছে মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহারে এ ধরনের চিত্র

যাকে 'মন্ডল' (cosmos) বলা যেতে পারে, যেহেতু 'আঙ' চিত্র কসমলজিক্যাল বা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড বিষয়ক ধারনাকে রূপ দেয় ও তন্ত্র হিসবে কাজ করে। মহাযানী বৌদ্ধ অনুশাসনে মন্ডলের ব্যবহার ব্যাপক। এছাড়াও হিন্দু, শৈব ও অন্যান্য ঐতিহ্যে এর বহুল প্রচলন রয়েছে। এভাবে এর অর্থ হতে পারে 'পত্র চিত্রিত মন্ডল বৃক্ষ' বা 'পত্র চিত্রিত বিশ্বব্রহ্মান্ড বৃক্ষ'। চাকমা বৈদ্য ঐতিহ্যেও 'আঙ' বা মন্ডলে চিত্র তাবিজে, তন্ত্রোক্ত মারন-মোহন-বশীকরণ-উচাটন-স্তম্ভন ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়।[২০]

'পাদি সাহ্বাং গাচ' আকৃতি বা গঠন শৈলী বিশ্লেষনে প্রথমত নির্দেশ করে দিক (direction) : অধ:, অন্তরিক ও উর্ধ্ব, এবং বাম, ডান ও মধ্য রেখা বা পথ। এই নক্সাটি অধ: থেকে বুনে নেওয়া, মধ্য পথ থেকে বাম ও ডানে প্রসারিত হয়ে, উর্ধ্ব পথে বেড়ে উঠা বৃক্ষ। এর ত্রিকোনাকৃতির পাদদেশ শিকড়ের সমতুল্য, যা মাটি ও জলের গভীরে প্রোথিত। এলিভেশনে বা উন্নতিতে বোনা এ নক্সার সরল মধ্য কান্ড স্তম্ভ হয়ে মুকুট করে রেখেছে এক আকাশমূখী পদ্ম বা সূর্যের মত ফুটন্ত ফুলকে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও শিল্পে সাধনায় পদ্ম ও সূর্যকে সমার্থক পাওয়া যায়। এসব ঐতিহ্যে আধ্যাত্মিক সূর্য হচ্ছে বোধ বা জাগরনের প্রতীক, আর প্রতিদিনের সূর্য হচ্ছে দিক ও সময়ের নির্দেশক। বৃহদ আরন্যক উপনিষদ, VI, 3.6, এই আধ্যাত্মিক সূর্যকে স্তুতি করেছে। শীর্ষের অনন্য পদ্ম (the, one lotus of the zenith) হিসেবে। ফুটন্ত পদ্ম সৃষ্টি, চেতনা বা বোধ জাগরনের প্রতীক। বৌদ্ধ ও হিন্দু ঐতিহ্যে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি ধারনায় 'মেরু পর্বত' প্লান হিসেবে মহাসমুদ্রে ভাসমান এবং 'চতুর্দল পদ্ম' বা 'চার পাপড়ির পদ্ম' বলে বর্নিত হয়েছে। শাস্ত্রে মেরুপর্বত এলিভেশন হিসেবে উঠে এসেছে সমুদ্র গর্ভ থেকে ইন্দ্রের স্বর্গকে চূড়ায় নিয়ে। তেমনি এই দুই ঐতিহ্যে ধ্যান, বিভিন্ন যোগ ও তান্ত্রিক সাধনায় পদ্ম মানুষের চেতনা বা বোধ জাগরনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শরীরের সর্বোচ্চ শক্তির আধার 'মস্তিষ্ক চক্র' কে বর্নণা করা হয়েছে কখনও বা 'উষ্নীষ কমল' বা 'উষ্নীষ পদ্ম', 'সহস্র কমল', 'সহস্রার চক্র' ইত্যাদি নামে। চাকমাদের বর্তমান থেরাবাদ বৌদ্ধ ঐতিহ্য ছাড়াও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুশাসনে দেহ চক্র ছাড়াও তিন মূল নাড়ির উল্লেখ রয়েছে। মেরুদন্ডের সমান্তরালে মধ্য নাড়ির দু'পাশে রয়েছে ইংগলা ও পিংগলা নাড়ি, যেখানে বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে শরীরকে সুস্থ রাখে। মধ্য নাড়ি সুষুম্মায়, ইংগলা ও পিংগলার বায়ু শাসনে এনে সাধক তার শরীরের বিভিন্ন পর্বের শক্তির আধার বা চক্রদের ভেদ করে উর্ধ্বপথে বায়ু এনে যোগবল আয়ত্ত করে। চাকমা তান্ত্রিক বা চিকিৎসা শাস্ত্রে তিন নাড়ির বর্নণা এসেছে এভাবে;

বাহাত্তর হাজার নাড়ি শরীরের পর
লহরে আছয়ে জান ঐ সপ্ত সায়র ॥
এই নাড়ির মধ্যে জান দশ নাড়ি সার,
বৈদ্যগনে ভিন্ন করি তিন নাড়ি করিল প্রচার ॥
ইংগলা পিংগলা সুষুমা যে হয়
বুকে পিঠে তিন রসে খিঁচিয়ে আছয় ॥[২১]

এই তিন নাড়ি, দুই দরজা ও মুরখামের মাধ্যমে চাকমা আবাস স্থাপত্যে ধাবিত হয়েছে।[২২]

দেহের সর্বনিম্ন চক্রে কুলকুন্ডলিনী শক্তি ঘুমিয়ে থাকে। বৈদ্য ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধকরা সাধনা যোগে এই শক্তিকে জাগিয়ে তুলে সুষুম্মার মাধ্যমে উর্ধ্ব পর্বেও চক্রদের ভেদ করে মস্তিষ্ক চক্রের পদ্ম বা সূর্য্যকে প্রস্ফুটিত করে। এইভাবে আয়ত্ব করা হয় আধ্যাত্মিক জাগরন বা বোধ।

'পাদি সাহবাং গাচ' এর মধ্য কান্ড বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের 'মেরু পর্বত' বা শরীরের 'সুষুম্মার' প্রতিরূপ, যা শিকড়, সমুদ্র গর্ভ বা নিম্ন চক্র থেকে বেড়ে উঠে সর্বশীর্ষে পদ্ম বা সূর্য্য ফুলকে মুকুট করে রেখেছে। এইভাবে 'পাদি সাহ্বাং গাচ' শব্দ বুৎপত্তি, গঠন শৈলী ও প্রতীকী বিশ্লেষনে চাকমা বেন ঐতিহ্যেও অপরূপ জীবন বৃক্ষ।

তথ্যসূত্র :

১. Ananda K. Coomaraswamy, *What is Civilization? and other essays foreward by Sayyed Hossein Nasr* (Delhi: Oxford University Press, 1989), 123 and 126; René Guénon, *Introduction to the Study of the Hindu Doctrines*, trans. by Manco Pallis (London: Luzac & Co.), 110-132; Sayyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Sacred*(New York: Crossroad, 1981), 68; Adrian Snodgrass, *The Symbolism of the Stupa*(Itahaca: Cornell University, 1985); Kabita Chakma, *Cosmic Symbolism of the Traditional Architecture of Bengal* (Master in Architecture thesis, University of Sydney, 1993), ii-ix

২. Maitri Upanisad, Vol. 4, S, Radhakrishnan, ed.,The pricipal upanisad (Delhi: Oxford University Press, 1990 inprenion), 817-818

৩. Stella Kramrisch, unknown India, Ritual Art in tribe and Village (Philadelphia : Philadelphia museum of Act, 1968)

৪. কবিতা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা জাতির নিজস্ব লোকশিল্পের মূল নক্সা এবং এতে নিয়োজিত নারীদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে গবেষণা (ঢাকা: রিসার্চ ইনিশিয়াটিভস বাংলাদেশ, ২০০৪), ১

৫. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ (কলিকাতা: নয়া প্রকাশন, ১৯৮১, চতুর্থ মুদ্রণ), ১৫০-১৫১

৬. তিব্বতী নাম, সৈয়দ আলী আহসান, চর্যাগীতি প্রসঙ্গ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), ১০

৭. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা, চর্যাগীতিকা (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৮৬), ৭

৮. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা, চর্যাগীতিকার (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৮৬), ১৭-১৮

৯. চর্যাপদে 'বেন' শব্দটির দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য আমি সোসিয়াল মিডিয়ার নভেম্বর ২০১৪ এক আলোচনায় অংশগ্রহনকারী ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়, ইঞ্জিনিয়ার পুলক জীবন খীসা ও অনেকের কাছে কৃতজ্ঞ।

১০. সুহৃদ চাকমা, চাকমা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, আলবেরুনী হল বার্ষিকী (সাভার: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০)

১১. সুগত চাকমা, et. al. সম্পাদিত, রাধামন ধনপুদি (রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ২০০৪), ১৩৮-১৪০

১২. নন্দলাল শর্মা, চাকমা লোকসাহিত্য (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৯), ২৪-২৮

১৩. বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (রাঙ্গামাটি: উদয় শংকর দেওয়ান, ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করন), ফুটনোট ২৭, ১১

১৪. Raja Tridiv Roy, The Departed Melody (Islamabad: PPA Publication, 2003), 53

১৫. Ibid, 126

১৬. Manjulika Chakma & Niaz Zaman, Strong Backs Magic Fingers, Traditions of Backstrap Wearing in Bangladesh (Dhaka: Nymphea Publication, 2010), 28, 31

১৭. Ibid., 28. তবে চাকমা বেন শিল্পে নক্সার সংখ্যা ২১০টি আরও খতিয়ে দেখা দরকার। ভবিষ্যতে নক্সা ও সংখ্যা নিয়ে অনেকে গবেষণা করবেন বলে আশা করা হল।

১৮. চাকমা নারীর বিভিন্ন অলংকারের জন্য দেখুন, রানী তাতু রায়, ফুলবারেং (ঢাকা: ১৯৯৩), ১২

১৯. বিষ্ণুপুরান ব্যমায়ন মহাবজ্জি জাতক কলিঙ্গবোধ জাতক।

২০. ডা: ভগদত্ত খীসা, চাকমা তালিক চিকিৎসা (রাঙ্গামাটি হারবাল মেডিসিন সেন্টার কমিটি, ১৯৯৬), ১৯,২০ ও ২১

২১. প্রাগুক্ত, ২৮

২২. Kabita Chakma, The Androgynous House: The Symbolism of Chakma Domestic Architecture, Architectural Theory Review (vol. 6, no. 2, 2001), 12-27; Kabita Chakma, Building a Bamboo Mountain: The Chakma House and the Cosmology of Mount Meru, Architectural Theory Review (vol. 8, no. 2, 2003), 59-70

বাংলা হরফে চাকমা ভাষা উচ্চারণের সমস্যা ও তার সমাধান [১]

দেবাশীষ ওয়াংঝা

গোত্রগত ও অঞ্চলগত ভিন্নতা ছাড়া চাকমা শব্দ উচ্চারণে চাকমা ভাষাভাষীদের মধ্যে সবচাইতে লক্ষনীয় পার্থক্য সম্ভবত শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে। এই পার্থক্যও দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর সাথে জড়িত রয়েছে চাকমা ভাষাভাষী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মর্যাদা। সাধারনত যারাই বেশী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করেছে তারাই বেশী বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, বিশেষ করে বাংলা শব্দ। উচ্চরণের ক্ষেত্রেও তারাই অধিক ভুল করে থাকেন।

চাকমা ভাষা বলাকালে অনেক চাকমা ব্যক্তি বাংলা বা অন্য কোন বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন। যেখানে চাকমা ভাষায় যথাযোগ্য শব্দ নেই, বিদেশী শব্দ ব্যবহার করাটা যৌক্তিক। তবে চাকমা শব্দের অস্তিত্ব থেকেও অনেকে বাংলা বা অন্য বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে থাকে। যেমন "লাইনত থিঅ" না বলে "লাইনত দাড়-অ" বলা। "ধুপ" না বলে "সাদা" বলা। "সোম্যেগোই" না বলে "ঘোল্যেগোই" বা "ধুক্যেগোই" বলা ইত্যাদি। তবে এই সমস্যা হয়তো অন্য কোন সময় আলোচনা করবো। এই প্রবন্ধে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো বাংলা হরফে চাকমা শব্দ উচ্চারণের সমস্যা।

উল্লেখ্য যে বাংলা হরফে পড়ে চাকমা গান গাওয়ার সময় অনেক শিল্পীই বাংলার উচ্চারণের ধারা অনুসরন করে চাকমা শব্দসমূহ উচ্চারণ করে থাকেন। এটা পার্বত্য

[১] এই প্রবন্ধটি UNDP- র সহায়তায় চাকমা রাজ কার্যালয় কর্তৃক রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটিতে ১৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে আয়োজিত "বাংলা ও অন্যান্য হরফে চাকমা ভাষা উচ্চারণের সমস্যা ও তার সমাধান" শীর্ষক পরামর্শ সভায় উপস্থাপিত প্রবন্ধের সংশোধিতরূপ। এর সাথে সভার সুপারিশমালা সংযোজন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সীমিতভাবে ভারতের মিজোরামের অনেক গায়ক-গায়িকাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ভারতের অরুনাচল প্রদেশে ও বার্মার ক্ষেত্রে (উভয় অঞ্চলে বাংলার প্রচলন নেই) কি অবস্থা আমার জানা নেই। উদাহরণ দিয়ে বলি। যেটা আমার সবচাইতে কানে লেগেছে, সেটা হলো যেভাবে সংশ্লিষ্ট চাকমা শব্দটিতে ইংরেজী z বর্ণের উচ্চারণ হওয়া উচিৎ, তথাপি তা না হয়ে ইংরেজী j বর্ণের উচ্চারণ করা হচ্ছে। যেমন: Bizu না বলে Biju বলা হচ্ছে। Aazu না বলে Aaju বলা হচ্ছে।

আপনারা খেয়াল করে থাকবেন যে আমি Roman বা সাধারন অর্থে ইংরেজী বর্ণ দিয়ে উপরোক্ত "বিঝু" ও "আজু" শব্দসমূহ লিখেছি। কারণটা হলো চাকমা ভাষার Bizu ও Azu শব্দ সমূহ বাংলা হরফে লিখতে গেলেই আমাদের "য", "জ" বা "ঝ" বর্ণ ব্যবহার করতে হয়। বাংলায় z উচ্চারণ নেই। তাই আরবী Zahed বা ইংরেজী Zebra শব্দদ্বয় অনুরূপভাবে বাংলা বর্ণ দিয়ে লেখা হলে শব্দসমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভবপর নয়।

বাংলা হরফে ইংরেজী s বর্ণের উচ্চারণ সম্ভব নয়। বাংলা "চ", "ছ', "স", "ষ" বা "শ" যে বর্ণই ব্যবহার করা হোক না কেন, s বর্ণের উচ্চারণ আসবে না। কাজেই চাকমা Saan, Songora, Sodok ইত্যাদি বাংলায় লিখে সঠিক উচ্চারণ করা যাবে না। একইভাবে ইংরেজী Sun বা আরবী Salam শব্দসমূহও বাংলায় লিখতে গেলেই সমস্যা ("সান", "সালাম", "ছালাম" ইত্যাদি)।

রাঙ্গামাটির জনৈক চাকমা ব্যবসায়ী তার দোকানের নাম সাইনবোর্ডে লিখতে গিয়ে বাংলা বর্ণে "বেলছদক" আর ইংরেজী বর্ণে Belochodok লিখেছেন। উচ্চারণগতভাবে Belochodok না লিখে Belosodok লেখাটাই যথার্থ হতো। এই ক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয় যে ব্যবসায়ী প্রথমে চাকমা শব্দটি বাংলা হরফে বানান করেছেন এবং পরে বাংলা বানানের অবলম্বনে চাকমা শব্দটির ইংরেজী বানান করেছেন।

কোন একটি শব্দ উচ্চারণ করার আগে আমরা কোন সময় শ্রুতিগত স্মৃতি (sonic memory) অনুসরণ করি আর কোন সময় দৃষ্টিগত স্মৃতি (visual memory) অনুসরণ করি। আমরা শৈশবে যেভাবে অন্যের কাছ থেকে ভাষার ধ্বনি শুনে ভাষা বলতে শিখি, তাতে আমরা শ্রুতিগত স্মৃতি অনুসরণ করেই ভাষা শিখি। এটাই ভাষা শেখার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। অন্যদিকে, আমরা যখন লিখিত হরফ পড়ে ভাষা শিখি বা চর্চা করি, তখন আমরা দৃষ্টিগত স্মৃতি স্মরণ করেই ভাষা শিখি বা শব্দ উচ্চারণ করি। যাদের অক্ষর জ্ঞান নেই তাদের উচ্চারণে সমস্যা নেই বা কম এবং তারা শ্রুতিগত স্মৃতি অনুসরণ করে থাকেন। আর যারা দৃষ্টিগত স্মৃতিকে প্রাধান্য দেন তারা সংশ্লিষ্ট লিপির

বানানুসারে শব্দটি স্মরণে এনে সেই বানানের উচ্চারণ কাঠামো অনুসারেই শব্দটির ধ্বনি বাচনিকভাব উচ্চারণ করে থাকেন এবং সেভাবে অন্য লিপিতেও লিখেন। উচ্চারণের সমস্যা উদ্ভব হয় যখন আমরা এমন একটি ভাষার লিপি দৃষ্টিগত স্মৃতি দিয়ে স্মরণ করি, যেই লিপির ধ্বনিতত্ব শব্দটির সঠিক উচ্চারণে সহায়ক নয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে বাংলা বা ইংরেজী হরফ ব্যবহার না করে চাকমা হরফ ব্যবহার করলে উচ্চারণের সমস্যা হতো না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যারা এই মতে বিশ্বাস করেন আমি তাদের সাথে আংশিকভাবে সমমত পোষণ করলেও পুরোপুরি একমত না। শিক্ষিত চাকমা ভাষাভাষী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিষয়টি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাকমা বর্ণ ব্যবহার করেও মূল চাকমা শব্দসমূহ উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি বা অন্যান্য অ-চাকমা হরফের দৃষ্টিগত ও শ্রুতিগত স্মৃতিকে মাতৃভাষার ধ্বনিতত্ব অনুসারে নিয়ন্ত্রনে বা তত্ত্বাবধানে রাখতে পারছেন কিনা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি যদি প্রথম লিপি হিসেবে চাকমা লিপিতে শিক্ষিত হন, তাহলে সমস্যা হয়তো হবে না, বা কম হবে। তিনি যদি চাকমা ব্যতীত অন্য কোন লিপিকে প্রথম লিপি হিসেবে গ্রহন করে থাকেন, তাহলে সমস্যা হতে পারে।

আমার প্রয়াত স্ত্রী রাণী তাতু আমাকে একবার বলেছিলেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ার সময় mother tongue interference এর কথা শিখেছেন। Linguistics এর এই তত্বে একটি hypothesis আছে যে অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা অনুশীলনের বা চর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার জ্ঞান বাধা দিতে বা interfere করতে পারে। উপরোল্লেখিত উচ্চারণের সমস্যার উদাহরণের বেলায় আমরা mother tongue (মাতৃভাষা) বা প্রথম ভাষা (first language) হস্তক্ষেপের পরিবর্তে first script interference (প্রথম লিপির হস্তক্ষেপ) এর কথা ভাবতে পারি।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে একটি উদাহরণ টানি। যেহেতু আমার প্রথম লিপি হলো ইংরেজী (দ্বিতীয় বাংলা, তৃতীয় চাকমা) আমার বেলায় প্রথম লিপির হস্তক্ষেপ আসে ইংরেজী থেকে। তাই বোধহয় আমার ক্ষেত্রে j আর z এবং s আর ch বা sh -এর উচ্চারণের ক্ষেত্রে যাদের প্রথম লিপি বাংলা তাদের চাইতে সমস্যা কম (যেমন: আমি Bozo বলি Bojo বলিনা। Sanah বলি Chanah বলিনা। Suguni বলি Shuguni বলিনা)। তবে ইংরেজী ভাষার দৃষ্টিগত ও শ্রুতিগত স্মৃতির কারণে চাকমা উচ্চারণে আমার অন্যান্য ক্ষেত্রে নিশ্চই ভুল হতে পারে। আপনাদের কারোর গোচরে এরকম ভুল লক্ষিত হলে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আরেকটি বলি। মাঝে মধ্যে আমি চাকমা গান গাইবার সময় বাংলা ও ইংরেজী দুই হরফে লেখা গানের কলি উচ্চারণ করেছি। উভয় ক্ষেত্রে তেমন অসুবিধা বোধ করিনি। অন্তত j বনাম z এবং s বনাম ch এর ক্ষেত্রে । রাজপুণ্যার সময় চাকমায় বক্তব্য রাখার সময়ও আমি ইংরেজী ও বাংলা দুই হরফই ব্যবহার করেছি, তবে শব্দগত ও উচ্চারণগত পরামর্শের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিলের ঝিমিত ঝিমিত চাকমা প্রমূখ বন্ধুগণের স্বরণাপন্ন হয়েছি।

বাংলাদেশ ও ভারতের কিছু চাকমা সঙ্গীত শিল্পীদের চাকমা গানে আমি ভুল উচ্চারণ লক্ষ্য করেছি। এ সব সমস্যা হয়েছে z ও s উচ্চারণে এবং এমন কি ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় “silent h” (honour, hour) উচ্চারণের বেলায় যেমন Aazu, Saan, Holodya ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে (যেমন: Olodya না বলে Holodya বলা)।

বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে বাংলা হরফের হস্তক্ষেপের সমস্যা কেবল চাকমা ভাষাভাষীরা ভূগছে না। বাংলায় শিক্ষিত ত্রিপুরা, মারমা, চাক ও অন্যান্য জুম্ম বা পাহাড়ী জাতির সদস্যদেরও অনুরূপ সমস্যা হচ্ছে। তবে ভাষাগত ও শব্দের উচ্চারণগত (phonetics) সাদৃশ্যের কারণে হয়তো চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ক্ষেত্রে যতখানি সমস্যা অন্য জাতিদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা অপেক্ষাকৃত কম। তবে এ ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা কি কেবল সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠি সদস্যরাই বলতে পারবেন।

অন্যান্যের মধ্যে Roman বা ইংরেজী হরফে চাকমা উচ্চারণের সুবিধা হবে সেই চাকমা ভাষাভাষীদের বেলায় যারা বিদেশে থাকেন। তা ভারতের অরুনাচল প্রদেশ হোক বা মায়ানমার (বার্মা), ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া বা উত্তর আমেরিকায় হোক। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও যারা Roman হরফ জানেন তারা উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা হরফ ব্যবহার না করে Roman হরফ ব্যবহার করতে পারেন (যদি তারা চাকমা বর্ণ জানেন না)। আর যদি চাকমা বর্ণে শিক্ষিত হন তাদের ক্ষেত্রে বাংলা, Roman বা অন্য কোন বিদেশী হরফ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সাধারন ক্ষেত্রে থাকবে না (তবে তাদের প্রথমলিপি বাংলা হলে উচ্চারণের সমস্যা তথাপিও রয়ে যেতে পারে)। কিন্তু computer অথবা cellphone ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তথাপিও Roman (বা বাংলা বা অন্য কোন) হরফ ব্যবহার করতে হতে পারে।

কোনদিন বাংলাদেশের চাকমা অধ্যুষিত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে চাকমা বর্ণ শেখানো হলেও, যেই অঞ্চলে চাকমারা সংখ্যায় কম, সেই অঞ্চলের চাকমা শিশুরা চাকমা লিপিতে নিরক্ষর রয়ে যেতে পারে। কিছু কিছু দেশের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে এসব এলাকায় ছুটির দিনে বিশেষ চাকমা লিপির পাঠ্যসূচী সম্বলিত

শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহন করে এ সমস্যার আংশিক সমাধান হলেও পূর্ণাঙ্গ সমাধান হবে না। কাজেই চাকমা বর্ণের পাশাপাশি Roman বর্ণের প্রয়োজনীয়তা রয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ও ভারতের মিজোরামের Chakma Autonomous District Council এলাকা (যেখানে চাকমা লিপি বিদ্যালয়ে শেখানো হয়) ব্যতীত অন্যান্য দেশ ও এলাকায়। বিশিষ্ট লেখক প্রশান্ত ত্রিপুরার মতে, লিপি সংরক্ষনের চাইতে ভাষা সংরক্ষন করা অধিক জরুরী। আমি সমমত পোষণ করি।

উচ্চারণগত সমস্যাসমূহ সমাধান কারণে আমরা phonetics বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে পারি। পাশাপাশি video ও audio প্রযুক্তির সাহায্যও নিতে পারি। চাকমা ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সাদৃশ্য থাকায় বাংলা ভাষার হস্তক্ষেপ (Bengali Tongue Interference) এর সমস্যাটা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের যথেষ্ট প্রকট। কাজেই এই জাতিসত্বার সদস্যদের বেলায় সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য অধিক মনোযোগী হতে হবে।

Roman হরফ ব্যবহার করলেই যে সব উচ্চারণগত সমস্যা মিটে যাবে, তা না। এ ক্ষেত্রেও Roman হরফের phonetics-কে আমাদের নিজস্ব ভাষার প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করে নিতে হতে পারে। যথা: ইংরেজীতে "হ" (h) ধ্বনিযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নেই বা কম। কাজেই mhaw, nhiyei শব্দ বানানের বেলায় সমস্যা হতে পারে। যেহেতু বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণের বা স্বরবর্নের সাথে "হ" বর্ণ যুক্ত হয় না, বাংলার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হতে পারে।

একইভাবে চাকমা স্বরবর্ণ উচ্চারণের ক্ষেত্রেও phonetics - এর চিহ্নযুক্ত vowel ব্যবহার করলে সমস্যা কম হতে পারে। যথা: saan লিখতে গিয়ে ইংরেজীতে san লেখা যায় অথবা saan লেখা যায়। একইভাবে fawth লিখতে গিয়ে fawth লিখবো নাকি foth লিখবো? অপেক্ষাকৃতভাবে এ-সকল স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে বাংলায় অ-কার, আ-কার, ও-কার থাকায় সমস্যা নেই বলে চলে। কাজেই এসকল ক্ষেত্রে বাংলা হরফের চাইতে ইংরেজী হরফ ব্যবহারে অধিক সমস্যা হতে পারে। এখানে আমরা প্রচলিত ইংরেজী phonetics চিহ্ন অথবা সংস্কারের মাধ্যমে phonetics বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে পারি।

সাম্প্রতিকভাবে এ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমার সহধর্মীনি রাণী য়েন য়েন-এর মতামত হলো যে বাংলা হরফ ব্যবহার করেও উচ্চারণগত কিছু সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। যথা: বাংলা হরফের "শ", "স", "ষ" বর্ণসমূহকে প্রেক্ষাপট

ভিত্তিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে। একইভাবে বাংলার "চ", "ছ", "জ", "য" ইত্যাদি বর্ণসমূহের বিশেষ চিহ্নযুক্তভাবে বা চিহ্ন ছাড়া ব্যবহার করা যায়। তবে এখানে হয়তো আবারও বলে রাখা দরকার যে আমি চাকমা বর্ণ বর্জন করে বাংলা বর্ণ ব্যবহার করার পক্ষে নই। তবে বাংলা বর্ণ ব্যবহার করে কেউ চাকমা শব্দ উচ্চারণ করলে অন্তত তারা যাতে সঠিকভাবে চাকমা শব্দগুলো উচ্চারণ করবেন (যেমন: ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে)। সেটাই আমার উদ্দেশ্য।

Roman হরফের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংস্কার করা যেতে পারে। ফরাসী ভাষায় দুটো c বর্ণ রয়েছে। একটির নীচে s যুক্ত রয়েছে অন্যাটি s বর্ণ ব্যতীত। প্রথমোক্ত বর্ণ ব্যবহার করলে s বর্ণের উচ্চারণ হয় ও দ্বিতীয় বর্ণ ব্যবহার করলে k বর্ণের বা ক্ষেত্রমতে s বর্ণের উচ্চারণ হয়।

যারা ভাবছেন যে চাকমা বর্ণ ব্যবহার করলেই আলোচ্য সমস্যার সমাধান হবে, তাদের কাছে বলবো যে, আমি তাতে দ্বিমত পোষণ করবো না, তবে সেই ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সমস্যা রয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে Bengali Tongue Interference (বা English Tongue Interference) এর কারণে। তবে চাকমা লিপি যদি প্রথম লিপি হয় তাহলে উচ্চারণগত সমস্যা হয়তো নাও থাকতে পারে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ও সংখ্যাগুরুর ভাষা বাংলার আধিপত্যের কারণে অধিকাংশ চাকমা ভাষীকে চাকমা ভাষার অক্ষর জ্ঞান দেওয়া এবং বিশেষ করে প্রথম লিপি হিসেবে অক্ষরজ্ঞান প্রাপ্ত করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অথবা অদূর ভবিষ্যতে দূরূহ ব্যাপার। সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো করা যেতে পারে। তাই, যথাসাধ্য প্রচেষ্টা ও প্রয়াস সত্বেও অনেক চাকমাভাষী চাকমা লিপিতে নিরক্ষর রয়ে যেতে পারে। সম্ভবত চাকমা বর্ণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে Roman, বাংলা ও চাকমা বর্ণমালাকে কেবল উচ্চারণের সুবিধার্থে phonetics -এর স্বার্থে বিশেষ চিহ্ন সংযুক্ত করে ব্যবহার করাটাই সঠিক উচ্চারণ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সর্বাধিক বাস্তবমূখী পদক্ষেপ হবে।

পাশাপাশি আমরা চাকমা লিপির ব্যবহার প্রসারের জন্যও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারি। আমার দপ্তরে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকমা লিপি ব্যবহার করি। পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলেও চাকমা লিপির ব্যবহার ধীর গতিতে হলেও বেড়ে চলেছে। এই ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীগণের যথাযথ ভূমিকা কাঙ্খিত।

বিগত ১৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে রাঙ্গামাটিতে একটি পরামর্শ সভায় আমি উপরোক্ত মতামতসমূহ একটি বিতরণকৃত প্রবন্ধ ও power point presentation এর মাধ্যমে উপস্থাপন করি। পাশাপাশি তনয় দেওয়ান "চাকমা বর্ণমালা ও বানানরীতি" শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। পরামর্শ সভায়

শীর্ষস্থানীয় অনেক চাকমা সাহিত্যিকগণের উপস্থিতি ও অংশগ্রহনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।[২]

নিম্নে পরামর্শ সভার প্রকাশিত সুপারিশমালা বর্ণনা করছি।

সভায় অংশগ্রহনকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে দু'য়েক জন চাকমা বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ ব্যবহার না করার পক্ষে মতামত দেন। তবে সংখ্যাগুরু অংশগ্রহনকারীগণ প্রেক্ষাপট অনুসারে এবং বিশেষ করে উচ্চারণের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বাংলা, ইংরেজী বা অন্যান্য লিপি ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন অবস্থান গ্রহন করেননি। পরামর্শ সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌছানো হয়।

- কোলকাতা, ভারতে শিশু করুণা সংঘের প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার (বার্মা) ও অন্যান্য দেশের চাকমা প্রতিনিধিগণের নিজস্ব অর্থায়নে চাকমা ভাষা ও বর্ণমালার উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা।
- চাকমা ভাষা যথাযথভাবে উচ্চারণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ধ্বনিতত্ব বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণসহ চাকমা ভাষার ধ্বনিতত্ব বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা (আশা করা যায় যে এই সম্মেলনে চাকমা ভাষা, লিপি, বানান পদ্ধতি ও ধ্বনিতত্বের বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানো যাবে অথবা অন্তত ঐক্যমত আনয়নের কার্যকর পদ্ধতি নিরূপিত হবে)।
- চাকমা বানান রীতি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা।
- চাকমা ভাষাতে অপ্রয়োজনীয় বিদেশী শব্দের হস্তক্ষেপ রোধের উদ্দেশ্যে শব্দসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা ও প্রয়োজনীয় প্রচারাভিযান করা (নাটক মঞ্চায়ন, ফিল্ম তৈরী, Facebook Page পরিচালনা, প্রকাশনা ইত্যাদি)
- বিকৃত ও বিলোপকৃত জায়গার নামসমূহের প্রকৃতরূপে নামকরণ ও পুনরুজ্জীবনে সমন্বিত ভূমিকা রাখা।
- চাকমা ভাষা বোর্ড অথবা একাডেমী গঠন করা (কোলকাতা সম্মেলনে যেহেতু বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের চাকমা অধ্যুষিত প্রধান প্রধান অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব

[২] পরামর্শ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সুব্রত খীসা, দেবপ্রিয় চাকমা, শুভ্রজ্যোতি চাকমা, ঝিমিত ঝিমিত চাকমা, প্রসন্ন কুমার চাকমা, অম্লান চাকমা, তনয় দেওয়ান, মৃত্তিকা চাকমা, শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার মহাথেরো, বিজ্ঞান্তর চাকমা ও লেখক।

থাকবে, সুতরাং এইরূপ সম্মেলনেই চাকমা ভাষা বোর্ড বা একাডেমী গঠন করা সর্বজন গ্রাহ্য হবে। বোর্ড বা একাডেমী চাকমা ভাষা সংক্রান্ত ভিন্নমত নিরসন করে নেতৃত্বমূলক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে)।

"পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক গণজাগরণ এখন জরুরীভাবে প্রয়োজন"

জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল (জাক) এর সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকার

[জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল সংক্ষিপ্তভাবে **'জাক'** নামে সবার কাছে পরিচিত। এটি-তিন পার্বত্য জেলার একটি বহুল পরিচিত সাংস্কৃতিক সংগঠন। তিন পার্বত্য জেলাতেই জাক এর সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সংগঠনের কর্মকান্ডও তিন পার্বত্য জেলাতেই বিস্তৃত।

জাক এর প্রধান কাজ আদিবাসী সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া ও উৎসাহিত করা, এবং তাদের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করা। জাক এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাষায়, বিশেষত চাকমা ভাষায়, সৃজনশীল লেখা-লেখির চর্চা ও বিস্তার ঘটানো। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন। শুরু থেকে এ পর্যন্ত জাক এর উদ্যোগে রাঙ্গামাটি ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় ২৭টির মত নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে।

নাটকের বাইরেও জাক এর সৃজনশীলতার চর্চা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত। প্রতিবছর বিজু উপলক্ষে জাক এর উদ্যোগে আয়োজিত **'বিজু মেলা'** এখন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও লিটল ম্যাগাজিন ও মননশীল লেখালেখির চর্চার মাধ্যমে জাক কর্তৃক এ পর্যন্ত ৬৭টি প্রকাশনা বের করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুল পরিচিত এই সংগঠনটির পিছনের ইতিহাস, অতীতের সাফল্য, বর্তমান কর্মকান্ড ও ভবিষ্যত চিন্তা-ভাবনা, সর্বোপরি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক সাংস্কৃতিক চিত্র বোঝার জন্য, জাক এর কিছু প্রতিষ্ঠাতা সদস্যসহ অন্যান্য আরো কয়েকজন সদস্যের সাথে আলাপচরিতায় বসা হয়। আলাপচারিতার বিভিন্ন বিষয়গুলো এখানে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হল।

আলাপচারিতায়, জাক এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন: ঝিমিত ঝিমিত চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা, শিশির চাকমা, মিহির চাকমা ও রনেল চাকমা। প্রথমোক্ত তিন জন জাক-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং রনেল চাকমাসহ মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক

হিসাবে বর্তমানে কর্মরত। মিহির চাকমা পেশায় একজন আইনজীবি এবং বর্তমানে জাক-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং সনে, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে সাক্ষাৎকারটি গ্রহন করেছেন কীর্তি নিশান চাকমা ও শশাংক বিকাশ চাকমা। সাক্ষাৎকারের শেষ অংশে, এ পর্যন্ত জাক-এর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রকাশনা এবং মঞ্চস্থ নাটক সমূহের তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতা চর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য মোনঘরের পক্ষ থেকে জাক'কে সন্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে]

বিষয় : জাক এর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

মৃত্তিকা চাকমা: সুহৃদ চাকমা-ই 'জাক' (JAC: Jum Aesthetic Council) এর প্রতিষ্ঠাতা বা রূপকার। ১৯৮১/৮২ সালের দিকে তিনি যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশুনা করেন, তখন আমি রাঙ্গামাটি কলেজে অধ্যয়নরত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার সময়ে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই - একই বিভাগে অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে। জাক এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সুহৃদ চাকমাসহ যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁরা হলেন: সুসময় চাকমা (বর্তমানে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ইন্সটিটিউটের পরিচালক হিসাবে কর্মরত), প্রশান্ত ত্রিপুরা (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক এবং বর্তমানে উন্নয়ন পরামর্শক হিসাবে কর্মরত), পুলক জীবন খীসা (জুনোসদক চাকমা নামে তখন লেখালেখি করতেন, বর্তমানে ঢাকায় পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত) ও রণজ্যোতি চাকমা (রাসকিন চাকমা নামে তখন লেখালেখি করতেন, বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত)। এছাড়াও অন্যান্যরাও আমাদের দলে যুক্ত ছিলেন; যেমন কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা (বর্তমানে সরকারী চাকুরী করছেন)।

বয়সে সুহৃদ আমাদের থেকে সামান্য বেশী বয়সী ছিলেন। আর বাকিরা আমরা সবাই ছিলাম বয়সে ও ক্লাশে সমসাময়িক।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: তখনকার সময়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে (সেই সময়ে দেশে কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না) পড়াশুনারত ছাত্র-ছাত্রীরা এক এক নামে আলাদা সংগঠন করেছিলেন। তবে মূলত: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক 'হিল্লো লিটারেচার গ্রুপ' (১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক 'মুঢ়োল্যা লিটারেচার গ্রুপ'ই ছিল সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকায়। যতদুর মনে পরে, হিল্লো

লিটারেচার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৮০ সালে, আর মুঢ়োল্যা লিটারেচার গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে।

তবে এইসব সংগঠন সমূহের মধ্যে তেমন পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল না। যদিও সদস্যরা একে অপরকে পারস্পরিকভাবে চিনতেন।

মৃত্তিকা চাকমা: তখন বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হতো। মূলত: লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা। সেগুলোতে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি থাকতো।

তবে সুহৃদ বাবু প্রায় সকলের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তখনকার সময়ে মূলত: চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হতো। আমি, কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা ও শিশির চাকমা তখন বর্তমান বনরূপাস্থ পোড়াভিটায় একসাথে কাছাকাছিভাবে থাকতাম। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে সুহৃদ চাকমা রাঙ্গামাটি হয়ে গ্রামের বাড়ী দীঘিনালায় যেতেন এবং যখনই সম্ভব হত- কয়েকদিন থাকতেন আমাদের সাথে। সুহৃদ চাকমা এত সুন্দর এবং গুছিয়ে চিঠি লিখতেন আমাদের সবাইকে, কিন্তু তার চিঠিগুলি হারিয়ে ফেলেছি। আসলে আশির দশকের শেষের দিকের অশান্ত সময়ে, ভয়ে একটি বাক্সে লুকিয়ে রেখেছিলাম। দীর্ঘদিন সেই বাক্সের কোন খোঁজ নিতেই ভূলে গিয়েছিলাম। একদিন হঠাৎ মনে হওয়ার পর দেখি, বাক্সে উইপোকা ঢুকে ভিতরের যাবতীয় বই ও অন্যান্য কাগজপত্র সবকিছু নষ্ট করে দিয়েছে। সেই কাগজপত্রের মধ্যে সুহৃদ বাবুর চিঠিগুলোও ছিল।

শিশির চাকমা: ১৯৮১ সালের, ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে রা-ক (RAC: Rangamati Aesthetic Council) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই বছরই রাক-এর উদ্যোগে প্রথম বিজু অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয় রাঙ্গামাটি পৌরসভা টাউন হলে। ফুল বিজু দিনে অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণমালা, পুরাতন পান্ডুলিপি ও চিত্র প্রদর্শনী, কবিতা পাঠ এবং সবশেষে পরের দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখনো মনে আছে সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। আদিবাসী ভাষায় কবিতা পাঠের একটা সেশন ছিল। সেটি শেষ হতে না হতেই একেবারে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: ১৯৮১ সালে আমরা একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করি। সেখানেই সর্ব প্রথম রাধামন ধনপুদি পালার ২য় পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল। সেসময়- চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে ছত্রং ও বিজুফুল নামে দু'টি লিটল ম্যাগাজিন পরপর দুই বছরে আমরা প্রকাশ করেছিলাম।

শিশির চাকমা: তখনকার সময়ে যে কোন ম্যাগাজিন একই নামে তিনবারের অধিক প্রকাশ করা যেতো না। আইনগত ঝামেলা ছিল। এই ভয়ে ঝামেলা এড়ানোর জন্যে আমরা বিভিন্ন নামে একেকবার একটি নুতন ম্যাগাজিন প্রকাশ করতাম। ইরুক নামে আমরা তখন একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছিলাম।

মূলত: চাকমা সহ বিভিন্ন আদিবাসী ভাষায় সৃজনশীল লেখালেখি চর্চার শুরু আমরাই প্রথম করেছিলাম। সেসময়ে স্ব স্ব মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার একটি জোয়ার এসেছিল। তখনো অনেকেই লেখালেখি করতেন। যেমন প্রয়াত সলিল রায়, প্রয়াত ডা. ভগদত্ত খীসার মতো লেখকরা। কিন্তু তাঁরা লেখালেখি করতেন মূলত: বাংলায়। আমাদের আদিবাসী ভাষায়ও যে সাহিত্য চর্চা এবং সৃজনশীল রচনা লেখা যায়, তা' আমরাই প্রথম দেখিয়েছিলাম। আমাদের দেখাদেখি পরে তারাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখা শুরু করেন।

আমার আরও মনে আছে রাঙ্গামাটিতে প্রথম বিজুর সময় দেওয়ালে ম্যুরাল আঁকার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ১৯৮১ সালে। কনক চাঁপা চাকমা (বর্তমানে স্বনামধন্য শিল্পী/চিত্রকর) সহ অনেকেই এই উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন। দেওয়ালটা আমরা বেছে নিয়েছিলাম বনরূপার ওয়াপদা'র দেওয়াল। একেবারে প্রধান সড়কের উপরে। মনে আছে তখন আমাদের মনে যথেষ্ট ভয়ও ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম তখন ভীষণ অশান্ত। কখন আবার সরকারী বাহিনীর রোষানলে না পড়ে যাই আমরা সবাই।

মৃত্তিকা চাকমা: রাক তো প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮১ সালে। সেসময়ে আমরা নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করতাম। ১৯৮৩ সালের পরে রাক এর বদলে জাক নামটি বেছে নেওয়া নয়।

ঝিমিত চাকমা: সেটি সঠিক নয়। জাক এর নামকরণ হয় আরও পরে, ১৯৮৬ সালে।

শিশির চাকমা: রাক সুহৃদ চাকমার দেয়া নাম। রাক বললে কেবল মাত্র রাঙ্গামাটিকে বোঝানো হয় বলে নামটি পরিবর্তন করে জাক নামকরণ করা হয় ১৯৮৬'র শেষ কি ৮৭ সালের প্রথম দিকে।

মৃত্তিকা চাকমা: হ্যাঁ হ্যাঁ এখন মনে পড়ছে। জাক নামটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা ২নং রেল গেটের রাস্তার পাশে বসে সভা করেছিলাম। কিন্তু সিদ্ধান্তটি আগেই নেয়া হয়েছিল। আমরা রাঙ্গামাটির কাঠালতলীস্থ মৈত্রী বিহারে বসে সবাই মিটিং করেছিলাম।

ঝিমিত চাকমা: আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি, সালটা ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে। একটা বিশেষ ঘটনার কারণে। আমি মোনঘর বিদ্যালয়ে সবেমাত্র যোগ দিয়েছি। সামরিক বাহিনীর ভয়ে আমার অনেক বই-পত্র একটা বস্তায় ভরে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। জাক এর কি একটা কাজে বস্তাটি খুঁজতে গিয়ে দেখি, মাটির আদ্রতার কারণে বস্তার ভিতরের সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে আমার বই-পত্র ও অনেক অমূল্য পুরনো কাগজপত্র ছিল। সবকিছু হারিয়েছি।

বিষয় : জাক এর নাটক মঞ্চায়ন

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: ১৯৮৩ সালে চিরজ্যোতি চাকমা রচিত 'আনাত ভাজি উধে কা' মু' জাক এর প্রথম নাটক। মঞ্চস্থ হয় রাঙ্গামাটি পৌরসভা টাউন হলে। তখন

বনরূপা থেকে বাস ভাড়া করে পৌরসভায় লোক আনতে হয়েছিল। এখনো মনে পড়ে, সেসময়ে লোকজন বিশ্বাসই করতে চায় না চাকমা ভাষায় নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করা সম্ভব। লোকজন অভ্যস্ত ছিল যাত্রা-পালা দেখতে। অনেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। তীর্যক মন্তব্যও।

শিশির চাকমা: এর পরে ১৯৮৪ সালে, শান্তি ময় চাকমা রচিত 'যে দিনোত যেকাল' মঞ্চস্থ হয়।

মৃত্তিকা চাকমা: আমার মনে আছে আমি ১৯৮০ সালে একটি নাটক লিখেছিলাম। নাম ছিল 'জাদ মুয়ত মুদে হন্না'। পরের বছরে মঞ্চায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলাম, মারিশ্যাতে। সদলবলে সেজন্যে মারিশ্যায়ও গিয়েছিলাম। কিন্তু করা যায় নি। জেএসএস-এর বাধা ছিল। চুপিসারে সবাই চলে এসেছিলাম রাঙ্গামাটিতে।

শিশির চাকমা: ১৯৯৫ সালে মৃত্তিকা চাকমা রচিত 'দেবংসি আহ্‌দর কালা ছাভা' রিহার্সাল করার পরও মঞ্চস্থ করা যায়নি। নাটকটি রচিত হয় ১৯৮০ সালে।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: ১৯৮১ সালেও এই 'দেবংসি আহ্‌দর কালা সাভা' নাটকটি বাঘাইছড়ি উপজেলায় মারিশ্যায় মঞ্চস্থ করার জন্য অনুমতি মেলেনি।

মৃত্তিকা চাকমা: ১৯৮২ সালে রাঙ্গামাটির বাইরে চট্টগ্রামের পটিয়ায় আন্তর্জাতিক যুব উৎসবে যোগদান করেছিলাম। মহিলাদের গাইড হিসেবে নেয়া হয় নিরূপা দেওয়ানকে। একসাথে গাড়ীতে করে গিয়েছিলাম।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: ১৯৯১ সালে মৃত্তিকা চাকমা রচিত 'মহেন্দ্রর বনভাজ' নাটকটি ঢাকা শিল্পকলা একাডেমীতে মঞ্চস্থ হয়। এটিই ঢাকাতে আমাদের প্রথম নাটক। এর পরে অনেকবার ঢাকায় যাওয়া হয়েছে, নাটক করার জন্য। বিশাল দল-বহর নিয়ে, সে সময় আমরা ঢাকাস্থ মিরপুরের বনফুল চিলড্রেন্স হোম এ অবস্থান করেছিলাম।

এরও বাইরে একটি তথ্য উল্লেখ করি। আমার রচিত 'আন্দালত পহ্‌র' প্রথম চাকমা নাটক যা' ভিডিওতে ধারণ করা হয়। তদানীন্তন স্থানীয় সরকার পরিষদের (বর্তমানে জেলা পরিষদ) মাননীয় চেয়ারম্যান প্রয়াত পরিজাত কুসুম চাকমা, যিনি স্কুল জীবনে আমার শিক্ষক ছিলেন, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (বর্তমানে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট) এর মাধ্যমে নাটকটির জন্য কিছু অর্থ সহায়তা প্রদান করেন। নাটকটির পরিচালক ছিলেন ফয়েজ জহির। তিনি আমাদের সবার ঘনিষ্ট বন্ধু।

মৃত্তিকা চাকমা: নাটকটি কোন রকমের সম্পাদনা ছাড়া রাঙ্গামাটি ভিডিও দোকানে দেয়া হয়েছিল বিক্রির জন্য। শুনেছি বেশ কিছু কপি বিক্রিও হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভাগে কিছুই জুটেনি।

বিষয় : জাক এর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে বাংলাদেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্ক

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: আমার স্পষ্ট মনে আছে, ১৯৯০ সালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাথে পরিচয়। তিনি কি কাজে যেন রাঙ্গামাটি এসেছিলেন। একদিন মৃত্তিকা চাকমা ও শিশির চাকমা তার সাথে দেখা করেন।

এর পরে, ১৯৯৬ সালে মূলত: প্রয়াত শ্রীমৎ চিত্তানন্দ মহাথেরোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (গাড়ী টানা) অনুষ্ঠানের পর থেকে তার সাথে ঘনিষ্টতা বাড়ে। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল রাঙ্গাপানিস্থ হাদাঙ্যা বিলে শুষ্ক মৌসুমে, কারণ বর্ষা মৌসুমে বিলটি লেকে পানিতে তলিয়ে যায়।

তিনি উঠেছিলেন তৎকালীন জেলা পরিষদ রেস্ট হাউসে (যা' বর্তমানে আঞ্চলিক পরিষদ রেস্ট হাউস)। এসে বিরোধী দলের ডাকা হরতালে ও অসহযোগ আন্দোলনে আটকে যান। আমরা পালা করে তার জন্য রেস্ট হাউসে খাবার (ভাত) নিয়ে যেতাম। একদিন কাপ্তাই হ্রদে একসাথে নৌকায় চড়তে যাই। চড়ার সময় পালাগান বিষয়ে অনেক কথা হয়। এক পর্যায়ে চাকমাদের **"চাদিগাং ছাড়া পালা"** আলোচনায় আসে। চাকমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ পালাগানটি লোকালয়ে শ্রবণ করলে অমঙ্গল হয় অর্থাৎ ঐ স্থান থেকে উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই লোকালয়ের বাইরে নির্জন স্থানে এ পালাগান শোনা হয়।

তিনি বললেন, তাহলে আমরা পানির উপর নৌকাতে বসে শুনবো। সেটিই আমরা আয়োজনের ব্যবস্থা করলাম। আলোচনায় অনেক বিষয় আসলো। এক পর্যায়ে জানতে চাইলেন, চাকমা ভাষায় কোন লেখালেখি হচ্ছে কি না? যখন প্রথম জানতে পারলেন যে, চাকমা ভাষায় আজো কোন উপন্যাস নেই, পরে ঢাকায় ফেরত গিয়ে তিনি একটি ম্যাগাজিনে 'একটি চাকমা উপন্যাস চাই' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি নিয়ে সেসময় অনেক লেখালেখি হয়েছিল।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তখন এনসিটিবি'র (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) এর সদস্য ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিসত্বাসমূহের লোককাহিনী অন্তর্ভূক্ত করার জন্যে গণস্বাক্ষর নিয়ে একটি দরখাস্ত বোর্ডের চেয়ারম্যানের বরাবরে দিতে। আমরা সাথে সাথেই সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিই। তার বদান্যতায় চাকমাদের **'কুনোব্যাঙের গল্প'টি** ৪র্থ শ্রেণীর এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়। (বর্তমানে সেটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে)। সেখানে ইংরেজ লেখক যোনাথন সুইফট্ এর **'গালিভারের ভ্রমণ'** অর্ন্তভূক্ত হওয়ার কথা ছিল।

মৃত্তিকা চাকমা: মূলত নাটকের মাধ্যমেই আমাদের/জাক এর সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য সংস্কৃতিক কর্মীদের পরিচয় হয়। জনপ্রিয় নাট্যকার মামুনুর রশীদের সাথে

আমাদের পরিচয় অনেকটা কাকতালীয়ভাবে। রাঙ্গামাটিতে এসে হরতালে আটকা পড়ে যান। যত দিন থাকার কথা ছিল, তার চেয়ে বেশী দিন থাকতে বাধ্য হন।

এর মধ্যেই আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা নেড়ে যায় যা' এখনও অটুট। পরবর্তীতে ঢাকায় ফেরত গিয়ে তাঁর সংস্কৃতি মন্ডলের অন্য আরও অনেকের সাথে যোগাযোগ ও পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা ঢাকায় গিয়ে নাটক করেছি। উনার প্রচুর সহায়তা ছিল।

ঝিমিতি ঝিমিত চাকমা: প্রগতিশীল সকল সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে জাক-এর সম্পর্ক আছে।

মৃত্তিকা চাকমা: জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সাথেও যোগাযোগ আছে।

শিশির চাকমা: ১৯৯৮ এ প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা আয়োজন করার পর থেকেই যোগাযোগটা বেড়ে যাচ্ছে এবং সুদৃঢ় হচ্ছে।

মৃত্তিকা চাকমা: সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে সম্পর্কটা বরাবরই ভালো। আমার লেখা 'হক্কানির ধনপানা' নাটকটি ঢাকায় পাঁচ বার মঞ্চস্থ হয়েছিল। মিরপুর স্টেডিয়ামে এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল সাধারণ দর্শকদের জন্য।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: আমার লেখা 'কাত্তোন' নাটকটি ২০০১ সালে জাতীয় নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়েছিল।

বিষয় : আদিবাসী মেলা এবং সাম্প্রতিকালে জাক এর কার্যক্রম।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: ১৯৯৭ সালে জাক **"পার্বত্য চট্টগ্রাম নাট্যোৎসব মেলা"** আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। এ লক্ষে মৃত্তিকা চাকমা ও শিশির চাকমা ঢাকায় যান, উদ্দেশ্য অর্থ সংগ্রহ করা। পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে বিশিষ্ট নাট্যকার জনাব মামুনুর রশিদের সহযোগিতা চাওয়া হয়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন মি: কল্পরঞ্জন চাকমা এবং সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন জনাব ওবায়দুল কাদের (বর্তমানে যোগাযোগ মন্ত্রী)।

কল্প বাবু আমাদের বাজেট দেখে ভড়কে যান। আর্থিক সহায়তা প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তখনই মামুনুর রশিদের পরামর্শক্রমে **"পার্বত্য চট্টগ্রাম নাট্যোৎসব"** এর বদলে **"পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা"** আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়া নয় ঢাকায় বসে। ওবায়দুল কাদেরের সহায়তায় একটি বেসরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে এক লক্ষ টাকা এবং তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা ডা. এস. এ. মালেক এর কাছ থেকে আরও ৫০ হাজার টাকা অনুদান পাওয়া যায়। ডা. এস. এ. মালেক এর সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন মামুনুর রশীদ।

১৯৯৮ সালে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান আয়োজনের পর দেখা গেল, জাক-এর কাছে বাড়তি দেনা দাড়িয়েছে ২৯ হাজার

টাকা। মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তহবিল থেকে লোন নিয়ে উক্ত দেনা পরিশোধ করা হয়।

মৃত্তিকা চাকমা: সেই ১৯৯৮ সালে শুরু। মাঝখানে দুই বছর আদিবাসী মেলা আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। ২০০৭ সালে দেশে বিরাজমান জরুরী অবস্থার কারণে আর অন্য এক বছরে সম্ভব হয়নি আর্থিক অসঙ্গতির কারণে।

শিশির চাকমা: বর্তমানে জাক এর দুই শতাধিক সদস্য রয়েছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সব এলাকা এবং বসবাসরত সকল জাতিসত্বার সদস্য।

মৃত্তিকা চাকমা: পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু আদিবাসী অনেক জাতিসত্বা বসবাস করে। তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রার্চুয্য তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর এক একটি বিষয় নিয়ে আমরা আদিবাসী মেলাকে সাজাই। ২০১০ সালের আদিবাসী মেলাকে খুমি বর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপন করেছিলাম।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: খুমিদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি উদ্যোগ নিই। যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সেগুলোর ভিত্তিতে ২০০৪ সালে **'লাঙ'** নামের একটি বই প্রকাশিত হয় ।

বিষয় : পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চিত্র: বর্তমান অবস্থা

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: আমি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করবো। এক: লোকজ ধারা; দুই: আধুনিক সাংস্কৃতিক ধারা। লোকজধারাটিই আজ সবচেয়ে বেশী হুমকির সম্মুখীন সকল জাতিসত্বার মধ্যে। যেমন আমার জানা মতে চাকমাদের মধ্যে বর্তমানে সঠিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেংখুলী বেঁচে আছেন মাত্র দুই জন এবং সবাই এখন বয়সের ভারে ন্যুজ্য। অন্যান্য জাতিসত্বা সমূহের অবস্থাও একই, বরং আরও খারাপ বলা যেতে পারে।

কিন্তু সৃজনশীল আধুনিক যে ধারাটি, তা' যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে হচ্ছে না।

নাচের ক্ষেত্রে, ত্রিপুরাদের লোকনৃত্যগুলো খুবই সুন্দর কিন্তু নতুন কোন নাচ আর সৃষ্টি হচ্ছে না। চাকমাদের লোকনৃত্য হিসাবে আজকাল যা' চালানো হচ্ছে তা মূলত: বিকৃত বাংলা লোকনৃত্য। অবশ্য মারমাদের ক্ষেত্রে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট-এর কর্মকর্তা চথোয়াইপ্রু বাবু নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তঞ্চঙ্গ্যাদের ক্ষেত্রে সুফলা তঞ্চঙ্গ্যা ও সত্য বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যার অবদান স্মরণ করতে হয়। ইদানিংকালে বমদের বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু নতুন নাচ তৈরী হয়েছে।

শিশির চাকমা: যুগ পাল্টিয়েছে, সময় পাল্টিয়েছে। আমাদের সমাজ ও বদলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি কেন হারিয়ে যাবে?

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রামে কত কিছু করা হয়। সরকারী-বেসরকারী উন্নয়নের

ফুলঝুরির বাহার কত! এনজিও গুলো তো কতো রকমের উন্নয়ন করতেছে! কিন্তু সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য কিছুই নেই। অথচ আমাদের ভূলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, আমাদের আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই আমাদের স্বকীয় পরিচয়ের মূল ভিত্তি। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যদি বিপন্ন হয়, তখন আমাদের পরিচিতিই বিলুপ্তির সম্মুখীন হবে।

শিশির চাকমা: চাকমা বর্ণমালা দিয়ে লেখা জাক-এর প্রথম বই **'দিগপাদা'**। বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে আমরা পরে আর তেমন কিছু করতে পারি নি। ব্যক্তিগতভাবে চাকমা ভাষায় লেখালেখি করি বাংলা বর্ণমালা দিয়ে। অন্য ভাষাগুলোর ব্যাপারে তেমন বলতে পারবো না। জাক থেকেও তেমন কিছু করা সম্ভব হয় নি আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যার কারণে।

তবে ভাষা নিয়ে ইদানিং যা করা হচ্ছে তা উৎসাহব্যঞ্জক। নিজস্ব বর্ণ ও ভাষা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হলে অবশ্যই ভালো হবে।

ঝিমিতি ঝিমিত চাকমা: ভারতের মিজোরোমের **'চাকমা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে'** এখন প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চাকমা বর্ণমালায় পড়ালেখা শেখানো হয়। এটার সুফল পেতে বেশী দিন লাগবে না।

মৃত্তিকা চাকমা: ইদানিং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী সমূহের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও যোগাযোগ ক্রমাগত অব্যাহত রয়েছে। জাক-এর লোকজন মিজোরামে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান করেছে। ত্রিপুরায় **'বিজু সম্মেলন'** ইদানিং প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। জাক থেকেও লোকজন যায়। অন্য জনগোষ্ঠীর লোকজনও তাদের জনগোষ্ঠীর লোকজনের সাথে যোগাযোগ রাখে। এদের মধ্যে জাক এর লোকজনও রয়েছে।

শিশির চাকমা: জাক ভারতের চাকমা ভাষার লেখকদেরকে রাঙ্গামাটিতে সন্মাননা দিয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এটিই প্রথম উদাহরণ।

মৃত্তিকা চাকমা: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চাকমা ভাষায় উপন্যাস না থাকার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন। তিনি চাকমা ভাষায় উপন্যাস চেয়েছিলেন। সেটি এখন বাস্তবে হয়েছে। দীঘিনালার কেভি দেবাশীষ চাকমা **"চাকমা ভাষায়"** উপন্যাস লিখেছেন।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: তবে লেখকদেরকে নিজেদের বই নিজেদেরকেই প্রকাশ করতে হয়। এটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। আর পাঠক সমস্যাটা তো রয়েই গেছে।

বিষয় : ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা

রনেল চাকমা: আমি অবশ্যই আশাবাদী। ইদানিং অনেক জায়গায় অনেক ধরনের উদ্যেগ নেয়া হচ্ছে। যেমন, জুরাছড়ি উপজেলায় 'বনযোগী ছড়া কিশোর-কিশোরী সমিতি' তাদের কার্যক্রম নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও নিয়মিত প্রকাশনা প্রকাশিত হচ্ছে।

ঝিমিত ঝিমিত চাকমা: জাক কে অনুসরণ করে, এখনতো দেখি আনাচে-কানাচে অনেক জায়গায় পার্বত্য লোকজ মেলা করা হচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠি থেকে শিক্ষিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব উঠে আসতে হবে। নইলে সংকটটা থেকে যাবে। বমদের মধ্যে **"ইয়াং বম এসোসিয়েসন"** এবং চাকদের মধ্যে ধুংছাঅং চাক ও চিংহ্লামং চাক অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।

মিহির চাকমা: পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল জাতিসত্বাসমূহের সাথে অটুট সাংস্কৃতিক বন্ধন সৃষ্টি করা দরকার। এই কাজটাই আমরা জাক এর মাধ্যমে অর্জন করতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের স্বকীয়তাকে লালন করতে হলে আমাদের আবারও একবার সাংস্কৃতিক পূর্নজাগরণ দরকার।

শিশির চাকমা: **পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক গনজাগরণ এখন জরুরীভাবে প্রয়োজন।**

মৃত্তিকা চাকমা: আমাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা প্রতি বছর প্রয়াত সুহৃদ চাকমার নামে **'সুহৃদ সাহিত্য পুরষ্কার'** প্রদান করা। আর্থিক ও সাংগঠনিক সমস্যার কারণে তা' এখনও সম্ভব হয়ে উঠে নি। তবে বিগত সময়ে, প্রথম বারের মত জাক সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে- প্রয়াত সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, প্রয়াত বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও প্রয়াত সুহৃদ চাকমাকে।

শিশির চাকমা: আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি নিয়মিতভাবে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করার।

মৃত্তিকা চাকমা: জাক এর এযাবত কালের সমগ্র প্রকাশনা সংকলন আকারে প্রকাশ করার চিন্তা-ভাবনা আমাদের রয়েছে। আর্থিক সমস্যার সমাধান করা গেলে তা' শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। এরও বাইরে, আমাদের আদিবাসী ভাষায় কাব্য সংকলন, গল্প সংকলন ইত্যাদি প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে।

ঝিমিতি ঝিমিত চাকমা: যেমন, লোকজ সাহিত্য সংকলন।

মিহির চাকমা: বিশ বছর ধরে জাক প্রতি শুক্রবার নাচ ও গানের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ইউনিসেপের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কাজে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেছে।

মৃত্তিকা চাকমা: জাক এর এই অবস্থানে আসার জন্য মোনঘরের অবদান অবশ্যই স্মরণীয়। কারণ জাক এর প্রতিষ্ঠাতারা প্রায় সকলেই মোনঘরে কর্মরত। এক সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে না থাকলে হয়তো জাক এ পর্যায়ে আসতে পারতো না। বর্তমানে মোনঘরে যে অন্যান্য আদিবাসীরা লেখাপড়া করতে আসে তা জাক এর কারণে। আদিবাসী মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্যে মোনঘরে আসার পর থেকেই তারা মোনঘর সম্পর্কে জানে এবং বুঝতে পাওে যে, মোনঘর শুধু মাত্র চাকমাদের প্রতিষ্ঠান নয়। জাক এবং মোনঘর এক অপরের পরিপূরক।

জুম ঈস্থেটিক্স কাউন্সিল (জাক)-এর মঞ্চায়িত নাটক :

ক্রম	নাটকের নাম	নাট্যকারের নাম	মঞ্চায়নের সন
১	আনাত ভাজি উধে কা মু	চিরজ্যোতি চাকমা	১৯৮৩
২	যে দিনত যে কাল	শান্তিময় চাকমা	১৯৮৪
৩	বিঝুরামর স্বর্গত যানা	শান্তিময় চাকমা	১৯৮৫
৪	আন্দারত জুনিপহ্র (নাটিকা)	শান্তিময় চাকমা	১৯৮৬
৫	দেবংসি আহ্দর কালা ছাবা	মৃত্তিকা চাকমা	১৯৮৯
৬	গোঝেন	মৃত্তিকা চাকমা	১৯৯০
৭	মহেন্দ্রর বনভাস	মৃত্তিকা চাকমা	১৯৯১
৮	একজুর মানেক	মৃত্তিকা চাকমা	১৯৯২
৯	অহ্য় নয় বৈদ্য	ডাঃ ভগদত্ত খীসা	১৯৯৩
১০	ঝরাপাদার জিংকানি	শান্তিময় চাকমা	১৯৯৪
১১	জোঘ্য	মৃত্তিকা চাকমা	১৯৯৪
১২	অদত্	ঝিমিত ঝিমিত চাকমা	১৯৯৫
১৩	আন্দলত পহ্র	ঝিমিত ঝিমিত চাকমা	১৯৯৬
১৪	হক্কানীর ধনপানা	মৃত্তিকা চাকমা	১৯৯৯
১৫	কাত্তোন	ঝিমিত ঝিমিত চাকমা	২০০০
১৬	এগাত্তুরর তরণী	মৃত্তিকা চাকমা	২০০১
১৭	ভুত	মৃত্তিকা চাকমা	২০০২
১৮	দুলোকুমুরী	তরুণ চাকমা মনিবো	২০০৩
১৯	অঈনজেব	ঝিমিত ঝিমিত চাকমা	২০০৪
২০	চিত্রা নদী পারে	মৃত্তিকা চাকমা	২০০৫
২১	গুয়োচেল্যা বলী	সন্তোষ চাকমা	২০০৬
২২	আমা স্কুল (মুক্ত নাটক)	ঝিমিত ঝিমিত চাকমা	২০০৬
২৩	মুরোর রানজুনি (পাপেট)		২০০৭
২৪	আহ্জারী মু বাহ্	ঝিমিত ঝিমিত চাকমা ও ফয়েজ জহির	২০০৮
২৫	পহ্র (পথনাটক)		২০০৮
২৬	ফিরিয়	ঝিমিত ঝিমিত চাকমা	২০১৩
২৭	দুলো পেদার দলী নাজানা	শান্তিময় চাকমা	২০১৪

জুম ঈস্থেটিক্স কাউন্সিল (জাক)-এর প্রকাশনাসমূহ :

ক্রম	নাম/ লেখক/ সম্পাদক	সন
১	রাধামন-ধনপুদি (ফুলপারা-২য় খন্ড)	১৯৮১
২	ইরুক	১৯৮২
৩	সত্রং, শ্যামল কুমার চাকমা	১৯৮২
৪	পাত্তলী, বীর কুমার চাকমা	১৯৮৩
৫	হিয়াংসিক	১৯৮৪
৬	সাঙেত, চন্দন চাকমা	১৯৮৪
৭	রদঙ, যশেশ্বর চাকমা	১৯৮৫
৮	একঝাক বিজোল রোদ, ঝিমিত ঝিমিত চাকমা	১৯৮৬
৯	ইধ'রেগা (কজমা সংকলন), সুখেশ্বর চাকমা	১৯৮৬
১০	কবরক জুম আঙি যায় আইলুম (সম্পাদিত খন্ড)	১৯৮৭
১১	কজ'ফুল (কজমা সংকলন), জ্ঞানদীপ্ত চাকমা (উত্তম)	১৯৮৭
১২	দিকপাদা (চাকমা বর্ণমালা বিষয়ক পত্রিকা), সুহৃদ চাকমা	১৯৮৭
১৩	বার্গী (কাব্যগ্রন্থ), সুহৃদ চাকমা	১৯৮৭
১৪	কবিতা সংকলন	১৯৮৭
১৫	বিঝু সংকলন, সুখেশ্বর চাকমা	১৯৯০
১৬	*Ray of Kajama/*, সুনীলময় চাকমা	১৯৯০
১৭	আঙ, সজীব চাকমা	১৯৯১
১৮	গঙার, তরুন চাকমা	১৯৯২
১৯	সাঙু	১৯৯৩
২০	গোঝেন (নাট্যগ্রন্থ), মৃত্তিকা চাকমা	১৯৯৪
২১	লঙথঙ/ সুনীলময় চাকমা (তারুম)	১৯৯৪
২২	জ্বলি যার বুবর বুক, অনুস্মৃতি চাকমা	১৯৯৫
২৩	তানজাং	১৯৯৬
২৪	ঘিলে কোজই	১৯৯৭

২৫	রাকা, সুখেশ্বর চাকমা পল্টু	১৯৯৮
২৬	প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ১৯৯৮ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	১৯৯৮
২৭	দ্বিতীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ১৯৯৯ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	১৯৯৯
২৮	লান, অম্লান চাকমা	১৯৯৯
২৯	লাম্প্রা, অম্লান চাকমা	২০০০
৩০	৩য় পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ২০০৩ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	২০০০
৩১	দিকপাদা- ২	২০০০
৩২	ছড়া সংকলন (হাল পালনি সংখ্যা)	২০০০
৩৩	৪র্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ২০০৩ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	২০০১
৩৪	শিঙোর, মৃত্তিকা চাকমা	২০০১
৩৫	ছড়া সংকলন (হালপালনি সংখ্যা)	২০০১
৩৬	সাইক্রো, রনেল চাকমা	২০০১
৩৭	মাত্রিচালুমুখিপাখুবত	২০০২
৩৮	৫ম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ২০০২ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	২০০২
৩৯	লেবা, মৃত্তিকা চাকমা	২০০২
৪০	নুনয্য-পানজা (হালপালনি সংখ্যা)	২০০২
৪১	ষষ্ঠ পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ২০০৩ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	২০০৩
৪২	দিকপাদা-৩	২০০৩
৪৩	মোনমুরো কানি যার, মুক্তা চাকমা	২০০৩
৪৪	চাকমা জাতীয় বিচার পদ্ধতি ও চাকমা উত্তরাধিকার প্রথা/ বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান (পুণঃমুদ্রন)	২০০৩
৪৫	সদক (কবিতা সংকলন)	২০০৩
৪৬	আমাঙ, রনেল চাকমা	২০০৩

৪৭	৭ম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ২০০৪ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	২০০৪
৪৮	কাওয়াং, রনেল চাকমা	২০০৪
৪৯	লাঙ, শান্তিময় চাকমা (খুমী বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ)	২০০৪
৫০	হিল ভয়েস, রিপন চাকমা	২০০৪
৫১	হিল ভয়েস ২, রিপন চাকমা	২০০৫
৫২	৮ম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ১৯৯৮ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	২০০৫
৫৩	জাক'র ২৫ বর্ষপূর্তি সংকলন, সম্পাদনা: শিশির চাকমা	২০০৫
৫৪	সুহৃদ স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা মৃত্তিকা চাকমা	২০০৫
৫৫	৯ম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ১৯৯৮ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	২০০৬
৫৬	টঙ, রনেল চাকমা	২০০৬
৫৭	১০ম পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ১৯৯৮ উপলক্ষে 'স্মরণিকা'	২০০৭
৫৮	লামপুক, রনেল চাকমা	২০০৭
৫৯	তৈঠা, উ রাখাইন কায়েস	২০০৮
৬০	সুলাই-প, রিপন চাকমা	২০০৯
৬১	আদিবাসী বিষয়ক ছড়া গ্রন্থ, সম্পাদনা: রিপন চাকমা	২০০৯
৬২	আপেং, রিপন চাকমা	২০১০
৬৩	তাগ'ছা, অম্লান চাকমা	২০১১
৬৪	কেদাকতুক, অম্লান চাকমা	২০১২
৬৫	ত্রাক্রুপ, অম্লান চাকমা	২০১৩
৬৭	এলেট্, অম্লান চাকমা	২০১৪

"আমি ও আমার পৃথিবী"

অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান

কাপ্তাই লেক ও পরবর্তী পরিবেশ

রাঙ্গামাটি অবস্থান কালে পরিবেশের প্রচুর পরিবর্তন দেখলাম। পুরাতন অর্থাৎ লোয়ার রাঙ্গামাটি সম্পূর্ন জলমগ্ন। চাকমা রাজার ঐতিহাসিক রাজবাড়ী কাপ্তাই-হ্রদের পানিতে তলিয়ে গেছে। রাঙ্গামাটির পূর্ব-দক্ষিণে সমতল হাজার হাজার একর শস্যক্ষেত জলের নীচে মুখ থুবরে পড়ে আছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল কেটে বিজার্ভ বাজার ও তবলছড়ি বাজার সৃষ্টি করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি শহরটি পশ্চিম দিকে ক্রমশ: সম্প্রসারিত হচ্ছে। শুনলাম প্রায় ১ লক্ষ লোক নাকি অপসারিত হয়েছে এবং ৫৪ হাজার একর ধান্যজমি পানির নীচে তলিয়ে গেছে। সরকারের কোন পরিকল্পনা ছাড়াই ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন যে যেখানে পারে চলে যায় এবং নতুন বসতি স্থাপন করে। এক পর্যায়ে প্রায় ৫০ হাজার চাকমা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যায়। তারা রাজনৈতিক গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাদেরকে অরুনাচল প্রদেশে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দীর্ঘ ৪৬ বছর পরেও তারা নাকি ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। সেখানেও নাকি তাদের একতা নেই এবং অন্যান্য আদি উপজাতিদের বৈরী হয়ে বসবাস করছে। তবে শিক্ষার প্রতি চাকমাদের অনুরাগ থাকাতে তাদের নতুন প্রজন্ম শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে নেই। ১৯৯৯ সালে আমার দিল্লী অবস্থানকালে অরুনাচলের কয়েকজন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা চাকমা, হিন্দি ও ইংরেজী বলতে পারে কিন্তু বাংলা বুঝে না। তবে আমাদের বাংলাদেশে চাকমারা যেমন সর্বত্র পরিচিত, বিশাল ভারতে তারা নয়।

চাকমাদের মরণ ফাঁদ বলে পরিচিত কাপ্তাই ড্যাম সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ড্যামটি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে তৈরী হয়। সেই দেশের কোন এক কোম্পানী নির্মাণের দায়িত্ব নেয়। সম্ভবত ১৯৫৮ সালে শুরু হয়ে ১৯৬২ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। শোনা যায় ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ ছিল তার অর্ধেকও নাকি পাকিস্তান সরকার দেয়ানি। যা দেওয়া হয়েছে তার সিংহ ভাগ দুর্নীতির কবলে পড়ে। তখন CHT এর জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব হেলাল উদ্দিন চৌধুরী। ৩০৩ জন

দুর্নীতবাজ অফিসারের ভিতরে তিনিও চাকুরীচ্যুত হন। মিষ্টভাষী, জনাব আলী হায়দার খান ছিলেন তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুনর্বাসন অফিসার। তাঁকেও পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে CHT এর জেলা প্রশাসক হন। আমার এবং পরিবারের সাথে তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের এক গোপন চিঠির কথা আমাকে বলেছিলেন। এ চিঠি ছিল CHT-কাপ্তাই ড্যামের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার নাকি পূর্ণ ক্ষতিপূরণের টাকা চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছিল যার জবাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন এক সেক্রেটারী নাকি লিখেছিলেন- "CHT people are jungle people, they can live on roots and grasses, hence needs no more compensation" অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজন জংলী, তারা শিখড় ও ঘাস খেয়ে বাঁচতে পারে । অতএব আর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। জনাব আলী হায়দার খান কুটনীতি সম্পন্ন ব্যক্তি ও চাকমাদের বন্ধু প্রতীম ছিলেন। কিন্তু তার সরল মনে গরলও ছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অগনিত বাঙ্গালী শরনার্থী সমতল থেকে পাহাড়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করানোর পরামর্শ তিনিই দেন। যার ফলশ্রুতিতে পাহাড়ে বর্তমান অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত: ভূমি সমস্যা নিয়ে। জনাব আলী হায়দার খান পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারও হন। কিন্তু তার অবসর জীবন শান্তিপূর্ণ হয় নাই। জেনারেল জিয়ার মত তিনিও এক হৃদয় বিদারক মৃত্যুবরণ করেন। এক সড়ক দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে নিজস্ব গাড়িতে তার স্ত্রী তৎক্ষনাৎ মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনিও মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে জ্ঞান ফেরার পর সহধর্মীনির মৃত্যুর কথা শুনে তিনিও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এগুলি পাহাড়ীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের ফল বলে কেউ কেউ মনে করেন।

অদূরদর্শী পাহাড়ীদের ক্ষতিপূরণের যৎ সামান্য টাকা যথেচ্ছ খরচ করার গল্পও লোকের মুখে শোনা যায়। পূর্ব পুরুষের ভিটা, জায়গা-জমি জলমগ্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে নি যে, তারা বাস্তুচ্যুত হবে। তাই অনেকেই রেডিও, টেপরেকর্ডার ও অন্যান্য সৌখিন জিনিসপত্র ক্রয় করে ক্ষতিপুরণের সমুদয় টাকা খরচ করে ফেলে। কিছু কিছু লোক নাকি "আইয়ুব খাঁন" বনে যায়। যতদিন টাকা হাতে ছিল ততদিন মদ ভাং ও মাছ, মাংস খেয়ে এবং গা ম্যাসেজ ও গোসল করার জন্য চাকর রেখে আইয়ুব খাঁনের কাল্পনিক সুখ উপভোগ করেছিল। উল্লেখ্য যে, আইয়ুব খাঁন তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করত তিনি অত্যন্ত সৌখিন ও জাঁকজমক জীবন যাপন করতেন।

সব পাহাড়ীরা আবার অপরিনামদর্শী ছিলেন না। উদাহরন স্বরূপ আমার বাবা ১০৯ নং মৌজার হেডম্যান প্রিয়মোহন দেওয়ান তার ধান্যজমি জলমগ্ন হওয়ার পর বিশেষ বিচলিত হন নি। তিনি অন্যত্র অপরিচিত স্থানে চাষযোগ্য জমির খোঁজ না করে

নিজস্ব মৌজায় রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশে ৪ একর পাহাড় বন্দোবস্ত নিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি ফলজ ও বনজ (সেগুন) গাছ রোপন করলেন। তাঁর কর্মকান্ডে উৎসাহিত হয়ে মৌজার লোকজনও অন্যত্র কোথাও না গিয়ে নিজস্ব মৌজায় আবাদ করতে লাগল। দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা সমান করে কিছু কিছু চাষযোগ্য জমিও প্রস্তুত করল। দশ বার বছরের মধ্যে ফলজ, বনজ ও ফসলী চাষের উৎপাদন পেয়ে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৩টি উপজাতির আবাসভূমি হলেও কাপ্তাই বাঁধে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় চাকমারা। তার পরে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আদি মুসলমান বাঙ্গালীরা যারা বালুখালী, ঝগড়াবিল, চিনালা, পুরানবস্তী ইত্যাদি সমতল ভূমিতে চাকমাদের পাশাপাশি চাষ করত। উল্লেখ্য যে, তাদের পূর্বপুরুষরা চাকমা রাজার বদান্যতায় এবং চাকমাদেরকে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে। তারা অত্যন্ত রাজভক্ত ছিল।

কর্ণফুলী, মাইনি, চেঙ্গী, ও কাচালং নদীর ভ্যালির সমতল ভূমি শস্যভান্ডার নামে পরিচিত ছিল। ৫৪ হাজার একর জমি জলমগ্ন হয়। কাপ্তাই বাঁধের পানি চাকমাদের "অশ্রুজলে" পরিণত হল। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় পথের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। কিন্তু কোথা থেকে তারা যেন শক্তি সঞ্চয় করল। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুরা কঠোর পরিশ্রম করে জঙ্গল পরিষ্কার করল। আবাদি জমি তৈরী করে ফসল উৎপাদন করল এবং একটি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখল। ক্রমশ: তারা শিক্ষার প্রতি তাদের জন্মগত অনুরাগকে লালন করে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেষ্ট হতে লাগল।

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্স এক পর্যায়ে জার্মানীর দখলে চলে যায়। হাজার হাজার জার্মান সৈন্য প্যারিসে ঢুকে পড়ল। অনেকে মনে করল ফ্রান্সের মৃত্যু হয়েছে। হঠাৎ জৈনক এক দার্শনিক বলে উঠলেন একটি জাতি মৃত্যুবরণ করতে পারে না। বাঁচার জন্য জাতি কি পন্থা অবলম্বন করবে তা কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। নিজেই বাঁচার পথ আবিষ্কার করে নেবে। দার্শনিকের এই উক্তি মৃতপ্রায় ফরাসী জাতিকে প্রচন্ড নাড়া দিল। ক্রন্দনরত জাতি শক্তি সঞ্চয় করল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিরোধ করে দেশকে মুক্ত করল।

সম্ভবত ১৯৫৮ সালে ছাত্রবস্থায় প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা কাপ্তাই বাঁধ তৈরীর বিরুদ্ধে তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁনের কাছে লিখিত প্রতিবাদ করেন। ফলশ্রুতিতে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়। জেলে বসেই তিনি বি,এ পাশ করেন। পরে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে এমএলএ ও স্বাধীন বাংলাদেশ সংসদে এম,পি নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের রক্ষাকবচ হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায় করার জন্য সংসদে জ্বালাময়ী বক্তব্য পেশ করেন। উগ্র বাঙ্গলী জাতীয়তাবাদের

বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন- একজন বাঙ্গালী যেমন চাকমা হতে পারে না , তেমনি একজন চাকমাও বাঙ্গালী হতে পারে না।

কেন তিনি বাকশালে যোগ দেন জিজ্ঞাসা করলে "মানবেন্দ্র লারমা বলতেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি শেখ মুজিবের ভ্রান্ত ধারনা কিছুটা হলেও পরিবর্তন করার জন্য আমি বাকশালে যোগ দিয়েছি"। বঙ্গবন্ধু ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে স্বপরিবারে নিহত হওয়ার পর লারমা পরবর্তী সামরিক সরকারকে কিছুতেই আস্থায় নিতে পারেন নি। নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করলে তিনিই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা। তিনি কোন ক্রমেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে গ্রহন করেননি।

১৯৭৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বরর কোন একদিনে মানবেন্দ্র লারমা আমার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবনে আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। সম্পর্কে তিনি আমার ভাগিনা হন এবং আমাকে মামা বলেই সম্বোধন করেন। আমার বাসায় এক রাত্রি যাপন করেন। মানবেন্দ্র অত্যন্ত অমায়িক ও স্বল্পভাষী ছিলেন। আমার সাথে রাজনীতি বিষয়ে কোন আলোচনা করেননি। আমার কয়েকজন বাঙ্গালী বন্ধুর সাথে পরিচয় করাতে চাইলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে বুঝা যায় তিনি প্রচার বিমুখ ছিলেন। বাসা থেকে চলে যাওয়ার পর তার সাথে আর দেখা হয়নি। পরবর্তীতে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে সশস্ত্র শান্তিবাহিনী গঠন করে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেব এবং পরে ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে গৃহযুদ্ধে নিহত হন। পাহাড়ীদের মহান নেতা প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা সম্বন্ধে উপরে উল্লেখিত কয়েকটি লাইন তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম

ভারতের তদানিন্তন ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের তত্ত্বাবধানে ও র‍্যাড ক্লিফের নেতৃত্বে সমগ্র ভারত দু'ভাগে বিভক্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য ১৮ই আগষ্টের আগে নির্ধারিত হল না। কোন জনমত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে (যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ১ ভাগের বেশী নহে) ১৮ই আগষ্টে রাতে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষনা করা হল। তবে এখন বুঝা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ভাগ্য নির্ধারণে র‍্যাডক্লিফের ইচ্ছাকৃত ভূমিকা ছিল না। মাউন্টব্যাটেন ও তদানিন্তন বাংলার গর্ভনর স্যার ফেড্রিক বেরোসের সিদ্ধান্তই মুখ্য ছিল। এ ব্যাপারে আরও মতামত আছে যা পরে ব্যক্ত করার চেষ্টা করব। ১৯৪৭ সালের ১৮ই আগষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির খবর যখন প্রচার করা হয় তখন আমি ক্লাশ সিক্স এর ছাত্র। ক্লাশ ফাইভ ও সিক্স আমি অনায়াসে পাস করি।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতার

আন্দোলনের ঢেউ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়েও মৃদু আঘাত করে। তৎকালীন পার্বত্য নেতাদের মধ্যে কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। প্রথমত: এ দু'জনই ভারতীয় কংগ্রেসপন্থী ছিলেন। ১৯৪৭ এর প্রথম দিকে এক সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি রাঙ্গামাটি আসে। এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এ.ভি ঠাকুর এবং সদস্যরা ছিলেন ডা: প্রফুল্ল ঘোষ, জয়পাল সিং, রাজকৃষ্ণ বোস, ফুলবান সাহা ও জয় প্রকাশ নারায়ন। এ কমিটির কো-অপ্ট মেম্বার ছিলেন স্নেহ কুমার চাকমা। এই কমিটিকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল রাঙ্গামাটির খেলার মাঠে। সেখানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন কামিনী মোহন দেওয়ান। জনগন শতভাগ বিশ্বাসী ছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই লক্ষে খেলার মাঠে প্রায় প্রতিদিন সভা সমিতি, যাত্রাগান ও র‍্যালীর ব্যবস্থা করা হয়। রাঙ্গামাটি সরকারী ইংলিশ স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে র‍্যালীতে ব্যবহার করা হত। ''জয় হিন্দ'' শ্লোগানে মাঠ-ঘাট মুখরিত ছিল। এই কংগ্রেস পার্টির উপজাতীয় নেতাদের সাথে পার্বত্য রাজাদের কোন যোগাযোগ বা পরস্পরের প্রতি সম্মান বোধ মোটেও ছিলনা।

যুবক নেতা স্নেহ কুমার চাকমা খুবই মেধাবী কিন্তু উগ্রবাদী ছিলেন। তদানিন্তন ডিসি জি, এল হাইডের সাথেও তার ভাল সম্পর্ক ছিল না। ব্রিটিশরা মৃত্যুকালেও যে হুল ফুটাতে পারে সে জ্ঞান তাঁর ছিল না। ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান জন্মের ঘোষনার পরে পরেই আনুমানিক রাত ১২টায় প্রশেসন সহকারে স্নেহ কুমার ডিসি জি, এল হাইডকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ভারতের পতাকা উত্তোলন করতে বলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তদুপরি যে কোন দেশের জাতীয় পতাকা রাতে উত্তোলন করা অশোভনীয় হলেও স্নেহ কুমার পীড়া পিড়ি করতে থাকেন। অন্যদিকে সঙ্গে নেওয়া লোকজনকেও তিনি ক্ষেপিয়ে তুলেন। নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে পরের দিন ১৫ই আগষ্ট ভোরে ডিসি সাহেব পতাকা উত্তোলনের জন্য আসতে বলেন। সহজে বুঝা গেল যে, সেইদিন স্নেহ কুমারের এহেন ব্যবহারের জন্য তিনি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছেন। পরের দিন কাক ডাকা ভোরে স্নেহ কুমারের নেতৃত্বে এবং বড় ভাইদের পিছনে পিছনে আমরা আবার ডিসি বাংলোতে গেলাম। ডিসি সাহেব যথাযথ মর্যাদায় গার্ড অব অনার সহকারে ইউনিয়ন জ্যাক নামালেন এবং সাথে সাথে আবার গার্ড অব অনার দিয়ে ভারতের পতাকা উত্তোলন করতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল বিপর্যয়। পতাকাটি চূড়ান্ত পর্যাযে উঠার আগে পুলি ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। যেনতেন করে ভারতীয় পতাকাটি উত্তোলন করা হল। অজানা এক আশঙ্খা নিয়ে আমরা বাড়ী ফিরে এলাম।

ডিসি জি, এল হাইড একদন্ডও আর অপেক্ষা করলেন না। তিনি তাঁর প্রিয় ঘোড়াটিকে নিজে গুলি করে মারলেন এবং নিজেই বাংলোর পশ্চিম পার্শ্বে কবর দিলেন। তারপর একটি লঞ্চে করে সোজা চট্টগ্রাম ও পরে কলকাতায় চলে গেলেন। ১৫ই আগষ্ট

ছিল রাঙ্গামাটি থেকে তাঁর চির বিদায়ের দিন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোন পার্বত্য নেতা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য নির্ধারণে হাইডের সহযোগিতা চাননি। ধারণা করা যায়, হাইড পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথাস্থানে জোর ওকালতি করেছেন। শোনা কথা, ডিসি হাইড নাহি স্নেহ কুমারের প্রতিভা দেখে তাঁকে একটি উঁচু পদের চাকুরীর জন্য সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন। উত্তরে স্নেহ কুমার নাকি বলেছিলেন ''কয়েকদিন পরেই আপনাকে আমার অধীনে চাকুরী করার জন্য আমাকেই সুপারিশ করতে হবে।'' আরও জানা যায় যে, কারণে অকারণে স্নেহ কুমার হাইড সাহেবকে উত্যক্ত করেছেন। রাজাদের সাথে বিশেষ করে তখনকার চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়ের সাথেও তার কোন ভাল সম্পর্ক ছিল না। রাজাদের কাঁদে জোয়াল লাগিয়ে হালচাষ করবেন বলেও দাম্ভিক উক্তি করতেন। এইসব বিভিন্ন কারণে পাকিস্তানের প্রতি বোধ হয় চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়ের কোমল আকর্ষন ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা কামিনী মোহন দেওয়ানের সাথে প্রথম দিকে সংগ্রামের একাত্ততা থাকলেও কামিনী বাবু তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি মেনে নেন। কামিনী মোহন দেওয়ান স্নেহ কুমারকে একগুয়ে ও ভাবাবেগ প্রাপ্ত উন্মাদ বলে উল্লেখ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৮ই আগষ্টের পর পরেই এই অন্তর্ভুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য প্রচেষ্টা করেন স্নেহ কুমার। কিন্তু রাজা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হলে তিনি তাঁর গুটি কয়েক কমরেডকে সাথে নিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চিরদিনের জন্য পালিয়ে যান। ২১শে আগষ্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের বেলুচ রেজিমেন্ট ডিসি বাংলা প্রাঙ্গন থেকে ভারতের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে। পার্বত্য জনগণের আশা আকাঙ্খাকে ধুলিসাৎ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তিকে কেহ কেহ সহজে মেনে নিতে পারছিল না। বিশেষ করে সিনিয়র ছাত্র সমাজ অর্থাৎ ক্লাশ নাইন ও টেনের ছাত্ররা। পাকিস্তান হওয়ার কয়েক মাস আগে এক ব্রিটিশ আমাদের স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে কাজে যোগ দিলেন। তাঁর নাম ভিসি প্রিন্স। দেশ বিভাগের পরে পরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডিসি হয়ে যোগ দিলেন আর এক ব্রিটিশ নাগরিক নাম এল,এইচ,নিবলেট। যেহেতু পার্বত্য জনগণের নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে খাপ খাওয়াতে সময়ের দরকার সেহেতু পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত সুবিবেচনার ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এই স্পর্শ কাতর অঞ্চলে প্রথমত: ব্রিটিশ প্রশাসক নিয়োগ দেন। এল,এইচ,নিবলেটের উপস্থিতিতে পার্বত্যবাসীরা নিরাপদ বোধ করল। অনুভব করল তারা মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনে যায়নি। এই দুই ব্রিটিশ নাগরিক অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে কাজ করে পাকিস্তানের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে আমি ক্লাশ সিক্স এ প্রমোশন পেয়েছি। তখন আমি ১৩-১৪ বছরের এক কিশোর। এ বয়সে উর্ধ্বগতি অথবা নিম্নগতি লাভ করা খুব

সহজ। বিশেষ কারণে আরও ২-৩ জন ছাত্রসহ (আমার সিনিয়র) তালুকদার বাড়ী ত্যাগ করে স্কুলের হোষ্টেলে আশ্রয় নিতে হল। আবাসিক পরিবর্তন আমার জন্য শুভ হলনা। একেতো স্বাধীনতার আন্দোলনে সমস্ত স্কুলটি ছিল উত্তাল তদুপরি হোষ্টেলে খাওয়ার মান এতই নিম্ন যে এ খাবার খেয়ে প্রাণ রক্ষা করাই কষ্টকর ছিল। ভাতের ভেতর প্রায় সিকি ভাগই থাকত শিলা বা পাথরের নুড়ি আর ডালের দিকে তাকালে নিজের সমস্ত মুখমন্ডল দেখা যেত। তখন মাসিক ফুড চার্জ বোধ হয় ৫ টাকা। খাদ্য ঘাটতি পুরণের জন্য আমার বন্ধু অজিত দেওয়ানের (ওরফে রূপ্যা) সাথে কর্ণফুলিতে মাছ ধরা শিখতে হয়। অজিত আমার চেয়ে অনেক ভাল মৎস্য শিকারী। সে খালি হাতে বেশ বড়বড় চিংড়ি ও বেলে মাছ ধরতে পারত। কয়েকদিন ট্রেনিং নেওয়ার পর আমিও মাছ ধরতে শিখলাম। মাছ পেতে হলে গভীর পানিতে ডুব দিয়ে পাথরের নিচে অথবা চিপায় হাতরাতে হত। গর্তেও হাত দিতে হত। একবার একটি বড় চিংড়ি মাছ ধরতে গিয়ে আমার ডান হাত গর্তের চিপায় আটকে গিয়েছিল। গভীর জলে আমার নি:শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। মরণ টান দিয়ে কোন প্রকারে হাতের কব্জি ছাড়িয়ে আনি। জলে ভেসে উঠে দেখি, আমার মুঠোয় সেই চিংড়ি মাছটি বড় দাঁড় বন্দী হয়ে আছে। অজিত রান্নাও করতে জানত। অতএব তার বদৌলতে ''মৎস্য মারিয়া সুখে খাইতে'' লাগলাম। আমার চেয়ে বয়সে একটু বেশী হলেও অজিত আমার নীচের ক্লাশে পড়ত। পড়াশুনায় সে ভাল ছিল না। উপর্যপরি কয়েকবার ফেল করার পর সম্ভবত ক্লাশ ফাইভ থেকে চিরতরে পড়াশুনা বন্ধ করে সে চলে গেল। অজিতের বাবা যোগেন্দ্র লাল দেওয়ান রাঙ্গামাটি মৌজার হেডম্যান ও একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়ার ছিলেন। তিনি মোহনবাগানের টিমেও নাকি খেলতেন। তাঁর খেলা রাঙ্গামাটির মাঠে সবাই উপভোগ করত। তাঁর পায়ে এত শক্তি ছিল যে, একবার তার শটে একটি নতুন বল আকাশে ফেটে যেতে দেখেছি।

নবসৃষ্ট দেশ পাকিস্তানে নতুন পরিবেশে আমাদের শিক্ষাক্রম চলতে লাগল। আমি তৃতীয় অর্থাৎ থার্ড বোর্ডিং-এ থাকতাম। ফ্লোরে পাটি বা তোষক বিছিয়ে দু'সারিতে আমাদের থাকতে হত। নিজ নিজ বিছানায় বসেই পড়াশোনা করতে হত। কোন চেয়ার টেবিলের বালাই ছিলনা। আমার সহপাঠি যে কর্মজীবনে আমার সহকর্মীও ছিল, অনিল কৃষ্ণ কার্বারী এর কথা বেশ মনে পড়ে। অনিল ছিল আমার বাম পাশের বিছানায়। তার পাশে কেউ থাকতে চাইতনা। কারণ সে রাতে ঘুমের ঘোরে বিছানা ভেজাত। আসলে এতে বেচারার কোন দোষ নেই, এটি তার জন্মগত রোগ। বন্ধু বান্ধবেরা তার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই রাতে শুতে যেত। পরবর্তীতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে দু'পরিবারের একাত্ততা ও ঘনিষ্ঠতা আমাদের কর্মময় জীবনের কিছু অংশকে অত্যন্ত স্মরণীয় করে রেখেছে। সুযোগ হলে অনিল সম্বন্ধে পরে বলব।

১৯৪৮ সালে ক্লাশ সেভেনে উত্তীর্ণ হলাম। দেশ বিভাগের অস্থিরতা অনেকটা থেমে গেছে। কিন্তু কিছু কিছু সিনিয়র ছাত্র পাকিস্তানের অস্তিত্বকে যেন মেনে নিতে

পারছিলনা। তারা বিগত প্রায় এক বছর যাবত স্নেহ কুমারের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। অতএব তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। তারা পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করত। আমাদের মত জুনিয়র ছাত্রদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত। মনে হয় স্কুল কর্তৃপক্ষও পাহাড়ী ছাত্রদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছিল। কারণ সিনিয়র ক্লাশের ছাত্ররা স্কুল বন্ধ কলে দেওয়ার পাঁয়তারা করছিল। এ লক্ষ্যে একটা কিছু অজুহাত খুঁজছিল। ১৯৪৮ সালের বোধহয় মাঝামাঝি সময়ে জনৈক এক শিক্ষকের তথাকথিত দুর্ব্যবহারকে কেন্দ্র করে ক্লাশ নাইন ও ক্লাশ টেন এর ছাত্ররা চরম উত্তেজিত হয়ে হৈ হল্লা করে ক্লাশ বর্জন করে এবং জুনিয়র ছাত্রদেরকেও বের করে নিয়ে আসে। সিনিয়র ছাত্ররা যে যেদিকে পারে স্কুল থেকে পালিয়ে গেল। আমরাও তাদেরকে অনুসরণ করে স্কুল ত্যাগ করে চলে গেলাম। স্কুল ত্যাগ করার সময় একটা চমক ও উত্তেজনা উপভোগ করলাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের জন্য যে কি কঠোর পরিণাম অপেক্ষা করছে তা ভুলেও উপলব্ধি করতে পারিনি। স্বাভাবিকভাবে ছাত্রদের এ উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও সরকার রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল বলে গণ্য করল। স্কুল কর্তৃপক্ষ রিং লিডারদের তালিকা প্রস্তুত করতে লাগল। আমি বাবার ভয়ে বাড়িতে না গিয়ে অজ্যংছড়ি গ্রামে আমার কাকাতো বোনের শ্বশুর বাড়িতে চলে গেলাম। কিন্তু পরের বাড়ীতে বেশী দিন থাকা অশোভনীয় বুঝতে পেরে রাঙ্গামাটিতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাঙ্গামাটি থেকে অজ্যংছড়ি ১০ মাইল উত্তরে চেঙ্গী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এ গ্রামে কুরাকুট্যা গোজার লোকজন বসবাস করত। এ গ্রামে একটি Lower English (LE) স্কুল ছিল। এই স্কুলের জন্য অজ্যংছড়ি এলাকার করাকুট্যা গোজার লোকজন তুলনামুলকভাবে শিক্ষিত ছিল। গ্রামের বেশীর ভাগ পরিবার ভূমি চাষী ছিল বলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও তুলনামুলকভাবে ভালো ছিল। গ্রামটি ছবির মত সুন্দর ছিল। কাপ্তাই হ্রদের জলে এই গ্রামটি এখন নিমগ্ন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে আমিও কুরাকুট্যা গোজার অন্তর্গত। তখন এ গোজা লেখাপড়ায় অনগ্রসর ছিল।

যাক রাঙ্গামাটিতে ফেরার পথে কয়েকজন নেতৃত্বদানকারী ছাত্রের সাথে দেখা হল। তারাও অজ্যংছড়ি গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। অর্ধেক পথ থেকে আমাকে আবার ঐ গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করল। আমি অনিচ্ছা সত্বেও আমার বোনের বাড়ীতে তাদের ৭/৮ জন লোকের জন্য একবেলা খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম। পরে তারা অন্যত্র চলে গেলে পরের দিন আবার রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে হেঁটেই রওনা হলাম। আসার সময় তারা আমাকে সাবধান করে দিল আমি যেন তাদের অবস্থান সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বলি। শিক্ষা জীবন ক্রমশ: ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি সোজা বাড়িতে গিয়ে বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। বাবা পরের দিন সকালে হেডমাস্টার ভি,সি প্রিন্সের বাংলোতে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ভিসি প্রিন্স সাহেব আমাকে কাছে ডাকলেন এবং এতদিন কোথায় ছিলাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি সত্য কথা বললাম। তিনি নেতাদের অবস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে জানি না বলে মিথ্যা জবাব দিলাম। আর যেই জবাব সেই কাজ। তিনি একটি লম্বা বেত বের করে আমাকে গরু পেটা করতে লাগলেন। তিনি মনের মত আমাকে পেটালেন। যখন তিনি পেটানো শেষ করলেন তৎক্ষনাৎ শুরু হল বাবার কিল, থাপ্পর। মনে হয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যু হবে সেদিন। ভাল করে নি:শ্বাস ফেলতে পরছিলাম না। উভয়ের কাছে কমপক্ষে পনের মিনিট মার খাওয়ার পর নিস্তেজ হয়ে মেঝে পড়ে রইলাম। হাতের তালু, গিড়া, পিঠ ও সমস্ত শরীরে ভীষণ ব্যথা অনুভব করছিলাম। হেডমাস্টার মহোদয় পরদিন থেকে শ্রেণী ক্লাশে যাওয়ার অনুমতি দিলেন কারণ আমার বাবার উপযুক্ত শাসনে তিনি প্রীত হয়েছেন। অবশেষে হেডমাস্টার বেত উঁচু করে আমাকে যেতে বললেন। আমি অতি কষ্টে মেঝে থেকে উঠে মাথা হেট করে তাঁর বাসার প্রাঙ্গন ত্যাগ করলাম। সম্মুখে টিলার উপর আমাদের স্কুল। বেলা তখন প্রায় ১২টা। ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে উপরে তাকালাম কেহ আমাকে দেখে হাসছে কিনা। ভাগ্য ভাল স্কুল পুরোদমে চলছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে ক্লাশে, অতএব আমাকে বিপর্যস্ত অবস্থায় কেহ দেখতে পায়নি। রাস্তায় উঠেই আমি উন্মাদের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে দৌড়াতে লাগলাম। এক সময় মনে হল এ জীবন রেখে কি লাভ? মনে মনে আরও ভাবলাম স্কুলে আর যাব না, পড়াশোনা বন্ধ করে দিব। এই সব আজগুবী চিন্তা করতে করতে আনন্দ বিহারে অবস্থিত আমাদের ছাত্রাবাসে চলে আসলাম। আপন বিছানায় আঘাতে জর্জরিত দেহখানা বিলিয়ে দিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টেরও পেলাম না। সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠে দেখলাম দু'বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মনে মনে বললাম তারা কি তাহলে আমার মার খাওয়ার কথা জানতে পেরেছে? আসলে ওরা উভয়েই আমার দুর্ভাগ্যের কথা কিছুই জনত না। আমি অশ্রুসিক্ত নয়নে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম। তারা আন্তরিক সমবেদনা জানাল। তারা আমার ভবিষ্যৎ ও পড়াশোনার ব্যাপারে কোন প্রতিকুল সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করল।

পরের দিন দ্বিধা-দ্বন্ধ ত্যাগ করে স্কুলে গেলাম। প্রায় দু'সপ্তাহ অনুপস্থিতির পর আমাকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখে সহপাঠীরা অবাক চোখে তাকাতে লাগল। আমি শ্রেণী শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট করলে তিনি "ও তুমি সেই দুষ্ট ছেলে" বলে আমার নাম পুন:রোল কল রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করেন। পরে জানা যায় প্রায় অর্ধ ডজন সিনিয়র ক্লাশের ছাত্রকে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে চিরতরে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়। তারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোন স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করার অযোগ্য বলে ঘোষনা করা হয়। দশম শ্রেণীর ছাত্র সুরতি রঞ্জন খীসা এদের অন্যতম। তারা অনেকেই ভারতে গিয়ে অধ্যয়ন করে এবং পরবর্তীতে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে বসবাস করে। আরও প্রায় অর্ধ ডজন সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রকে দেশের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারবে সাপেক্ষে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম

বিশিষ্ট ডাক্তার ও সমাজকর্মী প্রয়াত ডা: ভগদত্ত খীসা। আমিও হয়ত এ লিস্টে ছিলাম। কিন্তু আমার বাবার দুরদর্শীতার কারণে এ অপরাধ থেকে মুক্তি পাই।

দেখতে দেখতে ১৮৪৮ সাল চলে গেল। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে ঝঞ্ঝাটময় বছর। সপ্তম শ্রেণী পাস করে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। দায়িত্ববোধ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে বলে মনে হল। ফেলে আসা দিনগুলির প্রতি আমার আর কোন আগ্রহ নেই কিন্তু আক্ষেপ আছে। স্কুল জীবনে অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল। যাদের কথা আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে তাদের কথা কিছু না বললেই নয়। সুধেন্দু বিকাশ চাকমা পঞ্চম শ্রেণী থেকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তার বড় বোন বীনাপানিও আমার সহপাঠিনী ছিল। যেহেতু সে সুধেন্দুর বড় বোন সেহেতু আমার বড় বোনের মর্যাদাও লাভ করত। ৮ম শ্রেণীতে পড়ার সময় এক পুলিশ অফিসারের সাথে তার বিয়ে হয়। বীনাপানি সুন্দরী ছিল বলে সিনিয়র ক্লাশের কিছু ছেলে আমার মাধ্যমে বীণাপানির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করত। তারা জোর করে চিঠি আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিত। কিন্তু আমি কোনদিন সেই চিঠিগুলি বীণাপানিতে দিইনি, কারণ আমি তাকে বড় বোনের মত সম্মান করতাম। সুধেন্দু ১৯৫২ সালে আমার সাথে স্কুল ফাইনাল (মেট্রিক) পাশ করার পর চট্টগ্রামে মেডিকেলে ডিপ্লোমা কোর্সে (LMF) ভর্তি হয় এবং যথাসময়ে পাশ করার পর রাঙ্গামাটিতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করে। কিন্তু সে এত মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে যে, সে প্রায়ই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নিজের পরিবারের উপর অত্যাচার করত। ডাক্তার হিসেবে সে কিন্তু প্রশংসার পাত্র ছিল এবং মানুষ হিসেবেও দয়ালু ছিল। সে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল কিন্তু ভালবাসার পাত্রীতে এতটুকুও সুখ ও শান্তি দেয়নি। তার স্ত্রী ক্যান্সারে মারা যায়। পরবর্তীতে সুধেন্দুকে মাদকাসক্ত অবস্থায় নিজ বাড়ীতে মৃত পড়ে থাকতে দেখা যায়। ডাক্তার হিসেবে সুধেন্দুর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। গরীবদের প্রতি তার সহানুভূতি ছল। অনেক গরীব রোগী বিনা পয়সায় তার কাছ থেকে চিকিৎসা পেয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান ও উচ্ছৃংখল জীবন যাপনের জন্য এক অবধারিত করুন পরিনতির শিকার তাকে হতে হয়েছে। শোনা কথা তার গুরু জন অর্থাৎ বাবা ও মা সুধেন্দুর বিয়েতে রাজী ছিলেন না। বিয়ের যাত্রা পথে নাকি শুয়ে পড়ে তাঁরা বাঁধা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুধেন্দু তার প্রেমিকার প্রতি এতই আসক্ত ছিল যে, পিতামাতার সকল বাঁধা অগ্রাহ্য করে তাঁদের শায়িত শরীরের উপর লাফ দিয়ে চলে যায় এবং প্রেমিকাকে বিয়ে করে। সুধেন্দু জীবনের করুণ পরিণতি কি তার পিতামাতার অভিশাপের ফল? সে যাই হোক এই প্রতিভাবান ডাক্তার বন্ধুটির জন্য আমি ও সমাজ চিরদিন দুঃখিত ও অনুতপ্ত থাকব।

আমার আর এক সহপাঠী বন্ধু ছিল সুশেন বিকাশ চাকমা। শয়নে স্বপনে আমরা বন্ধু ছিলাম। অনেকে আমাদেরকে মানিক জোড় বলত। আমরা প্রায় একত্রে চলাফেরা করতাম। তার বাড়ি ছিল ঝগড়াবিল কর্ণফুলি নদীর তীরে। যে কোন উৎসব, পূজা পার্বনে ও খেলাধুলায় আমরা প্রায়ই একত্রে উপভোগ করতাম। কখনও তাদের বাড়ি

কখনো আমার বাড়ি গিয়ে ছুটি উপভোগ করতাম। ভাদ্র আশ্বিন মাসে নৌকা ভাসিয়ে তিন কোণা বিশিষ্ট জাল দিয়ে কর্ণফুলির ইলিশ ধরা আমার কাছে খুবই চমকপ্রদ ও আনন্দময় ছিল। কর্ণফুলির টাটকা ইলিশ খুবই সুস্বাদু ছিল। ১৯৬৪ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে কর্ণফুলির সেই জীব-বৈচিত্র্য অনেকাংশে হারিয়ে গেছে। ১৯৫২ সালে স্কুল ফাইনাল পাস করার পর আমি তেঁজগাও, ঢাকাতে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান ভেটেরিনারি কলেজে পাঁচ বছর মেয়াদী ভেটেরিনারি ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। কিন্তু সুশেন সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণে কোন উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করতে পারেনি। যখন আমি ডিগ্রী কোর্সের তৃতীয় বর্ষে, তখন এক বন্ধে রাঙ্গামাটি চলে আসি। সুশেনের সাথে দেখা হলো। জানতে পারলাম স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর সে এখনও ভাসমান অবস্থায় আছে। বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলে অনিয়মিতভাবে শিক্ষকতা করে যাচ্ছিল। তাকে ভেটেরিনারি কলেজে তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়ার প্রস্তাব দিলে সে আমার এক কাকাত (চাচাত) বোনের সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দেয়, এই শর্তে যে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ার খরচ কন্যার পিতাকে বহন করতে হবে। আমি প্রস্তাবটি কাকা ও কাকীমার কাছে উত্থাপন করলাম। কাকা একজন পরিশ্রমী ও সফল কৃষক। ভবিষ্যতে জামাই এর পিছনে মাসিক একশত টাকা খরচ করা তাঁর জন্য একটু কষ্টসাধ্য হলেও কাকীমা ভেবেচিন্তে রাজী হয়ে গেলেন। কলেজে ভর্তি ও মাস দু'য়েকের আগাম খরচ দিয়ে সুশেনকে আমার সাথেই ঢাকা পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তাঁর আত্মীয় স্বজন বা অভিভাবকদের এ ব্যাপারে অবহিত করার প্রস্তাব দিলে সুশেন যথারীতি অবহিত করা হবে বলে মন্তব্য করে। যথাসময়ে আমরা তেঁজগাওতে অবস্থিত ভেটেরিনারি কলেজে পৌঁছলাম। তখন কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছিল। সুশেন দরখাস্ত ফর্ম পূরণ করে তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির আবেদন করল। সে ভর্তির সুযোগ পেয়ে ভর্তিও হয়ে গেল। কিন্তু কয়েকদিন ক্লাশ করার পরে তার মতিগতি বদলে গেল। সে বোধহয় অন্যের প্ররোচনায় পাঁচ বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি স্বাভাবিকভাবে কাকা ও কাকীমার মতামত ছাড়া এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অপারগতা প্রকাশ করলে সে কলেজ ছেড়ে চলে যায়। একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর এহেন তরিৎ মত পরিবর্তনের মানসিকভাবে মেনে নিতে পারছিলামনা। বিষয়টি বিনা মেঘে বজ্রপাত হিসেবে ঠেকল।

পরে সুশেন অন্যত্র বিয়ে করে ঘর সংসার শুরু করে। সে বন্ধুত্বের ইতি টানলেও আমি অতি সহজে তাকে ভুলতে পারিনি। বন্ধে রাঙ্গামাটি এসে একবার তাকে তার আসামবস্তী বাসায় দেখতে গিয়েছিলাস। তবে তার নুতন বৌ এর সাথে আমার পরিচয় করে দিয়েছিল কিনা আমার স্মরণ নেই। এটি বোধহয় ১৯৫৫ সালের ঘটনা। এরপর সুশেনের সাথে দীর্ঘদিন দেখা হয়নি। ২০০২ সালে আমি রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর সুশেনের দুই সুদর্শনী বিবাহিত কন্যার সাথে পরিচয় হয়। তাদের কাছে জানতে পারি সুশেন দীঘিনালায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। সে

অবশ্য ২০০৪ সালে তার কন্যাদ্বয়কে নিয়ে আমার বাসায় আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তখন আমরা দু'জনেই বয়োবৃদ্ধ। সঙ্গতকারণে আমরা কেহই মেয়েদেরকে আমাদের পূর্বের ইতিহাস সম্বন্ধে বলিনি। কন্যাতুল্য মেয়েদেরকে সাধ্যমত কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে পেরে আমি ধন্য হয়েছিলাম।

আমার আরও একজন সহপাঠী মেধাবী বন্ধু ডাঃ সুব্রত চাকমার কথাও কিছু বলতে হয়। সে স্বনামধন্য প্রয়াত শিক্ষাবিদ ও স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর কৃষ্ণ কিশোর চাকমার কনিষ্ঠ সন্তান। সুব্রত সুদর্শন ও মেধাবী ছিল। ক্লাশের আর একজন মেধাবী ছাত্র রামেন্দু বিকাশ দেওয়ানের সাথে ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা চলত। উভয়েই ১৯৫২ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করার পর এইচএসসি তখন (আই,এস,সি) কৃতিত্বের সাথে পাশ করে। সুব্রত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও রামেন্দু আসানুল্লাহ ইঞ্জিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়। সুব্রত যথা সময়ে কৃতকার্য হয়ে ডাক্তার হয়। সে পিতৃহীন হলেও তার তেজস্বিনী মা মনোরমা দেওয়ানের সার্বিক তত্বাবধানে ছিল। সুব্রতের প্রতিদ্বন্ধী রামেন্দু দেওয়ান ইঞ্জিয়ারিং ফেল করে। পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিষ্ট্রিতে এম এস সি পাশ করে বিলেত চলে যায়। সুব্রত পরিবারের সাথে আমার পরিবারের অনেক মধুর স্মৃতি ও যোগসুত্র আছে। সুব্রত ও আমি শুধু সমবয়সী নই, তার স্ত্রী মলিনা এবং আমার স্ত্রী দীপিকা ওরফে কল্যানী সমবয়সী এবং সহপাঠিনী। আত্মীয়তা সম্পর্কে কল্যানী মলিনার মাসি হয় এবং সুব্রতও আমার দূর সম্পর্কীয় ভাগিনা হয়। তাই আমরা পরস্পরকে পুত্র (পুত) বলে সম্বোধন করে থাকি। আমাদের সহধর্মিনীরাও পরস্পর পরস্পরকে মাসী বলে ডাকে। রাঙ্গামাটি থেকে আমাদের মানিকছড়ি গ্রামের বাড়িতে সুব্রতসহ বেড়াতে যেতাম এবং কয়েকদিন থেকে গ্রামীণ পরিবেশ উপভোগ করে ফিরে আসতাম। চাকুরী জীবনেও আমাদের দু'পরিবারের সম্পর্ক ভালো ছিল,বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে পরে সুব্রত যখন ময়মনসিংহে বদলী হয়ে আসল, প্রায় দুই তিন বছর আমাদের একই শহরে কাছাকাছি বসবাস করার সুযোগ হয়েছিল। তখন দু'পরিবারে উঠাবসা ছাড়াও মাঝে মধ্যে মধুপুর জঙ্গলে গারোদের গ্রামের কাছাকাছি পিকনিক করে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতাম। আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য এসব আয়োজন ছিল অত্যন্ত প্রিয় এবং আনন্দদায়ক। যাক্ পরে এ সম্বন্ধে প্রয়োজনবোধে আরও বলা যাবে।

আমার স্কুল জীবনে সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর সময়কালটি ছিল ঝঞ্ঝাটময়। এই দু'বছরে আমার নির্দিষ্ট কোন থাকা খাওয়ার জায়গা ছিলনা, যেখান থেকে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া চালানো যায়। কখনো হোস্টেলে, কখনো আনন্দ বিহারের মেসে আর কখনো বা রাঙ্গাপানিতে অবস্থিত আমাদের খামার বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। রাঙ্গাপানি থেকে স্কুলের দূরত্ব ৩ মাইলের কম নয়। তখন কোন যানবাহন ছিল না। হাঁটা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না।

আমার মাতা পিতার সান্তনা ছিল এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে লেখাপড়া করার পরও আমি কোন বছরই ফেল করিনি। অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাবা আমার জন্য একটি সাইকেল কিনে দেন। সাইকেলটি ইংল্যান্ডের তৈরী ছিল। কাঁচা রাস্তায় সাইকেল চালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। রাঙ্গাপানি থেকে সাইকেল চালিয়ে ৩ মাইল কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে স্কুলে যাওয়া হাঁটার চেয়ে কম পরিশ্রমের ব্যাপার নয়। নবম শ্রেণীতে উঠার পর আমাদের স্কুলের কাছাকাছি যে কোন স্থানে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার শুভাকাঙ্খী নিশিকান্ত তালুকদার বাবুর বাসায় ধর্ণা দিলে তাঁর স্ত্রী সানন্দে প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। উল্লেখ্য যে, পঞ্চম ও ষষ্ট শ্রেণী অধ্যায়নকালে এ বাসায় ছিলাম। তালুকদার বাবু আমার বাবার কাছ থেকে একটি চিঠি আনতে বললেন কারণ তিনি মনে করেছিলেন আমি আগে হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। বাবার কাছ থেকে চিঠি আনার পর পুনরায় তালুকদার বাড়িতে ঠাঁই পেলাম। পিসিমা ও মিলি দিদির স্নেহ মমতার সান্নিধ্যে পুন: আসতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করলাম। আমার খোরাকি বাবদ প্রতিবছর একশত আড়ি ধান দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে নবম শ্রেণীতে পড়া শুরু করলাম। স্কুল ফাইনাল গ্রুপের পাঠক্রম অনেক কঠিন। গণিতের ছয়টি বিষয়, যেমন পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বলবিদ্যা এবং পরিমিতি পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের সময় কোচিং বা প্রাইভেট পড়া অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। একমাত্র কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় এ বিষয়গুলি আয়ত্বে আনতে হত। খুব ভাল ফলাফল অর্জন করে আমি নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলাম। দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়ার পর এক অজানা আনন্দে মন উদ্বেলিত হল। সামনে একটি বছর পার হলেই আমি মেট্রিক পাশ করে পরিবারে এবং সমাজে একজন সম্মানিত ও দর্শনীয় ব্যক্তি হিসাবে বিচরণ করতে পারবো এই আশা আমার বুকে জাগ্রত হল। সাথে সাথে স্কুল পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের আশাও মনে বাসা বাঁধতে লাগল। কিন্তু বাবার দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা চিন্তা করলে সেই আকাঙ্খা নিভে যেতে চাইত।

ছোটকাল থেকে আমার প্রিয় খেলা হল কুস্তি, যাকে বলি খেলা বলা হয়। চাকমা সমাজে এই খেলাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রতি বছরই রাঙ্গামাটি শহর সহ বিভিন্ন পাড়ায় এ খেলার প্রচলন ছিল। লম্বায় আমি তুলনামূলকভাবে খাটো। পাঁচ ফুটের একটু বেশী। কিন্তু এই দৈর্ঘ্য নিয়ে আমার চেয়ে উঁচু লোকজনকে কাবু করতে অসুবিধা হতনা। বলি খেলায় যত প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়েছি প্রায় সবগুলিতেই আমি জয়ী হয়েছি। প্রায় ডজন খানেক রুপার মেডেলও অর্জন করেছি। জীবনে একবার শুধু পরাজিত হয়েছি। আগেই বলেছি শৈশবকালে আমি অত্যন্ত রোগাগ্রস্ত ছিলাম। জ্বর ও টনসিলের প্রদাহে প্রায়ই কষ্ট পেতাম। এই বলিখেলার ব্যায়ামের মাধ্যমে আমার অসুখ আস্তে আস্তে ছেড়ে যেতে লাগল। যতদুর মনে পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠার পর আমার পরবর্তী স্কুল

জীবনে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম। আমার মনে হয় শৈশবে ঘন ঘন অসুস্থ হওয়ার কারণে আমার শারীরিক বৃদ্ধি কম হওয়া আমার খর্বকৃতির মূল কারণ ছিল। তবে এতে আমার মোটেও দুঃখ নেই। আমি জানি গ্রীক সম্রাট দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজান্ডারের উচ্চতা নাকি পাঁচ ফুটের নিচে ছিল। অতএব এ পৃথিবীতে ভালো কিছু অর্জন করতে চাইলে উচ্চতার পরিমাপ দরকার হয়না। ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টও খর্বাকৃতির ছিলেন। বিশ্বখ্যাত কমেডিয়ান চার্লি চ্যাপলিনের কথা নাইবা বললাম। আলেকজান্ডার এত খাটো ছিলেন যে,পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করার পর পারস্য সিংহাসনে বসার পর পা রাখার জন্য একটি টেবিল ব্যাবহার করতে হয়েছিল, যেহেতু পা দানিতে তাঁর পা দুটি ঠেকছিলনা।

তালুকদার বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হল দীপিকা । ডাক নাম কল্যাণী। তাঁর মা অর্থাৎ তরঙ্গীনি পিসিমা প্রায়ই ইয়ার্কি করে বলতেন- কল্যাণীকে আমার সাথে বিয়ে দেবেন। কেন জানিনা তিনি এ কথা বলতেন। হয়তো আমার পরিবারকে পছন্দ করতেন বলেই তিনি এই কথা বলতেন। আমার বাবা ও মায়ের সাথে তার চমৎকার সম্পর্ক ছিল। সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল আমার দাদীমার সাথে। দাদীমাতো কল্যাণীকে নাতবো জুড়েই বসলেন। এসব চলছিল আমি যখন ষষ্ট শ্রেণীতে পড়তাম। তখন কল্যাণীর বয়স ৭/৮ বছর। এসব তামাশা বোঝার বয়স আমার হয়নি, কল্যাণীরতো কথাই আসেনা। তবে পাড়া পড়শি ও বন্ধু বান্ধবদের ঠাট্টা তামাশায় আমরা লজ্জা ও বিব্রতবোধ করতাম। বিশেষ করে কল্যাণীকে আমার সম্বন্ধে কিছু বললে সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। সে আমাকে মোটেও পছন্দ করত না বলে মনে হয়। কদাচিৎ আমরা পরস্পর কথা বলতাম। একদিন তার এক আত্মীয় ভাই দুষ্টুমি করে আমার নাম করে কল্যাণীকে একটি চিঠি লিখে। আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। কল্যাণী তখন কিশোরী, বয়স ১০ কি ১১ হবে। আমি যখনই তার সামনে এসে পড়লাম সে বাজপাখীর মত আমাকে আক্রমন করে চিঠি লিখার কৈফিয়ত চাইল। আমি যখন অস্বীকার করলাম তখন সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। অদুরে তার –চক্রান্তকারী– ভাই ও অন্যরা মুচকি মুচকি হাসছিল এবং তামাশা উপভোগ করছিল। পরে বিষয়টি আঁচ করতে পেরে কল্যাণী আক্রমণ করার জন্যে তাদের দিকে ছুটে গেল। যাহোক, কল্যাণী ও আমি পছন্দ করি বা না করি তার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী আমরা যে ভবিষ্যতে একে অপরের হব অর্থাৎ কল্যাণী আমার –বাগদত্তা– এ বিষয়টি আমাদের দু'পরিবারে এবং সমাজে বিশ্বাস হিসাবে হয়তো প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু উভয় পক্ষের নির্দিষ্ট কোন ওয়াদা ছিলনা। দশম শ্রেণীতে উঠার পর আমার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলদ্ধি করলাম। উচ্চাশার সাথে যৌবনের আলোড়ন ও বিকিরণ আমাকে দোলা দিতে লাগল। তালুকদার বাড়ি থেকে আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলাম। মনে পড়ে, পিসিমা তরঙ্গীনি পরীক্ষার সময় আমার জন্য বিশেষ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। দৈনিক স্কুলে ফ্লাক্স ভর্তি দুধ পাঠাতেন। তার মাতৃস্নেহ ভোলার নয়।

১৯৫২ সালের বোধহয় জানুয়ারী মাসে আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমি বাড়িতে চলে গেলাম। জুন মাসে খবর পেলাম তরঙ্গীনি পিসি নাকি অসুস্থ। এসে দেখলাম তিনি কঠিন ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যায় শায়িত। আমাকে চিনতে পেরেছেন কিনা জানিনা। তার মুখ ''তালাবদ্ধ''। খুলতে পারেন না। স্বনামধন্য হিমাংশু ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে নিশিবাবুর বড় ছেলে প্রভাসদা আমাকে চট্টগ্রাম শহরে ঔষধ কেনার জন্য পাঠালেন। তখন চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি রাস্তা কাঁচা ও বেহাল। তবে ''মুড়ির টিনের'' মত বাস চলাচল করত। ভ্রমণ অত্যন্ত বিপদজনক ছিল। যাওয়ার সময় রাউজানে একটি ব্রীজ পার হতে গিয়ে বাসটির একটি চাকা ব্রীজের সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে সকলের মরার অবস্থা হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে তিন চাকায় ভর করে বাসটি রাস্তায় উঠে পড়াতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাই। চট্টগ্রামে পৌছেই মিনতিদির স্বামী বঙ্কিম বাবুর সহায়তায় চট্টগ্রামে ঔষধ ক্রয় করে লঞ্চে যাত্রা করার জন্য সদর ঘাটে আসলাম। কিছুক্ষণ বাদে বঙ্কিম বাবু এসে বললেন যে রোগী মারা গেছেন। আমি ঔষধগুলি তার হাতে দিয়ে ভারাক্রান্ত মনে লঞ্চে উঠলাম। সারা পথ পিসিমার জন্য বুক ফেটে কান্না আসছিল। মনে হল পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে। হয়তো তার মরদেহ দেখতে পাবোনা। চট্টগ্রাম থেকে লঞ্চে রাঙ্গামাটি পৌঁছাতে প্রায় ১০/১২ ঘন্টা সময় লাগে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে সারেংকে অনুনয় বিনয় করাতে আমাকে তবলছড়ি মুখে নামিয়ে দেয়া হল তবলছড়ি মুখ শ্মশানের জায়গায়। আমি একাকী শ্মশানের ভিতর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় এসে গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য পিসিমার মৃতদেহের সৎকার (দাহ কাজ) এরই মাঝে সমাধা হযে গেছে। চিরদিনের জন্য তার সাথে আমার আর দেখা হলনা। আমি অনেক্ষণ গুমরে গুমরে অশ্রুপাত করলাম। তালুকদার বাড়িতে এক অসহনীয় নিস্তব্দতা বিরাজ করছিল।

উল্লেখ্য যে, তরঙ্গিনী পিসিমার মৃত্যুর দু'এক মাস আগে তার বড় ছেলে প্রভাসদার বিয়ে তার মামাতো বোন সাত্তিয়া দেবীর সাথে ১৯৫২ সালে চৈত্র মাসে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় বরের সাথে আমিও কণের বাড়ি মাইনীর কবাখালীর গ্রামে যাই। প্রভাসদা ও আমি দু'টি সাইকেলে চড়ে রওনা হই। রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি বোয়ালখালী রাস্তা ছিল খুবই সংকীর্ণ ও কাঁচা, পায়ে হাঁটার রাস্তা। তবে সাবধানে হলে সাইকেলও চালানো যেত। তখন পাকিস্তান আমল আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ভালই ছিল। খাগড়াছড়ি থেকে বোয়ালখালী রাস্তাটি আরও সংকীর্ণ ও বিপদ সংকুল ছিল। রাস্তার দু'পাশে গহীন অরণ্য। রাস্তায় লোক চলাচল খুবই কম ছিল বিশেষ করে খাগড়াছড়ি-বোয়ালখালী রাস্তায় দু'একজন ত্রিপুরা উপজাতীয় লোক ছাড়া কাউকে দেখা যায়নি। রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ির দূরত্ব আনুমানিক ৩০ মাইল আর খাগড়াছড়ি থেকে বোয়ালখালীর দূরত্ব ১৫ মাইল। এই পথ পাড়ি দিতে আমাদের লেগেছিল প্রায় ১২ ঘন্টা। বর্তমানে পাকা সড়ক হয়েছে, মোটর গাড়িতে এ পথ অতিক্রম করতে লাগে মাত্র ৩ ঘন্টা।

নববধুকে রাঙ্গামাটিতে আনার জন্য একটি মাঝারী সাইজের ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া

করে মাইনী নদীর ভাটার স্রোতে ভাসানো হল। বধুর বড় ভাই সমর দা আমাদের সঙ্গী হলেন। আমাদের সাইকেল দু'টিও নৌকায় তোলা হল। স্রোতের টানে নৌকা চলতে লাগল। মাইনী নদীর দু'কুলে অনেক চাকমা গ্রাম চোখে পড়ল। তবে নদীর বাম তীরে তারাবন্যা নামক গ্রামটির সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। এক বিশাল সমতল এলাকায় গ্রামটি অবস্থিত ছিল। তারাবন্যা মৌজার তখন হেডম্যান ছিলেন বাবু রাঙ্গাচাঁন চাকমা। তিনি প্রভাবশালী ও অবস্থাপন্ন হেডম্যান ছিলেন। আমরা কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করে তার মাটির তৈরী সুন্দর দোতলা বাড়িটি দেখে এসেছিলাম। পরবর্তীতে তাঁর বড় ছেলে পরবর্তী মৌজার হেডম্যান নিহারবিন্দুর কাছ থেকে জানতে পারি যে, বাংলাদেশ হওয়ার পর পাহাড়ী-বাঙ্গালী সংঘর্ষে এই সুন্দর বাড়িটি পুড়ে যায়। বর্তমানে তারাবন্যা মৌজা নাকি প্রায় সম্পূর্ণ বাঙ্গালী শরণার্থীদের দখলে চলে গেছে। তারাবন্যার নীচে মাইনী নদীর দুকুল গহীন অরণ্যে ঢাকা ছিল। কোন কোন জায়গায় নদীর দু'তীরের গাছ বাঁশ পরস্পরকে স্পর্শ করে যেন আলিঙ্গন করছিল। নদীর ধারে অনেক বন্য মোরগ ও একটি কালো বাঘ চোখে পড়ল। কালো বাঘটি (ব্ল্যাক প্যানথার) আমাদের দেখে গহীন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে কালচে ধরণের ঘুঘু পাখি উড়তে দেখা গেল। চাকমারা তাদেরকে ধুনকল বলে। সমর দা বলল সেগুলি নাকি শিকার যোগ্য পাখি। সে তার বন্দুক দিয়ে দু'টি পাখি মারল।

মনে আছে মাইনি বাজার চেকপোষ্ট অতিক্রম করার সময় আমরা সে পাখি গুলিকে নৌকায় সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম, কারণ সংরক্ষিত বনে কোন রকম শিকার করা নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ আমল থেকেই মাইনিমুখ বাজার প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে মাইনিমুখে একটি বিশাল বাজার। বাজারের দোকানদার শতভাগই বাঙ্গালি। তবে হাটবারে পাহাড়ীদের কাঁচামালে বিশেষত আদা, হলুদ ও কলায় বাজার উপচে পড়ে। বাজার চৌধুরী একজন চাকমা।

মাইনি নদী কাচালং নদীতে পতিত হয়েছে। এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলকে মাইনিমুখ বলে। বর্তমানে কর্ণফুলী হ্রদে নিমজ্জিত এ দু'নদীর সঙ্গমস্থলকে চেনার উপায় নেই। মাইনি নদী পেরিয়ে আমরা কাচালং নদীতে এসে পড়লাম। মাইনির তুলনায় কাচালং কিছুটা গভীর ও খরস্রোতা। কাচালং এর দু'কুলও গহীন বনে ঢাকা। উভয়কুলের অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে আমরা নদীর ভাটায় নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে মাঝে মাঝে বন্য হাতির পালের কিরিং কিরিং ডাক শোনা গেল। দু'পাশে সদ্য হাটা হাতির পায়ের ছাপ দেখা গেল। নদীর উৎপত্তি চেঙ্গীর মত ত্রিপুরা পর্বতমালা আর কাচালং জন্ম নিয়েছে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের পর্বতমালা থেকে। কাচালং, মাইনি, চেঙ্গী ও কর্ণফুলী উপত্যকা পার্বত্য চট্টগ্রামের শস্য ভান্ডার বলে পরিচিত ছিল। কাপ্তাই বাঁধ হওয়ার পরে ৫৪ হাজার একর ধন্য জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে খাদ্য-উদ্বৃত্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে।

সংরক্ষিত বনাঞ্চল পার হয়ে আমরা এক চাকমা গ্রামে রাত্রি যাপনের জন্য নোঙ্গর ভিড়ালাম। বাড়ীর মালিক আমাদের নৌকার মাঝির পরিচিত। তিনি আমাদের খুবই আদর যত্ন করলেন। গভীর রাতে হঠাৎ মানুষের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলাম এবং জানতে পারলাম যে, একদল বন্য হাতি কৃষকের ক্ষেতে নেমেছে এবং তাদের তাড়াবার জন্য মশাল জ্বালিয়ে ও ঢাকঢোল পিটিয়ে হাতি তাড়ানো হচ্ছিল। পরের দিন ভোরে রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কিছুক্ষণের মাঝে আমরা কাচালং মুখে বা দুয়ারে পৌঁছে গেলাম। এখানেই কাচালং নদী কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে। কাচালং মুখের বিপরীতে অর্থাৎ কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে কিছু ইটের বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। এখানে চাকমা জাতির কিংবদন্তী সংগ্রামী পুরুষ সেনাপতি রনু খাঁ দেওয়ানের বাড়ি ছিল। উল্লেখ্য সতের শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি চাকমা রাজা টব্বর খাঁর সেনাপতি ছিলেন এবং চাকমা রাজ্যে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সম্ভবত ১৭৯৬ সালে তিনি পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বিষপানে আত্মহত্যা করেন বলে প্রকাশ। দেশপ্রেমিক এই চাকমা বীর নাকি বিশাল দেহের অধিকারী ছিলেন। চাকমা জাতির এই মহান নেতার বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখে মন শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

কাচালং এর মুখ থেকে কর্ণফুলীর ভাটায় নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। নদীর দু'কুলে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে সন্ধ্যায় রাঙ্গামটিতে এসে পৌঁছলাম।

উল্লেখ্য, আমাদের অনুপস্থিতিতে নিশিকান্ত তালুকদার বাবুর ভাতিজা দেবেনদার জন্য তড়িঘড়ি করে পাত্রী ঠিক করা হয়েছিল। অতএব দুই নববধুকে এখই দিনে গৃহে প্রবেশ করানো হয়েছিল। বিয়ের পরে পরেই আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। নববধুর গৃহে প্রবেশের এক মাস পরে তরঙ্গিনী পিসিমা মারা গেলেন। তা আগেই বলা হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শান্তি কুমার চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মের বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এই এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ইতিহাসই বর্ণনা করতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ বলতে মূলত চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকদের কথায় আসে। চাকমারা ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে আলীকদম হয়ে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন।[১] ১৭৮৩-১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বুদ্ধপ্রিয় (Buddhapriya) কর্তৃক আরাকান আক্রমণ এবং ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্পুর্ণরূপে বিজয়ের পর আরাকানী বা রাখাইন-মারমাদের এতদঞ্চলে বড় আকারে অনুপ্রবেশ ঘটে।[২] এর আগেও এ অঞ্চলে চাকমা-মারমা বৌদ্ধরা বসবাস করতো। ব্রহ্মভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থ রাজোয়াং (রাজবংশ) থেকে জানা যায় খ্রিষ্টীয় ৯৪৯ সালে চুল্ল সিংহ চন্দ্র (Tsula Taing Tsandaya or Singha Chandra the junior) আরাকানের সিংহাসনে বসেন এবং ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি রাজ্য জয়ের চিহ্ন স্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন এবং সেখানে "Test-ta-gaung বা যুদ্ধ করা ভাল নয়" বাণী খোদিত করেন। স্তম্ভটি কুমিরার নিকটবর্তী কাউনিয়া ছড়ার দক্ষিণ কূলে স্থাপিত ছিল।[৩] তথ্যটি সুনীতি ভূষন কানুঙ্গো তাঁর A History of Chittagong গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৭, প্রকাশ ১৯৮৮, চট্টগ্রাম)।

১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আরাকানীদের কাছ থেকে মোগলদের হাতে চলে যায়। কাজেই ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ব্রহ্মরাজ বুদ্ধপ্রিয়ের আরাকান জয়ের পূর্বেও এ এলাকায় চাকমা-মারমা বৌদ্ধরা বসবাস করছিল। সম্রাট অশোকের (২৭২ খ্রিঃ পূর্ব - ২৩২ খ্রিঃ পূর্ব) সময় তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির (২৫৭ খ্রিঃ পূর্ব) পরে পরেই সোন ভিক্ষু ও উত্তর ভিক্ষুকে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠানো হয়। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ (১৫৭৫ খ্রিঃ জন্ম) তার ঋ-গিয়া-গর-কোচ-ব্যুন বা ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে **রাখন, হংসবতী, মারকো, মুঞং, চাকমা, কম্বোজ** ইত্যাদি দেশে

অশোকের সময় থেকে সংঘ বা (বৌদ্ধধর্ম) প্রতিষ্ঠিত হবার কথা উল্লেখ করেন।[৪] বৌদ্ধদের পৌরানিক কাহিনী মতে গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং বার্মায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে যান এবং বার্মা যাবার পথে চট্টগ্রামের চক্রশালা নামক স্থানে ধর্ম দেশনা করেছিলেন।[৫] চাকমারা বিশ্বাস করেন যে, তারা বুদ্ধ যেই শাক্য জাতিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তারা সেই জাতিরই অধস্তন বংশধর এবং চম্পক নগর তাদের নিজ শাক্য বংশীয় রাজার রাজধানী ছিল। উল্লেখ্য, চম্পক নামক এক শাক্য রাজার কাহিনী তিব্বতী বিনয় গ্রন্থ **"দুল্বা"**কে উদ্ধৃত করে প্রখ্যাত ভারত তত্ত্ববিদ William Woodville Rockhill তার The life of the Buddha গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৬]

তিনি সেখানে এও উল্লেখ করেন যে, রাজা চম্পকের অনুসারী শাক্যগণ শাক্য জাতি থেকে পতিত বা অ-শাক্য (পালিতে "সাক্য মা") হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। চাকমাদের প্রচলিত কথা "চাঙত্তুন পড়ি মা, চাঙ্মা" অর্থাৎ "চাঙ্" থেকে পতিত হয়ে "মা" শব্দ যোগে "চাঙ্মা" বা "চাকমা" শব্দের উৎপত্তি। রাজা চম্পকের অনুসারী শাক্যগণের শাক্যজাতি থেকে পতিত হয়ে অ-শাক্য বা "সাক্য মা" হয়ে যাবার কথা স্মরণ করায়।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণণা থেকে বুঝা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম স্মরণাতীত কাল থেকে চাকমা-মারমা-তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর দ্বারা লালিত হয়ে আসছিল। তবে, অতীত কালে বৌদ্ধধর্মের মূল ভূ-খন্ড মগধ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক দূরত্ব এবং স্বাভাবিকভাবে সময়গত ব্যবধানের কারনে মূল বৌদ্ধ ধর্ম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম অনেকটা বিকৃত হয়ে এসেছিল।

এক সময় চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যাদের কাছে "লুরি বা রুরি" নামক বৌদ্ধধর্মীয় গুরুরাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাজ চালিযে যেতেন। চট্টগ্রামের বড়ুয়াদের সমাজেও এরূপ অবৌদ্ধচিত ধর্মীয় গুরু "রাউলী" বিদ্যমান ছিলেন। লুরি বা রুরিরা "আঘরতারা" এবং বড়ুয়া রাউলীরা "মঘা খম্মৌজা" নামের নিজস্ব ধর্মীয় গ্রন্থ ব্যবহার করতেন। আঘরতারা মানে অক্ষর বা সূত্রের সংগ্রহ এবং মঘা খম্মৌজা সম্ভবত "কম্ম বাচা"-র বিকৃত রূপ। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রম্মরাজ মিন ডন মিন (মেং ডুন মেং)-এর রাজগুরু উ পঞ্ঞাসামী থের কর্তৃক পালি ভাষায় রচিত শাসনবংশ বা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থেও একই ধরনের অনাচারী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সন্ধান পাওয়া যায়। পালি ভাষায় এদেরকে "সমন কুথক" বা অনাচারী সন্যাসী বলা হয়। প্রখ্যাত বাঙ্গালী ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় তাঁর Sanskrit Buddhism in Burma গ্রন্থে এদেরকে "অরি" হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং অরি শব্দটি আর্য শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে করেন (আর্য > আরিয় > আরি > অরি, রুরি, লুরি, রাউলী ইত্যাদি)।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের এই নাজুক অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভাব হন এক আরাকানী বা মারমা-রাখাইন সম্প্রদায়ের ভিক্ষু সারমেধ মহাস্থবির (১৮০১-১৮৮২)। ব্রহ্মরাজ বুদ্ধপ্রিয় (১৭৮১-১৮১৯ খ্রিঃ) বা Buddhapriya ১৭৮৫ সালে আরাকান জয়ের পরে যে সব রাখাইন বৌদ্ধ চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাদেরই হারভাং (চকোরিয়া) অঞ্চলের এক পরিবারে এই ভাবী সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের জন্ম হয় ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি বাল্যকালে জনৈক সারালংকার মহাস্থবিরের নিকট শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন এবং ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে উপসম্পদা বা পূর্ণ ভিক্ষুত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা ও ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সন্ধি চুক্তির ফলে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে এলে যুবক সারমেধ ভিক্ষু গুরু সারালংকার মহাস্থবিরের সাথে আকিয়াব চলে যান। তিনি বার্মাতে ধর্ম বিনয়ে শিক্ষা গ্রহন করেন এবং তাঁর যশ খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে **"সাসনধর মহাধম্মরাজাধিরাজগুরু"** উপাধিতে ভূষিত করেন। চাকমা রাজ্যের তৎকালীন শাসন কর্ত্রী রানী কালিন্দী (১৮৪৪-১৮৭৩ খ্রিঃ) তাঁকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজ পূণ্যাহ উপলক্ষে **"সংঘরাজবিনয়ধর"** উপাধিতে ভূষিত করেন এবং উক্ত উপাধিযুক্ত শীলমোহর প্রদান করেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ মিন ডন মিন (মেং ডুন মেং) তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মে অসাধারণ অবদানের জন্য **"সাসনধজ মহাধম্মরাজাধিরাজগুরু"** উপাধিসহ শীলমোহর প্রদান করেন।

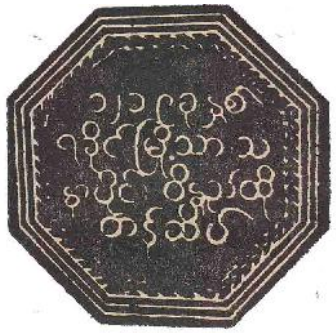

রানী কালিন্দী কর্তৃক সারমেধ মহাস্থবিরকে প্রদত্ত শীলমোহর।
(ধর্ম্মাধার মহাস্থবির রচিত সদ্ধর্মের পুনরুত্থান পুস্তক থেকে সংগৃহীত)

১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চাকমা রাণী কালিন্দীর আমন্ত্রণে আবার চাকমা রাজ্যে আগমন করেন এবং চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাজানগরে বিনয় সম্মতভাবে ভিক্ষু

উপসম্পদা গৃহ বা ভিক্ষুসীমা (ঘেং) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিনয় সম্মত ভিক্ষুসীমা। ভিক্ষুসীমাটির নাম **'সুমঙ্গল রত্ন সীমা'**। তবে তিনি এই সীমার নাম দেন 'চিং'। এর আগে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আরও পাহাড়তলী মহামুনিতে এসেছিলেন। সেখানে মহামুনির পূর্বপাশে **হাঞ্চার ঘোনা** নামক গ্রামের এক পার্বত্য ছড়ায় (নদী সীমায়) জ্ঞানালংকার ভিক্ষু (লাল মোহন ঠাকুর) প্রমূখ সাত জন রাউলী ভিক্ষুকে থেরবাদী বিনয়মতে পুনঃ দীক্ষিত করে উপসম্পদা প্রদান করেন। মোটামুটি তখন থেকেই এই সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিনয় সম্মতভাবে নতুন উদ্যমে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের নবজাগরণ শুরু হয়।

এক্ষেত্রে, অতীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের এবং প্রসারে রাঙ্গুনিয়ার কদলপুরে অবস্থিত মহামুনি বিগ্রহ মন্দির (আনুমানিক ১৭২০ খ্রিঃ নির্মিত), রাজানগরে শাক্যমুনি বিগ্রহ মন্দির (১৮৬৪ খ্রিঃ নির্মিত) এবং কাপ্তাইয়ের নিকটবর্তী চিৎমরম সত্য গোঁঞাই বিগ্রহ মন্দির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কদল পুরের মহামুনি মন্দিরের প্রায় ১২ ফুট উঁচু বুদ্ধ মুর্তিতে পূজা দিতে এবং মহাবিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন মেলাতে যোগ দিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকা হতেও হাজার হাজার বৌদ্ধ নর-নারীর আগমন হত। এই মহামুনি মুর্তির প্রতিস্থাপনে জনৈক চাইঙ্গ ভিক্ষুর একান্ত প্রচেষ্ঠা এবং মং সার্কেলের পূর্ব পুরুষ **ধনী প্রবর কুঞ্জ ধামাই** এর (উখিয়া নিবাসী) অবদান সর্বাধিক। কথিত আছে এই মুর্তি স্থাপনে কুঞ্জ ধামাই প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। শাক্যমুনি বিগ্রহ মন্দির চাকমা প্রজাদের দাবীতে চাকমা রাণী কালিন্দীর অর্থানুগ্রহে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়। তৎকালীন সময়ে মহামুনি ও শাক্যমুনি মন্দিরের পার্শ্ববর্তী দুটি ভিক্ষুসীমা নির্মিত হয়েছিল। তবে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা রজ্যের রাজধানী রাজা নগরে নির্মিত "সুমঙ্গল রত্ন সীমাই" সর্বপ্রথম বিনয় সম্মত ভিক্ষুসীমা।

তৎসত্বেও, সারমেধ মহাস্থবিরের আগমন এবং প্রকৃত থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষত চাকমা বৌদ্ধদের নিকট প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার বিশেষ ঘটেনি। তৎকালে চাকমা বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রায় ছিলই না। রাখাইন-মারমা ভিক্ষুরাই চাকমা গ্রামের বিহারে অবস্থান করে অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া, সাপ্তাহিক ক্রিয়াদি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করিয়ে দিতেন। সেই সময় পুদগলিক দান, সংঘ দান, কঠিন চীবর দান, গৃহের মাঙ্গলিক পরিত্রাণসূত্র শ্রবণ, পঞ্চশীল, অষ্টশীল পালন চাকমা সমাজের অনুপস্থিত ছিল।

চাকমা রাজগুরু **অগ্রবংশ মহাস্থবিরই** (১৯১৩ খ্রিঃ -২০০৮ খ্রিঃ) এগুলি চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা বৌদ্ধ সমাজে প্রথম প্রবর্তন করেন। তিনি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে চাকমা রাজা ত্রিদিব

রায়ের আহ্বানে বার্মা থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিপূর্বে তিনি বার্মায় ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বৌদ্ধ ধর্মের বিবিধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরে এসে তিনি ধর্মীয় জাগরণে ও সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। বহু চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা যুবকদের তিনি ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা দেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে তার শিষ্যদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেন। বর্তমান পার্বত্য ভিক্ষু সংঘের সভাপতি শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের তাঁর দীক্ষিত শিষ্য। তিনি শ্রদ্ধেয় **শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে)**-এর উপসম্পদা গুরু (আচারিয়)। তিনি **পার্বত্য চট্টল ভিক্ষু সমিতি** (যা পরবর্তী পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ) ও **পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ** প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অগ্রবংশ মহাস্থবির বাংলা ও চাকমা ভাষাতেও বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা বৌদ্ধ ধর্মে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় **শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে)** অগ্রগন্য। তিনি ধর্ম প্রচারে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ লোকোত্তর সাধনার উপর অধিক জোর দেন।

এক্ষেত্রে, শ্রদ্ধেয় জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির এর কথাও সর্বাগ্রে স্মরণ করা দরকার। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভিক্ষু বিনির্মানে অগ্রপথিক হিসাবে বিবেচিত হতে বাধ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রসারে বিশেষত দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাদানে তার অবদান পার্বত্য বৌদ্ধদের কাছে চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে। তিনি স্বনামখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **"মোনঘর"**-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বিমলতিষ্য মহাস্থবির, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধালংকার মহাস্থবিরের দীক্ষা গুরু। শ্রদ্ধেয় উঃ পঞ্চঞা জোত মহাস্থবির (উ চালা ভান্তে) পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি লোকোত্তর ও লৌকিক উভয় বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

<u>সূত্র ঃ</u>

১। Chittagong Hill Tracts District Gazetteer, Dhaka, 1971.
২। Chittagong District Gazetteer, Dhaka, 1970.
৩। চট্টগ্রামের ইতিহাস; চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি, ঢাকা, ২০১১ ইং। ...পৃঃ ৩৭
৪। Taranatha's history of Buddhism in India by Lama Chimpa and Aloka Chattopadhyaya, Delhi, 1990. ...P- 330
৫। পশ্চিম বঙ্গের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, কলিকাতা, ১৯৮৭। ...পৃঃ ১৫
৬। The life of the Buddha; William Woodville Rockhill, Malaysia, 1987. ...P- 118

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নকে কিভাবে দেখতে চাই?

প্রশান্ত ত্রিপুরা

ভূমিকা :

উনিশশত সত্তরের দশকের আগে 'উন্নয়ন' শব্দটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের খুব একটা পরিচয় ছিল না। ষাটের দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মত পদক্ষেপকে সরকারিভাবে বা আন্তর্জাতিক মহলে 'উন্নয়ন' হিসাবে অভিহিত করা হত, কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদে স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারনাকে স্বাগত জানানোর মত বিশেষ কেউ তখন ছিলেন না। অন্যদিকে ১৯৭৬ সালে যখন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয় বোর্ড' গঠিত হয়, তখনকার প্রেক্ষিতেও 'উন্নয়ন' শব্দটির প্রতি স্থানীয় জনগণের বিশেষ কোন মোহ থাকার কথা ছিল না। থাকলেও দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব ও ভূমি রক্ষা এবং অত্যাচার নির্যাতন ও হামলা এড়ানো বা সম্ভব হলে প্রতিহত করা - এই সবই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবনের মূল মন্ত্র। তবে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টে যেতে থকে এবং 'উন্নয়ন' হয়ে ওঠে অনেকের আরাধনা, আলোচনা ও কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু।

উল্লিখিত প্রেক্ষিতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে সূচিত ব্যাপক প্রত্যাশা ও জিজ্ঞাসার অংশ হিসাবে, প্রথম বারের মত বেশ ব্যাপক পরিসরে প্রশ্ন উঠেছিল, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নকে কিভাবে দেখতে চাই? সেই সূত্রে, ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর ১৮-১৯ তারিখে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন' শীর্ষক সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য, 'Culture, Development and Identity in the Chittagong Hill Tracts' শিরোনামে ইংরেজিতে লেখা একটা প্রবন্ধের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে নিজের চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরার একটা সুযোগ আমার হয়েছির (Tripura 1998) তবে দূর্ভাগ্যবশত আমি নিজে সেই অনুষ্ঠানে থাকতে পারিনি শেষ পর্যন্ত, তাই প্রবন্ধটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হলেও উন্নয়ন নিয়ে অন্য সকলের সাথে আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারিনি সেবার। সে সময় অবশ্য 'উন্নয়ন জগত' সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ ধারনা ছিল না, যা আমি পরে অর্জন করি অনেকটা কাকতালীয়ভাবে একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (কেয়ার বাংলাদেশে)

যোগদানের মাধ্যমে, এবং সে সুবাদে টানা প্রায় এগার বছর একজন পূর্ণকালীন উন্নয়ন পেশাজীবি হিসাবে কাজ করার মাধ্যমে। কাজেই বর্তমান প্রবন্ধের পেছনে একদিকে রয়েছে বিদ্যাজাগতিক পরিসরে থাকা অবস্থায় আহরিত আমার বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও জিজ্ঞাসা, এবং অন্যদিকে উন্নয়ন খাতে কাজ করার সূত্রে অর্জিত আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

উন্নয়ন ধারনার ইতিবৃত্ত :

সমকালীন অর্থে 'উন্নয়ন' বলতে যা বোঝায়, এটা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা সবাই কমবেশি জানেন যে দুনিয়া জুড়ে এই ধারনার প্রসার মূলত ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর কালে, যখন ইউরোপ কেন্দ্রীক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলো ভেঙ্গে গিয়ে অনেক নতুন দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে, এবং বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আসন পাকাপোক্ত করে নেয়। উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক প্রতিষ্ঠান- যেমন: জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মত আন্তর্জাতিক সংস্থা, এবং কেয়ারের মত বেসরকারি সংগঠন (যাদের সবার জন্ম সাল ছিল ১৯৪৫ বা এর কাছাকাছি)- আত্মপ্রকাশ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি নূতন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপক প্রসারের অংশ হিসাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতায় পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই 'উন্নয়ন' বলতে সচরাচর অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বোঝানো হত, যেগুলি মূলত ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এ ধরনের উন্নয়নের ধারনার মূল উৎস ছিল এমন একটি ভাবাদর্শ যেখানে 'পশ্চিমা' দেশগুলিকে সবচাইতে 'উন্নত' ও 'আধুনিক' ধরে নিয়ে তাদের দেখানো পথে অগ্রসর হওয়াকে অন্য সবার জন্য কাঙ্খিত ও সম্ভব হিসাবে দেখা হত। টেকসই উন্নয়ন, অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি ধারনা এসেছে অপেক্ষাকৃত পরে, উন্নয়নের মূলধারার বিভিন্ন ব্যর্থতা বা নেতিবাচক প্রভাবের কারণে, নানাবিধ সমালোচনা ও প্রতিরোধের মূখে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের দেখানো উন্নয়নের পথে হাঁটার বদলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্নও বিশ্বের অনেক প্রান্তে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছির। এই প্রেক্ষিতে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের দেওয়া উন্নয়ন সহায়তার পেছনে সমাজবাদ ঠেকানোর অভিপ্রায়ও কাজ করেছিল। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর 'মূক্ত বাজার অর্থনীতির' মতাদর্শিক কাঠামোই বিশ্ব জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করতে থাকে, যার ছায়াতে পরিচালিত হয়েছে উন্নয়নের ধারনাকে পরিশীলিত করার, এবং বিভিন্ন দেশের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ন করে সাজিয়ে নেওয়ার নানাবিধ প্রয়াস।

অবশ্য উত্তর আধুনিকতাবাদের অভিঘাতে বিদ্যাজগতে উন্নয়ন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার মোড় অনেকটাই ঘুরে গেছে গত তিন দশকের মধ্যে। 'কি ধরনের উন্নয়ন

চাই' বা 'কিভাবে কাঙ্খিত উন্নয়ন হবে' এ ধরনের প্রশ্নে বদলে অনেকে নজর দিয়েছেন উন্নয়নের ধারনা যেভাবেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, সেগুলির বাস্তব ফলাফল কি- এই বিষয়ের উপর। এ ধরনের বিশ্লেষণের সূত্রে উন্নয়নের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটা ক্রমবর্ধমান ধারা বিদ্যাজগতে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন- কোনো দেশ, গোষ্ঠী বা জনসমষ্টিকে 'উন্নয়নের লক্ষ্য বস্তু'তে পরিনত করার কাজটি যে শুধু জ্ঞানচর্চার বিষয় নয়, বরং ক্ষমতা চর্চার একটি বিশেষ পন্থা তথা ফলাফল, এই সিদ্ধান্ত ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে সংশ্লিষ্ট দেশ বা জনগোষ্ঠীকে কিভাবে উন্নয়নের পথে নিয়ে আসা যাবে, সে প্রশ্ন করার বদলে কারা কেন কাদেরকে 'অনুন্নত', 'দরিদ্র' ইত্যাদি হিসাবে আখ্যায়িত করছে, এবং সেটি করার ক্ষমতা কারা কখন কিভাবে পায়, বা এই ক্ষমতা প্রয়োগের বাস্তব ফলাফল কি দাঁড়ায়, এসব প্রশ্নে উত্তর খোঁজার দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেওয়া শুরু হয়। এ ধরনের দৃষ্টিকোণের প্রবক্তাদের মধ্যে অনেকে (যেমন- Ferguson 1990, Escobar 1995, Rahnema and Bawtree 1997) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিকল্প ধারার উন্নয়ন (টেকসই, জনঅংশগ্রহনমূলক ইত্যাদি) অন্বেষার বদলে 'উন্নয়নের বিকল্প' খোঁজার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন।

উন্নয়নের ঢেউ যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে লাগল :

'উন্নয়ন' বিষয়ক বৈশ্বিক ডিসকোর্সে বাংলাদেশ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তলাবিহীন ঝুড়ি নামে আখ্যায়িত একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ কিভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, আর্থ সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেই কাহিনীর একটা বড় অংশ জুড়ে আছে দারিদ্রের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষদের তথা তাদের সহযোগী অনেক দেশ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু কীর্তিগাথা। সেগুলির মধ্যে একদিকে আছে নোবেল জয়ী অধ্যাপক ইউনূস ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক থেকে শুরু করে পৃথিবীর বৃহত্তম এনজিও হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা ব্র্যাকসহ সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অগণিত এনজিও'র কাহিনী, অন্যদিকে মূলত সস্তা নারী শ্রমকে পুঁজি করে প্রসার লাভ করা রপ্তানী মূখী পোশাক শিল্প, আর এদেশের অর্থনীতির একটি প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠা বহু দক্ষ-অদক্ষ প্রবাসী শ্রমিক। তবে জাতীয় 'মূলধারা'র এসব প্রবণতা থেকে দীর্ঘকাল ধরে অনেকটাই দূরে রয়ে গিয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম, যে অঞ্চলের খবর যতটুকু দেশবাসী বা বিশ্ববাসীর কানে আসত, তা হত রাষ্ট্রীয় উপেক্ষা ও দমন নীতি সংক্রান্ত, বা বিদ্রোহ, সংঘাত ও সহিংসতার খন্ডিত বয়ান।

তবে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রেক্ষিতে এ অঞ্চলে উন্নয়নের হাওয়া লাগতে শুরু করে, এবং এক পর্যায়ে সেখানে বৈদেশিক অনুদান-নির্ভর বিভিন্ন

দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রম চালু হয়ে যায়। শুরুর দিকে এসবের সাথে আমার তেমন কোন প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা ছিল না। 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সংস্কৃত, আত্মপরিচয় ও উন্নয়ন' নামে ১৯৯৮ সালে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম বটে (পূর্বেল্লিখিত), তবে তা ছিল মূলত পুথিগত বিদ্যার ভিত্তিতে লেখা। এর পরে বছর তিনেক আমি মূলত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও বিভাগীয় সভাপতিত্বের পাশাপাশি সাংসারিক দায়িত্ব নিয়েই মগ্ন ছিলাম, যখন উন্নয়ন জগত সম্পর্কে বিশেষ খোঁজ খবর রাখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ২০০১ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে কেয়ার বাংলাদেশে কাজ করার একটা প্রস্তাব পাই, যাতে শুরুতে অনীহা থাকলেও পরে আমি আগ্রহ দেখাই, এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কর্মসূচী সমন্বয়কারী' হিসাবে উক্ত সংগঠনের একটি পরীক্ষামূলক ও রাঙ্গামাটি ভিত্তিক নূতন পদে যোগদান করি।

কাজটা করতে গিয়ে আমি অধিকার-ভিত্তিক পন্থায় কাজ করতে গেলে কিভাবে এগুতে হবে, এ সম্পর্কে কেয়ারে তখন চালু ধ্যান ধারনার আলোকে অগ্রসর হয়েছিলাম। এ কাজে কেয়ারের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন সহকর্মীর সহায়তা নেওয়ার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এমন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও সম্পৃক্ত করেছিলাম। আমাদের প্রথম কাজ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ধরনের সমস্যার উপর কেয়ার কাজ করবে, তা নিরূপন করা, এবং সেই সমস্যার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর উপর কাজ করার পন্থা নির্ধারণ করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যা হিসাবে আমরা চিহ্নিত করেছিলাম এখানকার আদিবাসীদের প্রান্তিকতাকে, এবং এই প্রবণতার মূলে আমরা প্রধান যেসব কারণ চিহ্নিত করেছিলাম, যেগুলোর মধ্যে ছিল (CARE Bangladesh 2005):

- পার্বত্য চট্টগ্রামের তথা দেশের অন্যত্র আদিবাসীদের যথাযথ সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকা;
- আদিবাসীদের প্রতি 'বৃহত্তর' সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন নেতিবাচক ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি;
- রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান আদিবাসী-বিমূখ বিভিন্ন নীতিমালা ও চর্চার ব্যাপকতা, অথবা বিদ্যমান অনুকুল নীতিমালার প্রয়োগের অভাব;
- ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাহাড়ি আদিবাসীদের প্রান্তিক অবস্থান, এবং নিজেদের শ্রমের ফসল বাজারজাত করার ক্ষেত্রে পাহাড়ি কৃষকদের বিভিন্ন পন্থায় প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার প্রবণতা।

এ ধরণের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকের সাথে কয়েক দফা আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রযোজ্য উন্নয়ন কর্মসূচীর একটা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ধার্য্য করা হয় যেটির মূল কথা ছিল এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তিক

জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রান্তিকতা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে কাজের কিছু প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি (অধিকার ও উৎপাদনশীলতা, উভয় দিক)। প্রতিটা ক্ষেত্রেই এ অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ শাসন ব্যবস্থার আওতায় কাজ করা, এবং সেই ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সহযোগিতা দানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, এবং এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সকল কর্মকান্ডের মূলে থাকবে স্থানীয় জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহন ও ক্ষমতায়ন। এসব ক্ষেত্রে কেয়ার বা অনুরূপ কোন সংস্থার ভূমিকা কি হতে পারে, তার একটা তালিকা করা হয়েছিল নিম্নরূপ:

- বিশ্লেষণ
- প্রত্যক্ষ সহায়তা (জরুরী ত্রাণ, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রভৃতি)
- উন্নয়নকামী স্থানীয় জনগনের মূখপাত্র হিসাবে কাজ করা (এডভোকেসি)
- অনুঘটকের ভূমিকা পালন (ফ্যাসিলিটেশন)
- সংলাপের ব্যবস্থা করা ও মধ্যস্থতা

এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল, কেয়ারের মত বাইরের কোনো সংস্থা একা সব ধরনের কাজ করবে না, বরং তারা সময়ের পরিক্রমায় তালিকার নিচের দিকে থাকা কাজগুলিতেই বেশী নজর দেবে, এবং একটা সময় নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেবে। এক্ষেত্রে প্রত্যাশাটা ছিল এরকম যে, স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন কাজ যাদের যেটা করার কথা, তারা সেগুলোকে যথাযথভাবে করতে শুরু করবে, ফলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষেরা পেতে শুরু করবে কাঙ্খিত সেবা, প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের অধিকার এবং কেয়ারের মত প্রতিষ্ঠানের আর বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকবে না।

বাস্তবে অবশ্য বিভিন্ন কারণে কেয়ার পার্বত্য চট্টগ্রামে তার প্রত্যাশিত কর্মসূচী সে অর্থে শুরুই করতে পারেনি কখনো, এবং সে অবস্থাতেই সংগঠনটি সে অঞ্চল থেকে তার সকল কর্মকান্ড গুটিয়ে নেয় (ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে আরো আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম কর্মসূচী সমন্বয়ের দায়িত্ব থেকে সরে এসেছিলাম)। তথাপি এভাবে কেয়ারের সূচিত বা পরিকল্পিত অনেক কর্মকান্ডই চালু থেকে গিয়েছিল, বা নুতন করে আবার চালু হয়েছিল, ইউএনডিপির মাধ্যমে (বিষয়টি কাকতালীয় ছিল না, কারণ কেয়ার ও ইউএনডিপির মধ্যে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল, এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউএনডিপির কার্যক্রম শুরু করার ক্ষেত্রে নানাভাবে কেয়ারের সহায়তা নিয়েছিল)। কেয়ারে কাজ করার সময় শেষদিকে বছর তিনেক পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে কোন পেশাগত যুক্ততা ছিল না আমার ব্যক্তিগতভাবে, তবে পরে ইউএনডিপির 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি'তে যোগদানের পর আবার এ অঞ্চলে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে আবার প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ি আমি (২০০৯-২০১২)। এ সব

অভিজ্ঞতার আলোকে তথা অন্যান্য বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা সিদ্ধান্ত টেনেছি যে, কাগজে কলমে উন্নয়নের ধারনাকে যতই যৌক্তিক বা সুচিন্তিত মনে হোক না কেন, বাস্তব দুনিয়া চলে ভিন্ন হিসাব-নিকাশে এবং সেখানে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে কারা কিভাবে পুরো বিষয়টিকে দেখছে, নিজেদের স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা করছে - এসব বিষয়ের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আর প্রচলিত অর্থে উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি, চুড়ান্ত বিশ্লেষনে তা এখনো 'দাতা'দের চাহিদা ও পরিকল্পনা ধরেই পরিচালিত হয়। এই বাস্তবতায় যতক্ষন মৌলিক পরিবর্তন আসবে না ততক্ষন পর্যন্ত 'কেমন উন্নয়ন চাই' এই প্রশ্নের পাশাপাশি 'আদৌ উন্নয়ন চাই না' সেটাকেও সামনে নিয়ে আসার দরকার রয়েছে।

উন্নয়ন ছাড়া কি গতি নেই ?

ষোল বছর আগে লেখা প্রবন্ধে আমি গল্পচ্ছলে শোনা একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির একটা মন্তব্য তুলে ধরেছিলাম, যা ছিল এ রকম, 'আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষেরা উন্নয়ন ছাড়াইতো চলেছি বহু বছর। না হয় উন্নয়ন একটু দেরীতেই আসল, ক্ষতি কি?' এখন ধরা যাক গত ষোল সতের বছরে উন্নয়ন কতটা কি আকারে আসল, তা আমরা খতিয়ে দেখলাম, এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম, উন্নয়ন বলতে যা আমরা অনেকে প্রত্যাশা করেছিলাম, তা সে অর্থে এখনো আসেনি। এই প্রেক্ষিতে কেউ যদি বলে বসেন, উন্নয়নের দরকারইবা কি? এত সময়, মেধা ও অর্থ খরচ করে মরীচিকার মত যে উন্নয়নের পেছনে বহু মানুষ দৌড়াচ্ছে, তা যদি নাইবা আসে, ক্ষতি কি? ক্ষতির বদলে লাভওতো হতে পারে যদি সবাই তাদের সময় ও মেধা অন্য কোনভাবে কাজে লাগায়। প্রসঙ্গত আবারো স্মর্তব্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে 'উন্নয়ন' ধারণাটা বিস্তার লাভ করেছিল ১৯৯৭ সালের 'শান্তিচুক্তি'র প্রেক্ষিতে। কিন্তু যত সময় গেছে, সেই চুক্তির প্রত্যাশিত বাস্তবায়ন নিয়ে হতাশা, বিতর্ক ও মতপার্থক্য আরো বিস্তৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় কাঙ্খিত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতাসমূহের নিরসনের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ দেওয়ার দরকার রয়েছে। অবশেষে 'চুক্তি বাস্তবায়ন' নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়, যেটুকু হয়নি, তা কবে হবে সে আশায় বসে থাকার কোন মানে আছে কি? তা যদি আদৌ কখনো না হয়, তাতে কার লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে? উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের রাঙ্গামাটি ঘোষনাপত্রের এক জায়গায় 'শান্তি' চুক্তি বাস্তবায়নের ধীর গতিতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়েছিল। এখন কথা হল, যে ধরণের উৎকণ্ঠা ষোল বছর ধরে প্রকাশ হয়ে আসছে, সেগুলি নিয়ে আর কতকাল মাথা ঘামাবে মানুষ? প্রায় অভ্যাসে পরিণত হওয়া এসব কথার বদলে নুতন কোন চিন্তা,

নুতন কোন প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসার সময় হয় নি কি? কথাগুলি আমি বলছি স্রেফ আমাদের চিন্তায় একটু নাড়া দেওয়ার জন্য, সবার ভাবনাকে একটু উস্কে দেওয়ার জন্য।

ভাবনার খোরাক হিসাবে উন্নয়ন বিষয়ে আর একটি কথা যোগ করেই বর্তমান আলোচনার ইতি টানব। এই প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতির লোকেরা নিজেদের ভাষায় 'উন্নয়ন' সম্পর্কে কিভাবে কথা বলে? তারা এর কোন প্রতিশব্দ তৈরি করেছে, নাকি বাংলা 'উন্নয়ন' শব্দটিই ব্যবহার করে? এ নিয়ে বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলার পর দেখলাম, যেমনটা ধারনা করেছিলাম, বাস্তবে উন্নয়নের কোন বহুল প্রচলিত নিজস্ব প্রতিশব্দ কোন ভাষাতেই চালু নেই, তবে 'উপরে ওঠা', 'বিকাশ', 'ভালো থাকা' ইত্যাদি বোঝায়, এ ধরনের শব্দকে উন্নয়ন অর্থে ব্যবহার করেন অনেকে, আবার সরাসরি বাংলা 'উন্নয়ন' শব্দও অনেকে ব্যবহার করেন। এসব বিষয়ে ভাবতে গিয়ে আমার মনে হল, 'বিকাশ' অর্থে 'উন্নয়ন' শেখানোর দরকার পড়ে না, উদ্ভিদ বা পশুপাখির বেলায় - তারা আপনা আপনিই বিকশিত হয় অনুকুল পরিবেশ পেলে। মানুষের বেলায় তাহলে 'উন্নয়ন' শেখাতে বা তা নিয়ে এত ভাবতে হবে কেন? অন্যদিকে গাছের বিকাশের জন্য যে আলো বাতাস পানি খনিজ দরকার, সেগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অবস্থায় যদি প্রশ্ন ওঠে, তার বিকাশ কিভাবে দেখতে চাই, উত্তরটা স্পষ্ট নয় কি?

টীকা/তথ্যসূত্র :

আনু মুহাম্মদ (১৯৮৮) বাংলাদেশে উন্নয়ন সংকট ও এনজিও মডেল। ঢাকা: প্রচিন্তা প্রকাশনী।

CARE Bangladesh (2005) Overcoming Marginalization: A Program Strategy Paper for the CHT Region: (Unpublished document: Revised draft, March 2005)

Escobar, Arturo (1995) Encountering Development: The making and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.

Ferguson, James (1998) The Anti-Politics Machine: "Development", Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. University of Minnesota Press.

Tripura, Prashanta (1998) Culture, Identity and Development in the Chittagong Hill Tracts. Paper Prepared for Presentation at the Conference on "Development in the Chittagong Hill Tracts", held on

December 18 and 19, 1998 in Rangamati. First published in Discourse: A Journal of Policy Studies, Vol. 2, No. 2) Dhaka: Institute for Development Policy Analysis and Advocacy at Proshika, 1998); available at http://ptripura2.wordpress.com/2014/01/11/lest-we-repeat-past-mistakes/.

Rahnema, Majid and Victoria Bawtree (1997) The Post-Development Reader. Dhaka: University Press Limited.

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও এর নির্মূলে আমাদের করণীয়

ঝুমা দেওয়ান ও সিনোরা চাকমা

পটভূমি :

পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত প্রত্যেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আলাদা সামাজিক আইন ও প্রথা আছে যেগুলো বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তুলনা করলে অত্যন্ত ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময়। বলা নিস্প্রয়োজন, এই আইন ও প্রথা এখানকার নারী ও পুরুষদের মাঝে এক বিশেষ ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তৈরী করেছে। এ অঞ্চলের বাস্তবতার কারণে এখানকার নারীরা সমতলের নারীদের তুলনায় অনেক বেশী জীবন সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত যার ফলশ্রুতিতে ঘরে, জুমে, পানি সংগ্রহে, বাজারে উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে তথা সর্বত্র পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবাধ বিচরণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সামাজিক ও প্রথাগতভাবে স্বীকৃত এ রীতি-নীতির কারণে পার্বত্য এলাকার নারীরা একসময় স্বাধীন ও সুরক্ষিত অবস্থায় বিচরণ করত এমনকি অত্যন্ত দুর্গম এলাকার নির্জন জুমঘরেও (মোনঘর) একাকী নির্বিঘ্নে রাত্রি যাপন করত। নারীর প্রতি বিক্ষিপ্ত কিছু লঘু মাপের পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার কথা শোনা গেলেও অন্যান্য সহিংসতাসমূহ বিশেষ করে যৌন সহিংসতার সাথে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কোন পরিচিতিই ছিলনা বললেই চলে। অথচ কালের পরিক্রমায় ও জনবসতির দৃশ্যপট পরিবর্তনের কারণে পার্বত্য অঞ্চলে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি যৌন সহিংসতা বর্তমানে চরম উদ্বেগের বিষয়।

দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি সংঘাতপ্রবণ অঞ্চল। শান্তি চুক্তির সব সুবিধাসমূহ অনুধাবনের অপারগতার ফলে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ অঞ্চলের শান্তি, স্থিরতা, পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠা যেমন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তেমনি এ অঞ্চলের পুরানো বিভিন্ন সমস্যার সাথে এখন যুক্ত হচ্ছে দুর্বল ও অসহায় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি শোষণ ও সহিংসতার আরো অনেক নতুন মাত্রা। এই পটভূমির আলোকে এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা ও গণমাধ্যম থেকে

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সমস্যা আশংকাজনক হারে বেড়েছে ও তা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামূলক ঘটনা তুলনামূলকভাবে বিগত সময়ের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কাপেং ফাউন্ডেশনের ২০১৩ সালের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, পার্বত্য অঞ্চল ও সমতলে মোট ৬৭ টি আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যার মধ্যে ৫৪টি পার্বত্য চট্টগ্রামের। পার্বত্য এলাকায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান একটি মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়। ২০১১ সালে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস কমিশনের দ্বারা রেকর্ডকৃত ২৬টি সহিংসতার ঘটনার বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ৩-১৮ বছর বয়সের মেয়েরা মূলত নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ধর্ষণ, গণ-ধর্ষণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা, গুম ইত্যাদি ঘটনার পাশাপাশি পারিবারিক বিভিন্ন নির্যাতন যেমন: অপরিণত বয়সে বিবাহ, বহু বিবাহ, মানসিক তথা শারিরীক নির্যাতন, নিপীড়ণ ইত্যাদি দিন দিন বেড়েই চলেছে যা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

দেশের একজন নাগরিক হিসেবে সকল নারী ও শিশুর সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য আইনী সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। পাশাপাশি তাছাড়া, এই অঞ্চলের প্রথাগত বিচারব্যবস্থাকে আরো বেশী নারী বান্ধব ও সংবেদনশীল করার জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখা দরকার, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জন-সচেতনতা ও জনমত গঠন করা এখন সময়ের দাবী। কারণ এটি শুধু নারীর সমস্যা নয় বরং একটি সামাজিক সমস্যা ও ব্যাধি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে নারী অধিকার অর্জন, নারীর উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা তথা ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে অনেক সুদূরপ্রসারী ও দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার সিএইচটিডিএফ প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর পরিচালিত বেইজলাইন প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৪৫% নারী অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য আয় রোজগারমূলক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত, অপরদিকে তুলনা করলে প্রকল্প এলাকার বাইরের চিত্র হচ্ছে ৩৮%। একই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাড়া নারী উন্নয়ন দল গঠনের ফলে নারীরা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয়ে অভিগম্যতা অর্জন করেছে যা নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। একই প্রকল্পের ২০১৩ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের জেন্ডার পর্যালোচনা প্রতিবেদন অনুযায়ী নারীর অর্থনৈতিক অবদান বৃদ্ধির কারণে যে সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে তা হল; পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা, পরিবারে তার সম্মান বৃদ্ধি, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব বৃদ্ধি, সমাজ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকায় এবং সর্বোপরি মত

প্রকাশের স্বাধীনতায়। অথচ নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর এই পথ চলা ও অগ্রযাত্রায় এবং পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় বিশাল বাধাস্বরূপ। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৫৮% প্রকল্প এলাকার ও ৬২% প্রকল্প এলাকার বাইরের নারীরা সবচেয়ে বেশী মৌখিক সহিংসতার শিকার হন, এরপর যথাক্রমে রয়েছে শারিরীক সহিংসতা, যৌতুকের কারণে সহিংসতা, যৌন সহিংসতা বিশেষ করে কন্যাশিশুদের প্রতি এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বাধা প্রদান। তাই কমিউনিটি পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের উপর সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিস্তার ও ধরণ :

মালেয়া ফাউন্ডেশনের ২০১২ এর তথ্য অনুযায়ী, মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তাদের কাছে প্রাপ্ত মানবাধিকার সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর প্রতি সহিংসতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (৩৯%)। আর দ্বিতীয়তে রয়েছে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা (২২%)। ২০১২ সালে মে থেকে জুন পর্যন্ত নারীর প্রতি সহিংসতা হার ছিলো ২০% এবং ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার হার ছিলো ২৩% এবং ২০১২ সালে আগষ্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নারীর প্রতি সহিংসতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫% পর্যন্ত। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এই চার মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতল অঞ্চলে কমপক্ষে ১৯ জন আদিবাসী নারী যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। কাপেং ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের আদিবাসী নারী ও শিশুরা প্রতিনিয়ত তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার, যৌন সহিংসতার, নিরাপত্তাহীনতার ও হুমকির শিকার হচ্ছে। এছাড়াও পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, প্রতারণা, সাইবার হয়রানী, ইভ টিজিং এর মত ঘটনার শিকার হচ্ছে পার্বত্য এলাকার অসংখ্য নারী ও কন্যাশিশু।

আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, কাপেং ফাউন্ডেশন, উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক বিগত বছর পাঁচেক থেকে তিন পার্বত্য জেলায় আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। এ ঘটনাসমূহ সামান্য বিশ্লেষণ করলেই তা আমাদের এ ধরণের ঘটনার পিছনের মূল কারণ, ধরণ এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ধারণা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বিশ্লেষণ করলে পরিলক্ষিত হয় যে বেশীরভাগ ঘটনাই ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিনিয়ত জোরপূর্বক ভূমির দখল ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের শত্রুপক্ষীয় প্রতিবেশীতে পরিণত করছে যেখানে পুরানো শত্রুতা ও কলহের জের উত্তেজনাপূর্ণ সহিংসতাকে আরো বেশী উস্কে দিচ্ছে। অধিকাংশ সহিংসতার ঘটনা ঘটে থাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অথবা যেখানে নারী ও শিশুরা পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে না। এ অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত পরিবর্তিত নতুন পুনর্বাসন ও

বসতি প্রেক্ষাপট এ অবস্থার অবনতিতে আরো বেশী ভূমিকা রাখছে যার ফলশ্রুতিতে ঐতিহ্যবাহী বন্ধন ও সামাজিক সম্পর্ক প্রায়শ: ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সহিংসতা প্রতিরোধে নারী ও শিশুর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বাধাসমূহ :

অধিকাংশের মতে, দোষী ব্যক্তির/ সংশ্লিষ্টদের কোন দৃষ্টান্তমূলক সাজা না হওয়া একটি মূল কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পিছনে । বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে স্বরাষ্টমন্ত্রনালয় হতে ২০১০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সম্পর্কিত মামলার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে । উপরোক্ত মামলাসমূহে বান্দরবানে ১৪ টি, খাগড়াছড়িতে ১২ টি এবং রাঙ্গামাটিতে ১৪টি মামলার জন্য চার্জশীট তৈরী করা হয়েছে। রির্পোট ফাইল করা হয়েছে বান্দরবান এবং খাগড়াছড়িতে ৫টি করে এবং রাঙ্গামাটিতে ৩টি। কেইসের শুনানী হয়েছে বান্দরবানে ২টি এবং রাঙ্গামাটিতে ৪টি। বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটিতে ২টি করে মামলার রায় হয়েছে কিন্তু কোনটিতেই দোষী ব্যক্তির বা সংশ্লিষ্টদের কোন দৃষ্টান্তমূলক সাজা হয়নি।

যে কোন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে পরিবার ও সমাজের বিশেষ সম্মানের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামও এর ব্যতিক্রম নয়। সে কারণে যখন নারীর প্রতি নির্যাতনের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের সম্মান ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই ধরে নেয়া হয় যে, একজন আদর্শ নারী মাত্রই এর প্রতিবাদ না করে মুখ বুজে নীরবে সবকিছু সহ্য করে যাবে।

সাধারনভাবে, পার্বত্য অঞ্চলে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলো থানায় রিপোর্ট বা মামলা না করার এক ধরণের প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ মানুষ ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করে যে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে পুলিশ কার্যকরীভাবে সহযোগীতা করবে না। এমন কি যে সব ক্ষেত্রে থানায় রিপোর্ট করা হয় সেগুলোও মামলার দীর্ঘসূত্রতার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ বাহিনীর অসহযোগিতার কারণে (অধিকাংশের বিশ্বাস যে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের সাথে পুলিশের দুষ্কর্মে সহযোগীতা থাকে) শেষ পর্যন্ত খুব একটা এগোয় না। সিএইচটিডিএফ প্রকল্পের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর পরিচালিত বেইজলাইন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০% এর চেয়েও কম খানার সদস্যরা নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধে কোর্টের ভূমিকার ব্যাপারে অবগত আর বিভিন্ন বেসরকারী খাতের সেবার ব্যাপারে তাদের কোন ধারণা নেই বললেই চলে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারী সেবা দাতাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ অঞ্চলে সংঘটিত সহিংসতামূলক ঘটনায় বিশেষ করে যখন পাহাড়ী নারী ও শিশুরা সহিংসতার শিকার হয় তখন সংশ্লিষ্ট প্রসাশন, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং ডাক্তাররা

নিরপেক্ষ ও কার্যকরীভাবে তদন্ত সম্পন্ন করার ব্যাপারে সহযোগীতা করেন না এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীর প্রত্যক্ষ প্রমানাদিসমূহও নষ্ট করে দেয়ার ব্যাপারে তৎপর থাকেন। তাছাড়া পাহাড়ের নারীদের মধ্যে সহিংসতার ন্যায়বিচার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে আইনী সচেতনতার মারাত্মক অভাব লক্ষ্য করা যায়।

নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহজে তা পাওয়ার উপায় :

যেহেতু নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু বিভিন্ন সমস্যা বা ক্ষতির সম্মুখীন হন ও ফলশ্রুতিতে তার নিজের, পরিবার ও সমাজের উপর নানা ধরণের প্রভাব পড়ে, সেহেতু তাদের আশু সহায়তার জন্য বিভিন্ন জরুরী পদক্ষেপের প্রয়োজন । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডাক্তারী পরীক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তা, আইন সহায়তা, মনো-সামাজিক পরামর্শ (কাউন্সেলিং) সেবা, নিরাপদ হেফাজতের সুরক্ষা, আশ্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসন ইত্যাদি। সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ ধরণের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মহিলা ও শিশু বিষয়ক নিরাপদ আবাসন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, পারিবারিক আদালত, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল বা ওসিসি (জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক), গ্রাম্য সালিশী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মানবাধিকার কমিশন, স্থানীয় বেসরকারী সংগঠন বা এনজিও। উপরোক্ত সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামেও নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এবং নারী অধিকার তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার আওতায় নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সহজে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেবা কার্যক্রমসমূহ :

একজন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু যে সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবা নিতে পারেন তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগকারী আদালত, থানা বা হাসপাতাল যে কোন জায়গায় বিচারের জন্য প্রথমে যেতে পারেন।

- থানায় মামলা দায়ের করলে- আঘাত ও ধর্ষণের আলামতের জন্য ডাক্তারী পরীক্ষা ও সনদপত্র প্রয়োজন। কারণ ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদন পুলিশ তদন্ত কার্যক্রমের জন্য গুরত্বপূর্ণ। সাধারনত পুলিশ নিজ উদ্যোগে ডাক্তারী পরীক্ষা করায় এবং ডাক্তারী পরীক্ষার সনদের ফটোকপি নির্যাতনের শিকার নারীকে দেওয়া হয়। আঘাত/জখম লঘু বা অল্পমাত্রায় হলে নির্যাতনের শিকার নারী নিজে ডাক্তারী পরীক্ষা করতে পারেন ও সনদ সংগ্রহ করতে পারেন।
- থানা মামলাটি এথাহারভূক্ত করে সংশ্লিষ্ট আদালতের কাছে প্রতিবেদন পাঠাবে এবং প্রয়োজনীয় আলামত উদ্ধার ও স্বাক্ষীর জবানবন্দি নিয়ে তদন্ত কাজ পরিচালনা

করবে । আসামী গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেয়া ও তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করে অদালতে প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে আদালতের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মামলার তদন্ত কাজ পরিচালিত হয়। অভিযুক্ত ও স্বাক্ষীকে আদালতের নির্দেশে (সমন ও ওয়ারেন্ট পাবার পর) আদালতে উপস্থিত করবে।

- প্রভাবশালী ব্যক্তির বা অন্য যেকোন কারণে নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তি থানায় অভিযোগ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ করবেন। আদালতে সরাসরি বিচার প্রার্থনা করা হলে বিচারক অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন এবং এরপরে, ঘটনা তদন্ত করার জন্য সাধারনত থানায় পাঠান ও তদন্তের নির্দেশ দেন। গৌণ বা লঘু অপরাধ যেমন স্ত্রীকে মারধর করা, খোরপোষ না দেয়া বা বহুবিবাহ ইত্যাদি ঘটনায় স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদেরকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। সব ক্ষেত্রেই আদালতের তত্ত্বাবধানে মামলার তদন্ত কাজ পরিচালিত হয়। সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করতে কোন পুলিশ কর্মকর্তা দায়িত্বে অবহেলা করলে আদালত তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন।
- নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে যে কোন পক্ষের আপীল বিভাগে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এবং ফৌজদারী আইনের আওতায় পড়ে এমন আপরাধসমূহে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পক্ষে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিয়ে মামলা পরিচালনার জন্য সরকারী আইনজীবী রয়েছেন। তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর (পি.পি) নামে পরিচিত। এই সকল মামলায় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পক্ষে নিজ অর্থে আইনজীবী নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন নাই।
- আইন সহায়তা কমিটি : আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং বিভিন্ন আর্থ- সামাজিক কারণে যারা বিচার পায় না তাদেরকে আইনগত সহায়তা দেয়ার নিমিত্তে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৬) অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় আইন সহায়তা তহবিল রয়েছে। এই তহবিল পরিচালনার প্রধান হলেন জেলা ও দায়রা জজ। এই সংস্থার মাধ্যমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার ক্ষেত্রেই আইনী সহায়তা পাওয়া যায়। তহবিল পরিচালনা কমিটি বরাবর আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনজীবী'র ফি, কোর্ট ফি ছাড়াও অন্যান্য খরচাদি যেমন মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজ ও দলিলপত্রের কপি বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয় :

হাসপাতাল, ডাক্তার ও রাসায়নিক পরীক্ষক: আঘাত, ধর্ষণ, মৃত্যু, এসিড আক্রমণ এধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন হয়-

- আঘাতের শিকার হলে:কোন জায়গায়, কতদিন আগে. ক্ষতের পরিমান এবং কি অস্ত্র দিয়ে ক্ষত করা হয়েছে তার প্রতিবেদন।

- ধর্ষণের শিকার হলে: শারীরিক আঘাত, কামড় এর চিহ্ন ফরেনসিক পরীক্ষা ও রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্ষণের আলামত চিহ্নিত করা।
- এসিড দ্বারা আক্রান্ত হলে: রাসায়নিক ও মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে কি ধরনের দাহ্য পদার্থ, কি ধরণের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদির প্রতিবেদন।

মনে রাখা প্রয়োজন ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য এ ধরণের ঘটনায় ডাক্তারী পরীক্ষা, ডাক্তারের সার্টিফিকেট, রাসায়নিক পরীক্ষকের সার্টিফিকেট এবং ডাক্তার ও পরীক্ষকের সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পারিবারিক নির্যাতন ও বিরোধ নিষ্পত্তি :

পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণত পারিবারিক তথা নারী-পুরুষ সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে হেডম্যান-কার্বারী দ্বারা মীমাংসা করার বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। যদিও পারিবারিক নির্যাতনের সহিংস ঘটনাগুলো এখনও কমই প্রকাশ হয় কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যথাযথ সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যাতে ভূক্তভোগী নারীরা সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে নিরাপদ ও সুরক্ষিত অনুভব করেন। এজন্য, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং সার্ভিসের সুব্যবস্থা থাকা জরুরী যা' প্রকৃতপক্ষে ভূক্তভোগী নারী ও বিবাদী উভয়ের জন্যই প্রয়োজন। আর বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারন জনগন যেহেতু এখনও প্রচলিত প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এ ধরনের যে কোন ঘটনার ক্ষেত্রে সচরাচর কার্বারী বা হেডম্যানের দ্বারস্থ হন, তাই এই ব্যবস্থাকে আরো বেশী নারী বান্ধব ও সংবেদনশীল করার জন্য অধিকতর কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এর পাশাপাশি বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখে এ ধরণের মামলাগুলোকে শান্তিপূর্ণ বিরোধ মীমাংসার দৃষ্টি দিয়ে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন যাতে দুই পক্ষই মনে করে মামলার নিষ্পত্তিতে উভয়পক্ষের জয় নিশ্চিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংশ্লিষ্ট সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা ও ব্যক্তি :

যে কোন ধরণের নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনার শিকার হলে অথবা লক্ষনীয় হলে যে কোন সময় নিম্নোক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা নেয়া যাবে।

ব্লাস্টের মাধ্যমে অসহায় ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের আইন সহায়তা :

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) একটি অলাভজনক আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা, আর্থিক বা অন্য কোন অক্ষমতার কারণে ন্যায়বিচারের সুযোগ হতে নারী-পুরুষ যেন বঞ্চিত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা অঙ্গীকার নিয়ে এ সংস্থা ১৯৯৪ সাল থেকে দু:স্থ অসহায় মানুষদের বিনামূল্যে আইন সহায়তা প্রদান করে আসছে। সিএইচটিডিএফ, ইউএনডিপি সম্প্রতি আইন সহায়তা সংগঠন ব্লাস্টের মাধ্যমে অসহায় ও দুর্গম পার্বত্য

অঞ্চলের নারী ও শিশু যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে যারা বিচার পায়না তাদেরকে আইনগত সহায়তাসহ সার্বিক সহায়তা বাড়ানোর ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগের আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় ৭০ টি এ ধরণের সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনার মামলা পরিচালনা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে আইন সহায়তার পাশাপাশি অসহায় নারীদের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ যথা মামলার বাদীর ও স্বাক্ষীর পরিবহণ, জেলা শহরে রাত্রি যাপন, ডাক্তারী ও অন্যান্য পরীক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত খরচ বহন করা হবে। এছাড়া আইনী প্রক্রিয়াকে বেগবান করার জন্য নারীর প্রতি সহিংসতার কেইস মনিটরিং বা ফলো আপ এর বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া হবে। এ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের জন্য জুয়েল দেওয়ান (এডভোকেট), ব্লাস্ট এর সাথে ০১৫৫০৬০৮২৭৬ ও ০১৮৫৫৪৬৮৭২৫ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার :

সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের পেশাগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের পুলিশ রিফর্ম কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের তত্ত্বাবধানে ১লা জানুয়ারী ২০১২ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কোতোয়ালী থানা সংলগ্ন দেশের দ্বিতীয় ভিকটিম সাপোর্টি সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। এই উদ্যোগে বাংলাদেশ পুলিশের সাথে অংশীদার হিসাবে কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও যুক্ত রয়েছে। এই সেন্টারটি স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নরুপ:

- সামাজিক, সাংস্কৃতিক বাধা দূর করে নারী ও শিশুর প্রতি সংঘঠিত ঘটনা রিপোর্টিং এর সুযোগ নিশ্চিত করা;
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করা;
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের বার বার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা;
- সহিংসতার তথ্য সংরক্ষণ করা এবং প্রতিরোধের জন্য কার্যকর নীতি তৈরী করা

এই সেন্টারে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য ২৪ ঘন্টা ব্যাপী বিভিন্ন সেবা যথা: মামলা করার ক্ষেত্রে সহায়তা, আইনগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা, জরুরী চিকিৎসা সেবা, তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা, মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান, প্রয়োজনে সর্বোচ্চ পাঁচ দিন ও বিশেষ ক্ষেত্রে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভিকটিম সাপোর্টি সেন্টারে অবস্থান ইত্যাদি সুবিধাদি পাওয়া যাবে। যদিও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারটি রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত কিন্তু তিন পার্বত্য জেলার সকলে এখান থেকে সার্ভিস নিতে পারবেন। ভিকটিম সাপোর্টি সেন্টারটি নারী পুলিশের দ্বারা পরিচালিত সুতরাং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা হওয়ার সাথে সাথে সরাসরি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে এসে বা টেলিফোনে বিষয়টি অবহিত করার জন্য নিম্নলিখিত যে কোন নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ০১৭৩০৩৩৬১১৭, ০১৭৩০৩৩৬১১৮ এবং ০৩৫১-৬৩২৮২।

নিম্নে তিন পার্বত্য জেলার কতিপয় মানবাধিকার কর্মীর সাথে যোগাযোগের নম্বর দেয়া হল যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরলসভাবে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় বিভিন্ন সেবা ও দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন:রাঙ্গামাটি:

- কনিকা বড়ুয়া, সভাপতি জেলা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ- ০১৭২০৩৫৬০৭৯
- টুকু তালুকদার, জেলা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটি- ০১৭৩০০৮৬৩৩৬, ০১৫৫৮৮৮৩১২৭;
- এডভোকেট সুস্মিতা চাকমা, সভাপতি ডব্লিউ আর এন- ০১৭১৫৭৫২৮৯৮;

খাগড়াছড়ি :

- নমিতা চাকমা, চেয়ারপার্সন সিএইচটিপিএমএ ০১৫৫৬৫৭৭৫২৮;
- শেফালিকা ত্রিপুরা, ডব্লিউ আর এন/ নারীপক্ষ দুর্বার-০১৫৫৩৩৮৮১১০;
- শাপলা ত্রিপুরা, নারীপক্ষ দুর্বার ০১৫৫৩৪৯৩৪৭২

বান্দরবান :

- ডনাই প্রু নেলী, নারীপক্ষ দুর্বার/ ডব্লিউ আর এন- ০১৫৫৬৪৯৭১৯৮;
- উত্তরা ত্রিপুরা, ডব্লিউ আর এন ০১৮৪৩০৩২০৩৬;
- এডভোকেট মাধবী মার্মা ০১৫৫৬৭৪৩৭২৭;
- অং চাও মার্মা, বিএনকেএস- ০১৫৫৫০৪৫৯১৫

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা নির্মূলে আমাদের করণীয় :

বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় নারীদের পাশাপাশি শিশুরাও বিভিন্ন সহিংসতামূলক ঘটনার বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শিশু ধর্ষণের ক্ষেত্রে প্রায়শ: দেখা যায় শিশুটিকে একা অথবা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাওয়া হয়েলে । আদিবাসী নারীরা প্রায়শ: পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য ঘন ঘন বাইরে যায়;খাবার পানি সংগ্রহ করা বা জুম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য তাদেরকে বহু দূরের পথ পাড়ি দিতে হয় কিন্তু আশেপাশের জনবসতির বিস্তর পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নতুন পরিবেশের ফলে বর্তমানে তাদের অবাধ বিচরণ আর আগের মত সুরক্ষিত নেই। পার্বত্য অঞ্চলে যে সব উন্নয়ন সংগঠনসূহ কাজ করছে তাদের নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা এবং প্রত্যন্ত এলাকাসমূহ যাতে তাদের কার্য্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভূক্ত হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাধারনত যেসব এলাকায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনাসমূহ বেশী ঘটছে সেখানে স্থানীয় জনগণকে একত্রীত ও উদ্বুদ্ধ করে প্রতিবেশী ওয়াচ কমিটি গঠন করা যায় যারা এ ধরণের সহিংসতার ঘটনার প্রতি বিশেষ নজর দিবে ও শক্ত হাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। এজন্য সন্মিলিতভাবে, আমাদের সবাইয়ের জোড়ালো গলায় নারী ও শিশুর

প্রতি সহিংসতাকে 'না' বলা দরকার এবং যে কোন সহিংসতার ঘটনায় নির্লিপ্ত না থেকে জোরালো প্রতিবাদ করা জরুরীভাবে প্রয়োজন এবং সর্বোপরি দরকার এ ধরণের ঘটনার ভূক্তভোগীরা যেন্ন প্রয়োজনীয় সেবা ও ন্যায় বিচার দ্রুত পায়।

সূত্র :

Chittagong Hill Tracts Commission 2014, Study on Marginalisation and Impunity Violence Against Women and Girls in the Chittagong Hill Tracts.

CHTDF 2013, Final Report on Gender Assessment of Chittagong Hill Tracts, study conducted by MIDAS.

CHTDF 2013, Final Report on Household Survey in three hill districts in Chittagong Hill Tracts, study conducted by HDRC.

The significance of oral traditions, homeland, identity and culture for Chakma people

Arshi Dewan-Roy

For those living abroad, it is interesting that at times we are overtaken by inexplicable moods or feelings that our true place of belonging lies somehow somewhere else. Perhaps it may be a scent of a traditional food, a beautiful melody, a suddenly remembered voice of a relative, or a glimpse of landscape and it seems that in it we see or hear echoes of our true native "land."

Over the years, I learned a great deal about Chakma history and traditions from books, poetry, legends, folk songs, and stories I heard from my relatives. I was able to explore knowledge indigenous to living in the Chittagong Hill Tracts (CHT) and re-create understandings of relations between the people and the land. I connected with my homeland on its most basic level through our language since it revealed a wealth of information about the social relations in my community and gave me a sense of belonging. My parents told me stories of where we came from, how our past generations lived and how indigenous people are still struggling to survive in the mountainous region. Our social beliefs are often constructed and held in place by collective practices through our language and oral traditions that

embody our belief systems and reflect our worldviews. These practices occur within social contexts and they get reproduced in the stories we tell about our lives.Culture gives us our memory and our identity as people who are indigenous in CHT because it gives us joy and sense of belonging to lift us up.

The oral traditions of indigenous people reflect the traditional knowledge that is based in living on and with that land. We cannot disregard the complex nature of culture, social and political context, and most importantly the unique historical relationship indigenous people have with their land. Oral histories provide an insight into a society's past collective beliefs and they sometimes authenticate or provide an interpretation of actual events in history. Stories also give meaning and value to the places we call home. We feel there is an ideal sense of belonging, of community, of attunement with others with the same homeland.

Indigenous peoples claim their lands because they have occupied them since time immemorial. They are also groups that have been conquered by peoples racially, ethnically or culturally different from themselves. They have thus been subordinated by or incorporated in alien states which treat them as outsiders and as inferiors (Maybury-Lewis, 1997, 8).

"To deny human beings the sense of a homeland is to deny them a deep spot on Earth to anchor their roots" (Clifford, 2001, 475). According to James Clifford, the connection to the homeland and the notion of "indigeneity" is rooted in place. Losing one's homeland involves dislocation, disorientation, self-division and fragmentation of identity. What is also at stake is not only the actual displacement but our preferred psychic positioning, how we situate ourselves in the world. Many indigenous people have experienced displacement but they survived and maintained their identity by nurturing a powerful idea of a home they left behind or lost.

Similar to the experiences of others who left their homelands, I initially felt dislocated from my homeland, from the physical landscapes, from my childhood, and from my authentic self since I could no longer fully relate to the stories of our homeland. Even when I returned to the CHT to do my research, I saw many changes that disappointed me and made me recall more pleasant memories of how things used to be. To an extent, I got the feeling that some of the indigenous people do not have the same kind of close relation they once had with the land and they are more dispersed and disconnected from one another. This is not surprising since the indigenous people are still deeply impacted by the effects of the historical and current assaults on their natural environment and their traditional cultures. They experience ignorance and outright hostility to their existence, especially when their claims to territories and rights as the people who had a relationship with the land are denied (Simpson, 1997, 26).

The recent violent attacks on indigenous people such as burning down their houses, their businesses and livelihoods demonstrate that they are subjected to so much trauma and insecurity of living in their own lands. These sorts of incidents destroy trust amongst people and create fear in their hearts. They get so overwhelmed by thinking about how they are going to survive from day to day that they cannot live in peace. They are continuously fighting to provide a better life for their children so it is very disheartening to know that their lives are in danger at any given moment. Despite all these worries, they are also conscious of how their linguistic and cultural rights have been eroded due to their political marginalization.

Threats to culture are also threats to particular perspectives on life and loss of knowledge. The rapid

disappearance of some specific cultures is part of a larger global trend since human societies have always interacted and changed. Although a mixing of heritage characterizes the passage of time, indigenous people and their linguistic cultures are often threatened because they get overwhelmed by other dominant cultures. In Vanishing Voices: The extinction of World's Languages, the authors Nettle and Romaine (2000) explore themes such as globalization and displacement from traditional epistemologies as a major aspect of language loss. Knowledge of ancestral languages opens windows into past ways of knowing and being in the world.

My emotional connection to my homeland has to do with the land, the language and the people who call Chittagong Hill Tracts their home. For me, the notion of home is something so deeply wired in how I define myself that it seems to inform my every decision relating to my personal life. Especially as I grew older, I definitely became more influenced by my Chakma culture and drew inspiration from it to do my research projects. Since I consider myself to be both Canadian and Chakma from the CHT, I constantly have to balance both cultural sensibilities. We are definitely creatures of culture since we are constructed and shaped by it. Each culture has subliminal values, predispositions, and beliefs that inform our most intimate assumptions and perceptions about who we are. Whether we like it or not, our culture is inscribed in our psyche, and it gives form and focus to our mental and emotional lives (Amit, 1999, 7).

Indigenous languages have been preserved by the CHT communities so far allowing for the continuity of cultural transmission, and for the understanding of cultural systems. Observing various indigenous groups in the region, I remarked that languages are a way of reinforcing the identity of the

people who speak those languages. Identity is something owned apart from one's self by the larger community of practice; it is something that we continuously express through language.

Our indigenous language gives us a space away from the ruling power, and a place to develop and re-form our own identity. Although our language like all living languages has undergone some transformations, it is a relief to know that some community members concerned about language loss are still trying to preserve the fundamental elements of our Chakma linguistic culture. The rejuvenation of the mother language is especially necessary to reconnect those who have moved away from CHT and no longer use the language in a regular basis.

While interacting with my family and community members during fieldwork in CHT and in Canada, I realized that our native language embodies a value system about how we ought to live and relate to each other. Through stories, gossip, and conversation, I observed how the Chakma language maintains individual and group identity and transmits material, social, and cognitive culture from one generation to the next. The language enables us to give names to relations among kin, to roles and responsibilities among family members, and to ties with the broader clan group. Sometimes there are no English or Bengali terms for these complex relationships because the social and family life of Chakma people is very important and inclusive. I found that many of my family members also had connection to their distant relatives and assigned them specific familial terms based on who is related to whom. For me, I lose track of who is who very quickly because I do not get to see or hear about these relatives while living abroad for so many years. However, my relatives seem to automatically know how other community

members are related to each other through marriage and other familial relations. This creates a wonderful culture of a close knit village where everyone cares for one another and they are conscious of their responsibility to other community members. This is often demonstrated by the huge numbers of guests who attend marriage ceremonies, funerals or even death anniversaries to pay respects to the departed. What is surprising to me is that even younger members of the community are still being identified based on how they are related to their previous relatives and ancestors. It shows how family relations are so important for the Chakma people and they are never forgotten by the community members who knew them.

During my stay in the Chittagong Hill Tracts, I realized that many people in my community knew who I was even though I had never met them previously. They were obviously aware that I live abroad and many told me that they knew my parents very well. When they spoke about how they know my parents as friend or family relatives, it was apparent that they respected them very much and they were happy to meet me as a grown woman. Every time I visited Rangamati, I always felt that everyone was so welcoming and generous with their time to invite me to their houses and develop new friendships. They all stressed how glad they were that I spoke the Chakma language and that we were able to connect due to our shared language. My interactions with the community members made me realize how essential it was to maintain the Chakma language to preserve the bond I share with my people. Due to my early exposure to Chakma culture and process of language socialization, I maintained strong ties with my culture, native country, and oral stories in Chakma. Speaking my language reinforces who I am as a person, where I am from and enables me to connect with the history and people in my homeland.

Just like language, culture changes over time but Chakma people face increasing challenges in maintaining their language and culture. Although some community members actively practice the culture by wearing their traditional clothes and speaking the language, there are many transformations that have occurred over time. Culture is very dynamic and less tangible in terms of what is passed down to the next generation so it is necessary to examine the influencing forces that cause cultural change.

During my previous field trips for my research in Bangladesh, I examined how indigenous people in the CHT are struggling to maintain their native languages and what measures are being taken by community organizations to develop efforts of language revitalization. In formal and informal conversations with local community members, I explored the plight of the Chakma people in the Chittagong Hill Tracts who are struggling to restore their linguistic and cultural rights which have been eroded due to their political marginalization. I gained significant insights on the people in CHT about issues relating to language, identity, culture and education. My extensive exploration of that particular region in Bangladesh involved looking at the history of CHT and the history of conflict and lead to me coming to understand more clearly how Chakma language is marginalized.

I have observed that a few indigenous families abandoned their traditional way of life in order to integrate in the larger society by moving to urban areas where they were heavily influenced by Bengali language and culture. Some middle class families, conscious of social status, speak Bengali, disassociate from their indigenous roots and are discouraged from speaking their language in order to pursue higher education. This is a negative side effect of embracing formal schooling since there is this notion that one must go far away both

geographically and linguistically from one's community to become successful. The native languages are deliberately neglected because they are deemed to have low status. Some of the changes in the languages have also come about both due to changes in occupational patterns, social interaction with non-indigenous people and the influences of the national and international media. The skills required for reading and writing have practically disappeared since few people know how to use the ancient scripts and there is no support from the government for indigenous people to initiate their own educational system. Moreover, the community does not value of learning the scripts so the challenge is to create consciousness among the indigenous people about the need for language preservation.

Some local critics think that preserving indigenous languages is a lost cause and feel helplessness that government authorities will never support any educational programs for indigenous students. The middle class rejection of the language is also an important factor since the indigenous languages are perceived to have less currency or social capital. Although some others do not think that the Chakma language is in danger because they speak it every day and it is still spoken by the majority, it may become a threatened language because it is not taught in schools and there are fewer fluent speakers among the younger generation. For me, speaking the Chakma language provides a base to 'search for a collective' identity and also enables me to connect with the people in my homeland. I grew up in Canada most of my life but I felt very strongly about maintaining my language and connection with my homeland.

Indigenous languages are the basic media for the transmission of indigenous consciousness and they also provide distinctive perspectives on indigenous knowledge and

understandings of the world, which educational research often ignores (Battiste, 2000).Educational programs especially for indigenous students in schools are non-existent and it is highly unlikely that any educational materials will become available for them in mainstream public schools. Given the overall lack of resources in schools for minority students, indigenous community members have to find alternative models of education in and outside the school system to serve the current needs of indigenous children. It is encouraging to know that there were recent workshops in Rangamati to address issues of language preservation and how some language maintenance strategies can be useful for all the eleven or more indigenous communities in CHT.

I think it is very important for all the young students studying at the Moanoghar school to always value their traditional language whether they are from the Chakma, Marma, Tripura, Tanchangya, Mro, Lushai, Khumi, Chak, Khyang, Bawm or Pangkhua communities. We collectively identify ourselves as the “Jumma” people, the first peoples of the CHT. Although the government does not want to recognize us as indigenous people, we should be unified as indigenous people to protect and preserve our distinct culture, dress, music, food, language, tradition and much more. We can affirm our identity by wearing our traditional dress, singing our traditional songs, eating our native foods and take pride in our Jumma identity. Knowing where we come from, respecting our land and the languages of our ancestors will give us the strength to go forward with our education and uplift our communities.

When we speak our diverse languages, we need to be very conscious about how our languages are being transformed over time due to the encroachment of the dominant culture and language. As these languages are eroded, there is a real

danger of a breakdown of our relationships, culture, and the indigenous way of life. Keeping our language alive is therefore a matter of survival because our language embodies our worldviews and how we define ourselves.

References :

Amit, V. (1999). Constructing the field. London & New York: Routledge.

Battiste, M. (Ed.) (2000). Reclaiming indigenous voice and vision. Vancouver: UBC Press.

Clifford, J. (2001). Indigenous articulations. The Contemporary Pacific, 13(2), 468-490.

Maybury-Lewis, D. (1997). Indigenous peoples, ethnic groups, and the state. Boston.

Allyn and Bacon.

Nettle, D. & Romaine, S. (2000). Vanishing voices: The extinction of the world's

languages. New York: Oxford University Press.

Simpson, T. (1997). Indigenous heritage and self-determination. Copenhagen:

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

Land, Forest & Indigenous Peoples

Prof. Mong Shanoo Chowdhury

More than 1.6 billion people depend to varying degrees on forests for their livelihoods – not just for foods, but also for fuel, for livestock grazing areas and for medicine. At least 350 million people live inside or close to the dense forest, largely dependent on these areas for subsistence and income, while about 60 million indigenous peoples are almost wholly dependent on forests (World Bank 2006c)

But the forest cover is fast disappearing worldwide. The forest, land and other resources are severely threatened due to endemic poverty and overwhelming increase in population which still keeps growing at an alarming rate despite efforts to curve it down. The competition between different uses of land, conversion of forest land into non-forest uses etc. has resulted in the loss of forest cover and its areas including degradation of hills, loss of biodiversity and wild life habitat. The forest management system that has been traditionally in place to take care of the forest cover appears to be incapable or insufficient to improve the condition.

Indigenous people and their way of life are inextricably linked to the forest and everything in it – ranging from trees, plants, rivers, animals to the ever tempting mountains. Their social, economic, cultural, religious and spiritual activities have their roots in the Nature. The popular belief in the indigenous societies is that it is almost impossible to isolate

any single object or living thing in the forest such as particular plant, animal or mineral etc. from the symbolic place it occupies in the cosmology of the respective indigenous groups. These ideas found expression in indigenous mythologies and religious practices as well. The indigenous systems of social regulation, including the systems of production & exchange and management thereof are also reflective of these ideas. In fact, the forest for them is the very basis of their survival. But their traditional life styles are jolted in the face of commercial/industrial logging, mining, and over use of resources in their territories. Such a situation tends to lead to conflict which resulted in the disappearance of many indigenous communities from the face of this planet during the last thousands of years.

In the backdrop of such an intimate relationship between indigenous peoples and the forest and in spite of the fact that some lands may have been inhabited for generations by large number of indigenous people, it is found that the State, in many countries, happens to be the official owner of most forest areas. In such a situation, forestland shrinks narrowing the livelihood scopes of the indigenous peoples/forest dwellers or forest dependent people. On the other hand, the increased settlement and destruction of the forest for agricultural use or to cater to the needs of extraction industries tend to ruin the forest cover along with its bio-diversities. Of course, there are also examples of countries where the rights of indigenous peoples are recognized. In the Philippines for example, land issues in the indigenous areas are governed by the Indigenous Peoples' Rights Act. Unfortunately, such regulations are often contravened by powerful local interests. The Chittagong Hill Tracts (CHT) in Bangladesh is no exception.

One strategy which is increasingly being used by the forest people in order to defend their rights is to provide proof of

their residence in, and use of, forest areas. In the Democratic Republic of the Congo, indigenous peoples' groups and other forest dependent communities are participating in the mapping of their traditional territories. Such maps are likely to be vital tool in the future as indigenous peoples around the world struggle to gain formal recognition of their rights.

Indigenous peoples, by instinct, follow the rules of Nature. They harvest the resources in a sustainable manner and never take more from the forest than is needed. In most cases, indigenous knowledge has become key factors in the sound management of the forest resources with sustainable biodiversity. That is why there exists a strong correlation between areas of high biological diversity and the presence of indigenous peoples in those areas around the world. Bio-diversities in non-indigenous areas are visibly thin. It is also a remarkable feature of indigenous people to treat all things belonging to Nature with respect. We come across with indigenous communities who even perform 'hunting ceremonies' to animal spirits for allowing them to kill animals for food.

The relationship between indigenous people and land is a holistic and historic one. For them this relationship is much deeper and the spiritual connection of indigenous peoples to land is profound. It ties land to their very existence. The spiritual connection to land stands not only for the relationship with people but also with the entire environment which includes land, animal, plant, sky, water, weather, spirit etc. The land is also not just soil or rocks or minerals, but it is a whole environment that sustains and is sustained by people and culture. For Indigenous peoples the land is, therefore, the core of all spirituality. Indigenous laws and spirituality, in the indigenous societies, are thus inter-wined with the land, the people, creation, and it leads to the formation of their culture and social authority. Land to them is their mother, and this

perception is steeped deep in their culture. They are born into the responsibility to care for their land

To indigenous peoples land rights mean their rights to land either individually or collectively.They believe in collective ownership because the security and perpetuity of the control of natural resource base is more important to them and which they consider as more secure in the group ownership than the straight ownership of land itself. To them 'land is not only an asset with economic and financial value, but also a very important part of peoples' lives, worldviews and belief systems.' Most indigenous peoples living in forest areas depend on the natural resources of their lands to meet their subsistence needs. To that end lands are put to mixed uses by them viz. fishing, hunting, and shifting agriculture, the gathering of wild forest products and other activities. It can conveniently be regarded as the store-house of their livelihoods. In fact, the land owns indigenous peoples and every aspect of their lives is connected to it. Because of their special relationship with land, many indigenous communities cannot conceive of land to be a commodity for buying and selling, and an asset to make profit from. 'The use of certain areas or resources may be granted based on a number of criteria, such as belonging to a particular group, tribe or clan. Land use can be reciprocal as well involving neighboring groups or individuals. Land here is understood to include the environment of the areas which the people traditionally occupy.' So a kind of intimate bondage is rooted deep between land and indigenous peoples. Protection of land and indigenous rights to preserve their collective land is, therefore, integral to indigenous survival. The pattern of belief and traditions of indigenous peoples across the world is not the same as they are separate people in origin, history and way of life yet a special bond with the land is a common phenomenon among them.

Indigenous people, over many generations, have developed a holistic traditional scientific knowledge of the use of their lands, natural resources and environment.But the opportunities for them to participate fully in sustainable development practices on their lands has been limited due to discriminatory policies practiced by the dominant societies in the political, economic, social arena. In view of the relationship between the natural environment and its sustainable development and cultural, social, economic and physical well-being of indigenous people, it is essential to ensure that integrated efforts both at the national and international level are initiated to implement environmentally sound and sustainable development programs in order to accommodate, promote and strengthen the role of indigenous people and their communities in the policy making that affect their life.

Indigenous peoples worldwide are credited with the development of an intimate knowledge of various plants and their medicinal uses which plays a contributory role in the development of herbal medicine. In a recent study, the All India Coordinated Research Project credited indigenous communities with the knowledge of about 9,000 species of plants having medicinal use. Of these, 7,500 number of plants used for human healing and veterinary health care. 'Dental care products like datun, roots and condiments like turmeric used in cooking and ointments are also the discoveries of indigenous peoples, as are many fruit trees and vines.' Herbal cures for arthritis and night blindness as well owe their origins to indigenous knowledge. Forests are always known as the primary sources of all these herbal plants. In reality, the indigenous knowledge on the art of living and maintaining sound life-style is, by and large, sourced from the livelihood pursuits which are, for their most part, dependent inexorably on the use of both land and forest.

Indigenous people also contributed immensely to the development of agricultural practices e.g. rotational cropping, maintenance of fertility through alternating the grain cultivation or leaving the land fallow or using it for pasture. This has been possible due to intimate connection between land and the indigenous communities. The mankind is privileged to 'learn a lot from the beauty of indigenous social practices, their culture of sharing and respect for all, their deep humility and love for nature, and most of all their deep devotion to social equality and civic harmony.' However, the identity and existence of the indigenous peoples are often threatened as national governments are generally found indifferent or unwilling to take cognizance of the special relationship between land and the autochthons. The traditional tenure systems are not always recognized by governments, leaving indigenous forest people without formal rights to their territories. Indigenous peoples' ideas of territory are concerned not only with controlling of geographical area or using forest resources, but their notion of territory as well embodies fundamental aspect of culture and geography. This violates the UNDRIP as well as the ILO Convention 169 – both of which place a clear obligation on States to legally recognize, demarcate and effectively protect indigenous peoples' territories and natural resources.

From the perspective of political economy what one can observe is that the cultural characteristics of indigenous life that are directly related to ecology are currently the most marginalized and are threatened with assimilation or elimination. In other words and to be more specific, indigenous peoples are often the target of external economic domination by corporate houses and multinational businesses which seek to exploit indigenous homelands often with the help of the nation-state which indigenous peoples live

in. Therefore, the issues of diversity and economic exploitation of indigenous peoples are the key to any discussion of their traditions and ecology as many of them, their cosmologies, and ritual practices are actually in danger of being extinguished by absorption into mainstream societies and by destruction of indigenous homelands through resource extraction. More devastating is the direct grabbing of indigenous lands by mainstream people and different other state agencies which exacerbate the elimination or assimilation process of indigenous peoples by throwing them off their ancestral lands. Here the process of extinction of a group of people, generally marginal and disadvantaged, gets expedited through resource occupation.

If we look at the pattern of the human habitation around the world the common scenario that we come across with is that 'many indigenous and tribal peoples live in areas rich in living and non-living resources, including forests that contain abundant biodiversity, water, and minerals.' This is due to the fact that indigenous peoples always tend to preserve their lands. As a result, there are abundant resources (such as minerals, timber, and farmable lands) available on their lands that mainstream society is often tempted to access. Such a pressure can seriously threaten both the environment and the indigenous peoples who depend inseparably on land for their way of life. We also mentioned it out that historically the intense desire to grab such resources by ravenous non-indigenous society has resulted in the removal, decimation or extermination of many indigenous communities of this planet. As a matter of fact, the very survival and integrity of the world's remaining indigenous and tribal population today requires recognition of their rights to the resources found on their lands, and territories they live in and on which they depend for their economic, spiritual, cultural, and physical well-being.

It is therefore extremely important to ensure that the indigenous peoples and their environs are carefully protected and preserved. We have to take note of the fact that indigenous societies are built around the cornerstone of equality and respect for all forms of life, living or non-living. The indigenous values recognize the profound significance of interdependence between nature and human society. People are given respect and enjoy status based on their active contribution to social needs. 'For example, a priest could be treated with great respect during a religious ceremony; while a doctor revered during a medical consultation. But once such duties had been performed, the priest or doctor became equal to everyone else. The possession of highly valued skills or knowledge does not lead to a permanent prestigious status in many indigenous societies.' In other words, no individuals or groups are allowed to command a lordship over any kinds of life, nor enjoy hereditary rights. Who knows that some of the attributes of indigenous societies such as their simplicity, the love for Nature, and the absence of craving for the goods and wealth of others, their social harmony etc. would not have influenced Goutama Buddha profoundly, and eventually formed the ethical core of his teachings!

It is also equally important to take note of the fact that the national or mainstream languages of many countries have become enriched and developed following incorporation of many words from the vocabulary of indigenous languages which, in turn, owe their enrichment to Nature as the coinage of many indigenous words are linked to a number of elements found in the Nature.

The culture of indigenous and traditional communities is predominantly agrarian as it is shaped by environs dominated by crop growing in forest areas and mountain slopes following the seasonal rhythms of planting and harvesting. To the indigenous peoples, land, water and forests are not treated as natural resources to be exploited fundamentally for profit

making. These communities, as their ancestors did before them, 'understand that their well-being, their sense of identity and their children's future depend on the careful stewardship of the environment.'

Thus, indigenous communities are 'connected to the land in ways that can often be expressed only in spiritual terms. Respecting this worldview, and preserving the languages, music, artwork, folk tales and myths that express it, is critical for the survival of indigenous communities. This 'intangible heritage' also enriches the global community, providing inspiration and insights for realizing a more sustainable relationship between humankind and the environment.'

Traditionally, there is a harmonious and symbiotic relationship between indigenous peoples and the natural environment, and their societies are structured on an egalitarian and communitarian line, with their own systems of knowledge, self-governance and nationhood. They have governed, based on democratic processes, their ancestral territories and natural resources as a participatory community. They nurture a collective dependency on the natural resources found in their habitats and territories, a culture that owes its genesis to their historical and unique relationship with their ancestral territories. The territories which the indigenous peoples live in and the natural resources there have molded their unique cultures, life styles, traditions and belief systems. Indigenous societies are the repositories of vast indigenous knowledge on science and technologies. More importantly, the practice of an egalitarian life style largely and only prevails in these societies.

But unfortunately, the mainstream societies often fail to take cognizance of the inviolable relationship of indigenous culture and their way of life with land and forestand of the value and necessity to protect and preserve them. On the contrary, they consider these resources as objects to plunder and grabbing and the indigenous peoples as socially and

economically regressive communities. Such degrading attitude from the mainstream societies made indigenous peoples suffer historically from encroachment on and dispossession of their territories and resources by settlers, companies/ corporate business and other state agencies. They stand denied of their right to self-determination and instead continue to be governed by superimposed and inappropriate structures of governance which, in great measure, threaten their close association with land and forest, and ends up consequently in putting their way of life, livelihood and eventually their identities in great jeopardy.

References :

- Backgrounder on Situation of Adivasis in South India, October 2009. http://www.acpp.org/uappeals/background/Adivasis
- Conflict and Corollaries on Forest and Indigenous People: Experince from Bangladesh: Institute of Forestry Economics, University of Freiburg, Germany & Institute of Forestry and Environmental Sciences, University of Chittagong.
- Indigenous Knowledge in Natural Resource Management by the Hill People: A Case of the MRO Tribe in Bangladesh: Forests, Trees and Livelihoods, 2009, Vol. 19, © 2009 AB Academic Publishers – Printed in Great Britain.
- Mountain minorities and Indigenous Peoples: International Mountain Day, 11 Deember 2014. http://un.org/en/events/mountainday
- Al Gedicks, The New Resource Wars: Native and Environmental Struggles Against Multinational Corporations (Boston: South End Press, 1993).
- Donald A. Grinde and Bruce E. Johansen, Ecocide of North America: Environmental Destruction of Indian Lands and Peoples (Santa Fe, N. Mex.: Clear Light Publishers, 1995).
- Connection to Values and Beliefs of Aboriginals: www.supportincarers.snaicc
- Australian Indigenous Cultural Heritage: Australia.gov.au
- Meaning of land to Aboriginal people. http://www.creativespirits.info/aboriginalculture
- Indigenous Land Rights: en.wikipedia.org
- Land Rights for Indigenous Peoples, Globalization 101, A Project of SUNY LEVIN Institute: www.globalization101.org/land

An Introduction to the early history of the Tribal people of Chittagong Hill Tracts from 10th to 18th century

Sugata Chakma

The Chittagong Hill Tracts (CHT) that lies in the south-eastern part of Bangladesh is a unique land of scenic beauty. The CHT region is not only full of mountains and hills, rivers and forests or fountains but is also the homeland of many different tribes or indigenous peoples from time immemorial. At the time of colonial period, the British named them "Indigenous Hill men" of this land, especially when they passed Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900. The location of CHT region is to the east of the greater Chittagong region and the British colonial power extended their domain to this territory from Chittagong in 1761. This is the reason why they named it Chittagong Hill Tracts when they demarcated it for the first time as a new district in 1860. It's before in the Chakma Raja-s(kings) and the early Marma Bohmongs had also control over some adjoining parts in greater Chittagong region. Their domain prevailed in some parts of Chittagong district even in the 18th century until the East India Company occupied the then Rangunia (<*Raunya*<*Rannya*) area (now a upazila) of modern Chittagong district defeating the Chakmas in the war that took place from 1776 to 1787. So the early

history of Chittagong Hill Tracts and her indigenous peoples is naturally related to the history of Chittagong too.

So far we know the name of Chittagong was derived from an inscription that was inscribed on a pillar in 953 A.D. at the time of conquest of Chittagong by King Sula-tain Chandra (king of Dhannyawady) whose capital was at the then Wethali/ Vesali/ near Mrohong/ Mrauk-u area in modern Arakan state of Myanmar. In that inscription, the words were inscribed either in Arakanese or Burmese language - 'Chi-ta-gaung'. About its meaning the opinion of Arakanese renown late scholar San Tha Aung is that the correct spelling of the words would be ``Chitt-agaung". In Burmese and Arakanese language ``agaung/agong" means a head. In this case it was used probably in the sense of 'main' and 'Chitt' means a fort or an army. Chakmas who are one of the early inhabitants of this region still call that region 'Chadigang' in their language. Actually the recorded history of our neighboring Chittagong region is available from that time. King Sula-taing Chandra (the king belonging to Chandra dynasty in) Dinnyawady died in 957 when he was returning home from their southern region Sandaway after an expedition (against the Burmese or Mons?). When he was returning home by sea, his ship sank in the sea. Regarding his unnatural death, a quarrel broke out between his queen Chandradevi and Chief minister Wimala (Vimala) who ultimately fled to the north, at first to the upper Koladyne valley in Arakan and then, he went farther north (towards Tippera?). It created anarchy in Arakan. Taking its advantage, the Mro or Mru tribal people under their chief Amrathu/Amyathu coming from mountain area captured the capital Wethali and Amrathu became king of Arakan.

It is noteworthy that the Mro people were animist and used to perform cow-killing dance playing their traditional gourd-pipes accompanied with worship. But Mro chief

Amrathu was convinced to accept Buddhism and he married Chanradevi, the then queen of Dhannyawady. After his death his brother's son Phapru subsequently ascended on the throne of Wethali. In the meantime Sulataing Chandra's son Ngatu-mang who was born after his father's death and was brought up secretly in one Sak (Chakma) area, thus avoiding potential political vengeance. Ultimately after several years when he was grown up, he captured his father's throne with the help of Saks (Chakmas) and Rakhines. King Ngatumang shifted his capital from Wethali to a new place. He named his new capital Chambawat after the famous Indian old city Champavati in Magadha (Bihar, India). It seems that the dominance of Aryan language from Indo-Bangla region prevailed in royal family and court in Dhannyawady till his reign. It can be pointed out that now-a-days in the Chittagong-Arakan region among the various mongoloid tribes only the Chakmas (Doinaks/Doinets and Tanchangya-s) speak an Aryan language. They are Buddhist by religion and have their own alphabet which were used in writing their old religious book 'Aghor-tara' on palm leaves. Chakmas are called Sak or Thek by Burmese and Arakanese. According to their early historians, the word Sak was derived from the name of Sakya race in which Gautama Buddha, the founder of Buddhism, was born.

One of the famous seats of Buddhism was in the Bihar state of India. In about 1197 A.D. Turkish Muslims under the leadership of Bakthyar Khiljie occupied Bihar and destroyed Buddhist monasteries there. Many Buddhist monks being afraid, fled from Bihar to the east in the so-called Koki lands in search of shelter. With their presence, Buddhism flourished in these regions. Early Tibetan historical sources mentioned that one of the countries in Koki-lands was Chakma or Chagma. According to Tibetan historian Lama Taranatha (who was born

in 1575 and wrote a book about the early history of Buddhism in India in 1608) and Sumpa-mkan-po's work, in old days, King Atitavahana, (second son of King Bala Chandra whose suzerainty extended from Rakan-Munyan (Myanmar) to Kamaru (Kamrup in Assam, India) ruled Chakma/Tsakma. Taranatha's evidence proved that once Atitavahana the king of Chakmas reigned over Chittagong and Chittagong Hill Tracts including its surrounding areas. Taranatha's evidence also informs us that the Buddhist monks took shelter there (in Chakma) at the time of conquest of Bihar by the Muslims in 1197. From the beginning of the 13th century the occupation of most parts of Vanga (Bengal) from north to south increased day by day by the victorious Muslim Sultans. In 1340, Fakar Uddin Mubarak Shah (alias Fakra after occupying the throne of Sonargaon) captured Chittagong (probably from Arakanese). In the meantime, the Dev dynasty of Samatata (whose capital was based around Lalmai Hills and its surrounding areas in modern Comilla district) was totally ousted from that region. What happened to them and what kind of relationship existed between Patti-kera kings/rulers (of Samatata) and kings of Pugan (in Burma) is still subject to further study.

Mangthi/Minhti, the king of Arakan at whose time Arakan recovered her independence from king of Pugan (Burmese king) due to Chinese invasion that took place over Burma by the order of great Mongol Emperor Kublai Khan. King Mangthi's (Minhtis) reign according Arakanese chroniclers existed fabulously from 1282 to 1387. King Mangthi conquered Chittagong and according to Arakanese chroniclers, his suzerainty extended to the north up to the valley of the Brahmaputra River (in Bengal and Assam). After the conquests, King Mangthi took many skilled men such as

black smiths, potters, goldsmiths etc. from Chittagong and some other areas of Bengal to Arakan. At the reign of king Mangthi, the Doingnaks or Doinets - a branch of Sak (Chakma) people - were also taken away as prisoners of war and settled them there. Now Doingnak people live in Busidaung, Kyakthe, Lemro/Lemyo valley (near Mrohaung) and some other areas in Arakan. They still live there and call themselves "Changma/Hsangma" as Chakmas do also in Bangladesh. Moreover, they speak a dialect of Chakma language. At present, some of them also have settled in Paletwa in the Chin state of Myanmar.

In the past before the middle of 15th century, a certain Jhujharu-pha (or, Zhau-ru-pha?) as mentioned in Tripura chronicle Rajmala, coming from outside with a force, conquered Rangamatiya (modern Udaypur in Hill Tipperah or the Tripura State in India) and established there a new kingdom. Among the line of the Pha-dynasty in Tripura, Ranta–Pha (youngest son of king Dangor- pha) accepted the title of Manikya and became known as Ratna Manikya. His reign started from about 1458 A.D. It is said that the Riang, a prominent clan (Dopha/clan) of Kok-Borok speaking Tripura people were forced to go to the Karnafuly valley (of Rangamati district) from the Mayuni valley (in modern Dighinala upazila, Khagrachari district) due to heavy tax imposed on them by King Ratna Manikya. Later on, one of his descendants, King Dhanya Manikya took the title 'Tripurendra' (King of Tri-pur). He ruled over a large territory; his kingdom extended from Kachar to Ramu (an upazila in Cox's Bazar district). His famous southern general was called 'Choy-chag'. It seems that the word 'Choy' derived from Arakanese word 'Choi' meaning a soldier and 'Chag' had also same meaning as in the Arakanese word i.e. 'Sak'. Does this

mean that he was a Chakma? The name of the southern bank of the Karnafuly river and its surrounding areas in the greater Chittagong region was mentioned 'Chakhoma' in the map of Tripura medieval period. King Dhanya Manikya (1490-1514) had Brahmin priest and he established firmly Hinduism in his kingdom. He appointed most of his other generals from Hasam (present day Assam and surrounding regions). Especially he created a Borua post in his army. His southern army conquered Chittagong and Thanangchi (modern Thanchi upazila in Bandarban hill district) in about 1514. Following him his son Dev Manikya and grandson Bijay Manikya (1532-1563) also conquered Chittagong in different times. It is said that in the early days, there were civilized priests who belonged to the Dhmai race in the Tripura kingdom. Now, it only exists as a clan among the Chakmas, called 'Dhamei-gozha', although in some Tripura villages, some Tripuras also have the practice of selecting an honorable person among themselves as one of the Heads in their village, whom they usually call Dhamai. It is said that Kok-borok speaking Tripuras are traditionally worshipers of 14 gods and goddesses. Of whom, god Burasa's position is the highest. Their own priests are called 'Chantai' among themselves. At present, most of them are followers of 'Sanatan Dharma'.

In the first half of the 16th century Portuguese historian Joao-de-Barros drew a map entitled 'Descripcao de Reino de Bengala' which was edited by Baptista Lavanha and published at Lisbon in about 1550. In that map the territory between 23° and 25° north latitudes in CHT and its adjacent regions was demarcated by the name Chacomas after the name of the Chakma people. For this discovery, credit goes to a Chakma renowned scholar Ashok Kumar Dewan, former Director, Tribal Cultural Institute at Rangamati. In that map the

locations of 'Reino de TIPORA' and also 'Reino de BREMA LIMA' were inserted to the north of Chacomas. The Bawm, a Kuki-Chin speaking tribe in CHT and Mizoram (in India) were also known as "Laimi" people in old days. Even today, there is a Bawm village named "Lai-para" located to very near from the Bandarban town, stands as witness of this ancient nomenclature. At present Bawms have adopted Christianity. Their culture and language have a great similarity to those of the Lushai (Mizo) and Pangkhua people. Before converting to Christianity at the end of 19th century, these Kuki-Chin speaking people had many different rituals and worships among themselves. One of these practices, particularly among the Lushais and some other cognate tribes to them, was head-hunting as a sign of male virility and battle trophy.

In 1546, Burmese king Tabin Swehti seized Arakanese capital Mrauk-U. At that time the Chakma king (Sak king) descending from the north captured Ramu (Panwa-mro). A union named Chakmar-kul near Ramu Bazar in Cox's Bazar district still stands as witness to that event. It can be mentioned here that the Chak people who call themselves Asak/Achak and currently reside in Bandarban district near Ramu and Eidgarh, are also called "Sak" like the Chakmas by the Arakanese and Marmas.

In 1599, the Arakanese army (especially navy) and Toungoo army jointly attacked Burmese kingdom Hainthawaddy (Pegu) in lower Burma. According to Arakanese historian Chandamala Langkara (1931), Arakanese king Mang Razagri wrote a letter to the then Chakma King (whom they bestowed the title of Kaung-hla-pru) to participate in that expedition with an army of thirty thousand soldiers). It was the first time that a group of the Doingnak soldiers also participated in this expedition under him. The Portuguese

navy anchored from Chittagong port under Arakan also participated in that expedition. A portion of the Arakanese navy was used in the battle under the command of the Chakma king. The joint army of Arakan and Toungoo took successfully Pegu. King Nanda-Baying (the Burmese king of Pegu) was taken to Toungoo as prisoner. But a princess named Khinma-hnang/Sainda-naung and a prince Maung-Saw-Pyu were taken to Arakan as war booty. After the successful Pegu expedition, in a letter, the Arakanese king Mang Razagri (having the title of Sang-pru-Takhong or Owner of white elephant) wrote to Portuguese navy Philip de Brito Nicote that he was the highest and most powerful king of Arakan, Chacomas, Tripura and Bengal.

King Mang Razagri married the Pegu princess Khinma-hnang/Sainda-naung that he had earlier captured in the war. His brother-in-law Maung-Saw-Pyu was appointed governor of Chittagong in 1614. The Pegu soldiers known as Talaings were placed to the northern border areas of Chittagong. Many subjects were brought from Pegu to Arakan and many of them followed their Bohmong in greater Chittagong region. Their descendants are known now as Marma in CHT.

In the mid of 17th century there was unrest in the Tripura kingdom. Govinda Manikya, the king of Tripura being dethroned by his step-brother Chhatra Manikya, came to CHT and took shelter at Dighinala in about 1660 with his followers. He went to *Samwa-rajjya* (Chakma kingdom) via Suvolong (as mentioned in Tripura Chronicle Sri Rajmala). But after several years he became successful to recapture his throne again. At the time of his presence here, the great pond/tank (Dighi) at Boradam in Dighinala was excavated. During his reign, Vaishnavism spread in Tripura society.

In 1666, the great Mughal emperor of India, Aurangzeb, ordered the Bengal Subedar Saista Khan to conquer Chittagong from the hands of the Arakanese. The Portuguese residing in Chittagong port area left Arakanese side and joined with the Mughal force. The Mughal fleet carrying soldiers sailed on towards Chittagong and its powerful force quickly defeated the Arakanese both in land and sea and conquered Chittagong without much difficulty. They drove away the Arakanese force at first beyond the Karnafuly river and then successfully beyond the Sangu river a little later.

After three successions in the line of Pegu prince Maung-Saw-Pyu (as former governor of Chittagong), Bohmong Hario, the son of Angunya became governor of Chittagong. He met Arakanese king Chanda Wizia in 1710 and received the tittle of Bohmongri from him. Arakanese historian Chandamala Langkara wrote that in 1710, there was conflict between Arakanese and Chakmas. Though the Arakanese force could not fully defeat the Chakma king but ultimately he had to accept the suzerainty of Arakan.

It was known from the Mughal records preserved in the Islamabad (then Chittagong) that in 1711, Chakma Raja (King) was Chandan Khan. He took the title of 'Tein Khan' after the name of palace 'Tein'. He was elected to the throne by popular consent of the Jumias and later his succession was confirmed by the king of Arakan. After Chandan Khan, his brother Rattan Khan (1712) and then someone Kuttooah ruled CHT. In 1715, Chakma king Zalleel Khan made contact with the Muughals whom he gave 11 *maund* of cotton for permitting their *beparies* (businessmen) to trade with the hill men of CHT. But when in 1724, they demanded tax from him, he refused to do so. The then Mughal Dewan Kishan Chand subsequently attacked his kingdom with a force and destroyed

his *mokam* (house). He fled to Arakan where he died. In 1737, the Khyang, a tribe in the Chin Hills started raiding disurbing the northern villages of Arakan. A Muslim officer known as Kola-Kattya was sent against them by Arakan. He, with some of his followers from Ramu plundered Mrauk-U town inflicting total anarchy on the area and its inhabitants. In the ensuing conflicts, the Arakanese king died at Rakkhatong area. It is not known why Chakma king changed his position at that time. However, the Chakma king Shermust Khan was forced to accept the suzerainty of the Mughals in 1737. At that time his territory, according to early English records, extended to the north up to the Feni river, to the south bordering the Sangu river, to the west up to Nizampur road in Chittagong district and to the east up to Kuki-Rajjya (Mizoram in India). It is known from the district record of Chittagong that at that time the Khyangs who call themselves 'Hyo' or 'Sho'also entered into Chittagong district.

On 5th January 1761, Mr. Harry Varelst on behalf of the East India Company took the formal charge from Nabab Reza Khan at Chittagong. After one and a half decade, the British officers took a policy to increase taxes and revenues. This led to a rebellion and the ensuing conflicts prevailed from 1776 to 1785 between the Chakmas and the East India Company officers. Amidst the negotiation between the two parties, the Chakma king Sher Daulat Khan died. Peace was finally restored in the region at the time of his son Chakma king Jan Bux Khan in 1787. The British took a somewhat lenient policy toward him. In 1797, when the British officer Francis Buchanan visited Chittagong Hill Tracts, he made the following observations; "the greater part (Rangunia and its adjacent areas) however of that fertile district was seized on by the native officers during the dispute, which about 14 years ago

took place between the Resident at Chittagong and father (Jan Bux Khan) of Taubboka (Chakma King Tabbar Khan) although Government found their agent to have been in the wrong,".

At the time of his tour, Buchanan met with Bohmong Kaung-la-pru at Sualok where the Marma villagers built their village in about 1757. Actually there is a rivulet with same name in Bandarban district. From his travelogue, we know that that a large band of Bonjoogies (Bawms?) entered into Rangunia (in 1794?) through the hills between Sualok and Kapty (Kaptai). He also visited Rangamattya (Rangamati) and observed two Bungalow-houses of the king Tabbar Khan and his brother Jabbar Khan.

References :

Campose, J.J.A., (1919), *History of Portuguese in Bengal*, Calcutta.

Chakma, Sugata, (1983), *Chakma Parichiti* (An Introduction of the Chakma people. In Bengali), Rangamti :Borgang Publications

Chatterji, Suniti Kumar, (1974), *Kirata Jana Kirti,* 2nd edn., Calcutta

Choudhury, Abdul Hoque, (1989), *Chittagong-Arakan* (In Bengali), Chittagong.

Cotton, H.J.S., (1880), *Memorandum on the Revenue history of Chittagong*, Calcutta.

Dewan, Biraj Mohan, (1969), *Chakma Jatir Eitibritto* (History of Chakma race. In Bengali), Rangamat : Saroj Art Press.

Gosh, Satish Chandra, (1909), *Chakma Jatir Itihas* (History of Chakma people. In Bengali), Calcutta.

Hutchinson, R.H.S., (1909), *Chittagong Hill Tracts District gazetteer*.

Langkara, Chandamala, (1931), *Dhannyawady Razawang Saikyom* (History of Dhannyawady/Arakan. In Burmese), Mandalay.

Lama , Chimpa and Alaka Chattapadhyaya, tr., (1980), *Taranath's History of Buddhism in India*, Calcutta.

Lewin, T.H., (1869), *The Hill Tracts of Chittagong and Dwellers Therein,* Calcutta.

Phayre, A. P., (1841), 'An Account of Araccan' in *History of Burma*, No.117, vol. X, Calcutta.

Roy, Raja Bhuvan Mohan, (1919), *History of Chakma Raj Family*.

Saigal, Omesh, (1978): *TRIPURA*, Delhi.

Sarma, Ramani Mohan, (1980), 'The Coinage of Tripura' in Lalanji Gopal (ed.) *The Numistic Society of India*.

Sen, Kaliprasanna (ed), (1926-36), *Sri Rajamala* (History of the kings of Tripura. In Bengali).

Schendal, Willem van (ed.), (1992), *Francis Buchanon in Southeast Bengal (1798)*, Dhaka: University Press Limited.

Serajuddin, A.M., (1971), 'The Rajas of the Chittagong Hill Tracts and their relations with the Mughuls and the East India Company in the eighteenth century', *Journal of the Pakistan Historical Society*, Vol XIX, Part-I, Karachi.

Women Negotiating Change: the structure and transformation of gendered violence in Bangladesh

Meghna Guhathakurta

Introduction :

The mid-eighties witnessed a spate of literature on violence against women in Bangladesh (Islam and Begum, 1985: Guhathakurta, 1985; Jahangir and Khan, 1987). This occurred in the backdrop of an increase in the reportage of gender-based violence in the media, which caused subsequent response from the women's movement as well as from political circles. The reason for this sudden media interest was due to policies pursued by the then autocratic regime of General Ershad which had restricted political activity and issued strict censorship of the news media to prevent political criticism or dissent (Guhathakurta, 1985). Thus media attention was directed to gender-based violence as a way to critique the government without being outrightly partisan. This was the context, which also shaped the discourse of gender-based violence.

The mainstream discourse approached the question of violence from a functional viewpoint. Since the problem of violence was treated as an issue and not as a trend, causes of gender-based violence were perceived and analyzed in an isolated manner. Economic causes were the most cited by the

establishment and mainstream political parties while deterioration of law and order and the degradation of moral values were used as arguments by the opposition (Guhathakurta, 1985). Only a few women's group chose to relate the incidence of violence to structures of patriarchy and class (Jahangir and Khan, 1987: i-iv). Structures of patriarchy and patriarchal ideology were seen to create conditions of male privilege especially within social institutions such as the family whereas class equality in a peripheral capitalist system was seen to marginalize women in the more specific politics of gender.

In the context of present day realities however, it has become imperative to understand that some of the recent trends of violence emerge not out of static social structures, but in the way that these structures themselves get constructed or reconstructed in the battlefield of politics, more specifically feminist politics. As someone who has taken active part in helping to generate a feminist discourse of gendered violence in Bangladesh from the eighties onwards and contributing to its polemics in theory and praxis, my approach has been to focus on the structured nature of violence in society to distinguish it from the statist or mainstream discourse of looking at acts of violence as 'incident' or 'issue'. But as will be explained below I do not consider these structures in any deterministic sense of cause and effect but as norms, values and processes underlying gender relations, which may be negotiated variously by victims and perpetrators. In this paper I look more specifically at parameters of gendered violence as experienced by women at the margins of society, for example in the struggle of the indigenous women's resistance movement in the Chittagong Hill Tracts. By exploring the case of the abduction and murder of Kalpana Chakma, Organizing Secretary of the Hill Women's

Federation and by analyzing the response of the mainstream women's movement to the incident I wish to foreground the contesting notions of violence and victimization upheld by the state and the women's movement in Bangladesh.

Conceptual framework: victims and victimization :

In Bangladesh, the feminist debate on gender-based violence has shifted somewhat from the eighties, although the statist and mainstream discourse remains pretty much the same. As far as the dominant mainstream discourse goes it is only the physical manifestation of gender violence that receives prime concern, i.e. the rapes, the murders, or the kidnapping. This perspective only succeeds in disassociating the results or immediate factors from the deep-seated causes found in the social structures. The Bangladesh feminist debate in the eighties therefore focused on foregrounding the structures underlying gender-based violence, structures such as patriarchy and class. However with the evolution of post-structuralism it became apparent that such structures needed to be qualified or else they tended to become over deterministic as was evident in the agendas of many non-governmental organizations (NGOs) working with women for whom patriarchy or class became standard bywords for women's oppression. This has been the trend for many organizations till this date. To help overcome this tendency to objectification, I outline below a conceptual framework, to help impart a better feminist understanding of gender-based violence in the Bangladesh context.

Norms and values underlying and affecting gender relations such as 'patriarchy' or 'tradition' are constructed and reconstructed in ways which women and men enact them in their individual lives, institutions and cultural and social processes. In this sense women and men are not merely

passive recipients or 'victims' of tradition but actors/agents who can choose (consciously and subconsciously), either to maintain, reaffirm and strengthen or to resist, challenge and creatively reshape structures of existing gender relations. For example while men may act to strengthen their positions of power and privilege, women may try to contest and challenge them in various ways.

However women and men are actors with very different powers as well as interests in such processes! Gender constructions of men as superior and dominant categories and women as inferior and subordinate, are not only vesting in men power over women, but also infuse interests to sustain these divisions. This may take the form of violence against women, but more often it operates in more subtle ways as an aspect of institutional ideologies, rules and practices, for example inheritance laws, which give male dominance in terms of rights and resources. But these notions and practices of male dominance may be challenged, negotiated and even transformed by women. It is in this latter sense that an analysis of the processes of victimization may also generate an understanding about how a woman may negotiate her subject position as victim altogether. One may thereon evaluate the advantages and/or limitations of such responses from the perspective of the women's movement.

I now attempt to look at this politics by (a) analysing the processes through which women have been victimized i.e. processes of victimization and (b) understanding those processes through which a woman or the woman's movement may negotiate the subject position of a victim at the same time that she/they may resist or reject the role of the victim altogether. As mentioned before by exploring the case of the abduction and subsequent disappearance of Kalpana Chakma, I will engage gendered violence as experienced by women at

the margins of society, in the struggle of the indigenous women's resistance movement in the Chittagong Hill Tracts.

The Chittagong Hill Tracts : the marginalisation of ethnic groups

The Chittagong Hill Tracts (CHT), situated to the south west of the country, occupies a physical area of 5, 093 sq. miles, constituting ten per cent of the total land area of Bangladesh. The region comprises three districts: Rangamati, Khagrachari and Banderban, and its hilly topography with its innumerable ravines, cliffs interspersed with fast flowing mountain streams and rivers and dense vegetation is in complete contrast to most other districts of Bangladesh, which consist mainly of flat deltaic alluvial lands. At the time of the incorporation of the Hills of Chittagong into the British administration in 1860, the region was inhabited by thirteen ethnic groups. These are: Chakmas, Marma, Tripura, Tanchangya, Riang, Murang, Lushai, Bawm and Pankhos, Kukis, Chak, Khumi, Mro and Kheyang. Together these groups identify themselves as *Jumma* (a Chakma word) which stems from the fact that they traditionally practice '*jum'* meaning swidden cultivation.

The predicament of the Jumma people began with the building of a hydro-electric dam in the early 1960s, which flooded 1, 036 sq. km. of land, submerged 40 km. of their best agricultural lands and displaced about 100, 000 Jummas from their ancestral lands. In 1964, about 40,000 displaced Chakmas and other indigenous people were forced to migrate into India and were settled in the state of Arunachal Pradesh. After the liberation of Bangladesh in 1971 from Pakistani rule, the founder of the Jana Samhiti Samiti (JSS) Manabendra Narayan Larma was elected to the Bangladesh Parliament from the CHT in the first general election held in Bangladesh.

As an elected member of the Parliament, he demanded constitutional safeguards and rights for the Jumma people, but his demand was ignored. Following this effort, he led a Jumma delegation and submitted a written memorandum to Sheikh Mujibur Rahman, the then Prime Minister, with a four-point charter of demands for regional autonomy for the CHT. But not only was this proposal rejected outright, the Jumma leaders were charged with secession and for being anti-Bangladesh. After the assassination of the Sheikh Mujibur Rahman, the military General who came to power President Ziaur Rahman, considered the CHT to be a security zone under threat of insurgency and further militarized the situation. The JSS was compelled to organise armed resistance group called the "Shanti Bahini". From there, the situation rapidly turned into that of counter-insurgency operations under the administration of President Ziaur Rahman's regime. From then on, the history of the CHT has been a series of killings, violation of human rights and displacements of people from their homes and land. Counterinsurgency operations in the CHT have produced fresh waves of refugees into India, most notably in 1979, 1981, 1984 and 1986 (Timm, 1992). The eviction and abolition of villages for security and development reasons and military operations have displaced thousands of villagers. Between 1980 and 1993, the Bangladesh army and the Bengali settlers have committed eleven massacres and innumerable plunders and destruction of villages in the CHT. In the early seventies, the whole CHT was brought under military control by undermining the local civil administration. The Chittagong Hill Tracts development Board CHTDB in 1976 deeply strengthened military occupation and the development of military infrastructure in the CHT. (Mohsin, 1997)

This has spanned over three decades until an accord reached between the Jana Samhiti Samiti (JSS) (The armed

wing) and the Bangladesh Government was reached in 1997. But three decades of forced evictions, terrorization as part of 'counter insurgency techniques' and planned settlements of plainland Bengalis in the CHT have caused havoc in the life of people who refused to flee to India. After the accord many refugees have returned to find their land taken away and occupied by Bengali settlers and military. They now join the ranks of the internally displaced. According to the Global IDP Database set up by the Norwegian Refugee Council, (NRC) an estimated 50,000 to 100,000 people were internally displaced during the conflict and around 75,000 fled to the neighbouring state of India as refugees. (NRC, Dec. 2003)

The Kalpana Chakma Case : the background

It has been mentioned above that military oppression also resulted in armed resistance in the guise of the Shanti Bahini. This in turn had led to counter-insurgency strategies adopted by the large military presence in the area The hill people under the banner of organisations such as the Pahari Gono Parishad (PGP), the Pahari Chattro Parishad (PCP) and the Hill Women's Federation (HWF) have been demanding the right to self-determination for the Hill people under the rubric of 'Jumma nationalism'.

It cannot be denied that in a militarized situation, Jumma women constitute the most vulnerable section of the population. Among the many crimes committed against the people of the CHT, sexual violence such as rape, molestation, harassment was especially prevalent. In 1990 information from one refugee camp in India indicated that 'one in every ten of the total female population had been a victim of rape of Jumma women between 1991 and 1993 in the CHT were by security forces.' (HWF, 1995) Of these rape allegations, over 40 per cent of the victims were women under 18. These

numbers are however denied by the military authorities.

Aside from these outward manifestations of violence, women were affected in a number of ways during military rule, not least in the daily activities of household chores, procuring food and looking after children, all in an environment that became hostile to their very existence. (Guhathakurta, 2001). Such instances of rape and harassment of women by security personnel was the single most important factor behind the formation of the Hill Women's Federation which emerged in the 1980s to become the most organized form of women's resistance in the area. The following case of abduction and alleged murder of Kalpana Chakma, the organizing secretary of this organization tells us about the extent and depth of agency, which the members of this organization attained in their negotiation with the Bangladesh state.

The Incident

I will try to reconstruct the incident as it happened that night by using information collected by a human rights investigation team sent by the legal aid organization Ain O Salish Kendra. Part of this finding was also published in a national daily Bhorer Kagoj, which gave good coverage to the issue at that time. (see Akhter, 1996). The team interviewed Kalpana's family (her brothers and mother) and other neighbours in the vicinity.

After the midnight of 11th June 1996, on the eve of the elections of June 12, Kalpana Chakma (23), central Organising Secretary of Hill Women's Federation was abducted from her home in New Laillaghona village of Baghaichari Thana of the Chittagong Hill Tracts. Kalpana was a first year graduate student of Baghaichari College and at the same time a conscious, vocal and hardworking activist who fulfilled her

role as organising secretary of Hill Women's Federation with commitment and resolve. She and her two brothers lived together with her mother and sister-in-law in the not-too-well-off neighbourhood of New Laillaghona village. Her brothers Kalindikumar alias Kalicharan Chakma (32) and Lalbihari Chakma alias Khudiram (26) were farmers who could not afford an education for themselves, but who wanted their only sister to get one no matter how hard up they were -- offer some more discussion to highlight this as an incredible politics of resistance that defies class, gender, caste and offer some comments on how such commitments are made possible. This was what happened on the night of 11th June according to the eyewitness account of Kalpana's two brothers (Akhter, 1996).

Kalpana's household was fast asleep, when a host of men encircled the house and started calling out. The family awoke, and when the door was not opened promptly, they broke open the bolt made up of bamboo. The men gathered everyone into the drawing room and forbade them to put the light on. They started to ask names and on calling on Kalpana's younger brother Lalbihari, They dragged him outside. They announced that he had to be taken to the 'Boss (Sir)'. While they were repeatedly flashing a torch on his face in order to identify him, Lalbihari (Khudiram), claimed he recognised some of the men, as the torch-light was not falling directly on his eyes. The men he recognised was Lt. Ferdous (Kojoichari Camp Commander, 17 East Bengal regiment) wearing an army vest, Village Defense Party (VDP) Platoon Commander Nurul Huq and VDP Saleh Ahmed.

Lt. Ferdous then ordered Khudiram to be taken to the water's edge (a stream ran close by) about 150 yards from Kalpana's house. After being taken there, he was blindfolded and his hand tied by the men. After 10 to 15 minutes later,

Kalpana and her elder brother Kalicharan was brought to the same place. Kalicharan's eyes were blindfolded at that time. Kalpana was holding his hand. They were taken further west towards a water reservoir. They could guess where they were -- Khudiram was told to go knee deep into the water. Someone caught hold of his hand and another person ordered to shoot. On hearing this, Khudiram, released his bound hand, and jumped into the water. Although guns were fired, Khudiram, managed to escape. When Kalicharan heard the shot, he thought his brother dead, so he left Kalpana and made a dash for his life. Another shot was fired, and he could hear Kalpana crying out: Dada! Dada! (Brother!). Khudiram did not return home that night thinking it unsafe. when he returned in the morning he went with the Union Parishod Chairperson to the Ugalchari Army Camp nearby to look for Kalpana. Lt. Ferdous chased them away with threatening words. A search party from the village started to look for Kalpana but they found in the lake Khudiram's lungi and an ammunition pouch, which Kalicharan claimed he deposited at the thana. The Than Nirbahi Officer (TNO) later denied this.

On informing the Thana Nirbahi Officer (TNO), he took a verbal statement from Kalicharan, the eldest brother. Although initially there was a misconception that this also constituted a FIR, this was later denied by the TNO. Kalicharan's FIR was taken by the officer-in-charge of the thana (police station) (Memorandum, 1996). However in the verbal statement given by Kalicharan, the mention of Lt. Ferdousi and recognition of him and others by Khudiram was not mentioned, perhaps for the reason that it was Khudiram and not Kalicharan who recognised him, and at the time of taking the statement, Khudiram had gone with the UP Chairperson to the Army Camp in search of Kalpana! The ammunition pouch which Kalicharan claimed he deposited

with the TNO was also not found. The human rights team, which investigated the incident noted the complicity of the local police with the military administration, which from the very beginning was bent on denying the incident.

A protest strike was staged by the joint coalition of PCP, PGP and HWF in the Hill Tracts on 27th June 1996. During the strike, clashes took place between the law enforcing agencies and the protesters, where a school student Rupam Chakma was shot dead and his body taken away. Three more persons, Monotosh Chakma, Sukesh Chakma and Somor Bijoy Chakma could not be traced (Memorandum, 1996).

In the aftermath of the crisis, many allegations and counter allegations were made as to who or what caused this incident to take place. The military and their collaborative organisations tried to link up the incident with pre-poll violence trying to portray the role of the PCP, PGP and HWF as anti-people, anti-democratic, before, during and after the elections. They denied all charges of being involved and claimed that Kalpana's disappearance was staged by her own people. The Bangladesh Manobodhikar Commission (a human rights organization with alleged links with the Government) claimed that Kalpana Chakma had been found in a village in Tripura, India. The truth of such reports was not proven by subsequent investigation. Another independent human rights group based in Chittagong said that the incident was not an isolated one but part of the continuous communal tension in the Hill Tracts. They had testimony that the military was involved in the abduction of Kalpana Chakma. My own personal interviews with Kalpana Chakma's friends and colleagues corroborated the view that Kalpana was believed to be a target of the military because she was such a good organizer and a very outspoken person. In fact her friends related an incident, which had occurred in 19th March of the

same year where this very same Lt. Ferdous was allegedly involved in carrying out an army raid, burning down seven houses in a village in the vicinity of Kalpana's house. This operation was purportedly to track down members of the armed "Shanti Bahini". During the raid, Kalpana Chakma had got into a heated argument with the Lieutenant, and her friends seem to think that she had therefore been targeted for revenge. (Ref. personal communication with Kabita Chakma, then President of HWF).

Kalpana Chakma and resistance politics in the Hills

Systematic and pervasive military presence in the Hill Tracts had made Pahari (hill) women more conscious about their rights. This is borne out by vivid statements made by Kalpana Chakma in her diary, which was recovered by some journalists from her home after her disappearance. Parts of this diary were serially published in the Bengali Daily Bhorer Kagoj and much later the Hill Women's federation brought it out along with writings about her in the anthology "Kalpana Chakma's Diary (2001). Kalpana, was determined to fight out the dual struggle against politico-military and male oppression in her homeland.

Kalpana introduces her 'daily notebook' by the following lines: "Life means struggle and here are some important notes of a life full of struggle." In depicting the life of a woman in the CHT, she writes, "On the one hand, the woman faces the steam roller of rape, torture, sexual harassment, humiliation and conditions of helplessness inflicted by the military and Bengalis, on the other hand she faces the curse of social and sexual discrimination and a restricted lifestyle (from her own people – author's explanation). However, Kalpana's under-standing of oppression embraces all women of Bangladesh, ethnic and Bengali. She writes elsewhere "I think that the

women of my country are the most oppressed." In expressing her yearnings for freedom from oppression she uses a beautiful metaphor. "When a caged bird wants to be free, does it mean that she wants freedom for herself alone? Does it also mean that one must necessarily imprison those who are already free? I think it is natural to expect the caged bird to be angry at those who imprisoned her. But if she understands that she has been imprisoned and that the cage is not her rightful place, then she has every right to claim the freedom of the skies!" (Chakma, 2001).

We see from the above quotes that Kalpana's reading of the woman question is essentially a feminist one. Her feminism allows her to look at the woman question in terms of the Bengali-Pahari domination as well as in terms of sexual politics within her own community. This is quite striking and unique since in most nationalist or ethnic movements, we see the gender question becoming a subtext to the larger 'national' one. Thus in interviewing women in resistance politics it will be usual to find them speaking of the gendered violence across the racial or ethnic boundaries (for example Bengali men raping Chakma women rather than Chakma women being raped by men of their own community). Kalpana's views were not only extraordinary but as we shall see in a later section succeeded in generating a debate within her own student's movement with regard to the woman question. But Kalpana's feminism also differs sharply from that of her middle-class Bengali sisters because unlike them her life struggle pitches her to confront and engage military and racial domination in a way that is not easily comprehensible to the privileged Bengali.

That Kalpana Chakma was a frontline activist in the struggle for self-determination of the Pahari people is clear from her writing. In paying respect to the leader of their

struggle, the Late Manabendra Narayan Larma, she writes as part of her speech on the occasion of his death anniversary, "….. 12 years has passed by. Every year, regardless of the 'combing eyes of the olive brigade' (the army), a memorial service is held, furtively, beneath a plum tree on a hilltop where thousands of students and public flock together to pay their respect. His name is celebrated from the hillsides to the jail… A leader dies, but new leadership emerges at the need of the hour. The struggle continues. It becomes more intense. Very inevitably so." (Chakma, 2001).

On another occasion which commemorated the martyrs of the *Naniarchar* massacre (November, 1993), Kalpana stresses the need for the youth to shake off the inertia which has descended on them. Again, we see that her call is all embracive: she calls upon all students and she situates the students movement in the larger context of the historical struggles of '52, '69, '71 and '90. She writes: "A section of our youth are without direction. In losing their creative force they are being turned into pawns in the hands of the Army and the *Zilla Parishad*. But we are part of the student's movement who had created '52, '69, '71. And '90!" This is an interesting claim to make especially since the movements mentioned above showed no signs of incorporating the demands of the hill people in their nationalist agendas (Mohsin, 1996). But if one looks at the time when this statement was made, 17th November 1995, then one can perhaps understand its significance. The country was at that time on the verge of a civil disobedience movement led by the main opposition parties in their demand for a caretaker government as an assurance of a free and fair election. The Pahari Organisations too therefore voiced their preference for the democratic process, which they saw as being part of the movements of '52, '68, '71 and '90. We thus see that despite the many

allegations of treason or secession hurled at them, these Pahari organisations had expressed their partiality for a democratic struggle for self-determination within the confines of Bangladesh.

But for Kalpana Chakma, democracy does not merely mean free and fair elections. It means participation in the political process and more specifically participation as a Chakma and a woman. She therefore stridently voices a critique of her own student's movement, which remain male-dominated. She writes: "Despite the fact that women constitute half the population, they are not taken seriously in any movement for social change. As an example one can point out that the numerous demands voiced during the current movement, even the ten point demand of *the Chhatro Shongram Parishad* does not speak specifically of problems faced by the woman! Many conscious men seem to think that such problems are not important enough to be dealt with at this hour. Therefore the issue of woman's emancipation have remained neglected in agendas for class struggle and political change (Chakma, 2001). Kalpana's observations are not the first of their kind in the history of social change nor is it likely to be the last. One is rather uncannily reminded of words which the brave freedom fighter of Chittagong. Pritilata Wadeddar wrote in her last statement to the world before she died in combat against the British, "The discrimination between men and women in the struggle for our liberation had wounded me. If my brothers can go to war to liberate our motherland, then why can our sisters not do so?" (Dastidar, 1956:114). Kalpana and her sisters had progressed one step further. They no longer have to fight to get included in the struggle, but they still have to struggle to get their agenda incorporated.

Kalpana's tragic disappearance is still shrouded in mystery as the enquiry commission report has still to see the daylight,

even in a situation where the government has entered into a peace agreement with the JSS the main armed wing of Hill people fighting for 'Jummaland'. Every 12th of June is celebrated by the Hill Women's Federation as the Kalapna Apaharan Dibosh (Kalpana's Abduction Day) and demands are repetitively made for transparency of the justice system. But in successive regime we have seen that the military enjoys complete impunity and cases such as Kalpanas are not investigated properly or lack transparency. If such a situation persists then the Hill people would continue to feel angry and that would not bode well for the peace of the region.

The Movement for Kalpana: the role of civil society organizations

The movement which campaigned to bring the issue of Kalpana Chakma's abduction into the national and international arena was spearheaded primarily by the coalition of Pahari organisations: the Hill Women's Federation, Pahari Chattra Parishad and Pahari Gono Parishad but also involved sympathisers from the left, human rights and women rights activists with whom the former group worked closely with at least in Dhaka. Mention has been made of the resistance politics of the Pahari (Hill) Organisations especially the Hill Women's Federation of which Kalpana Chakma was Organisation Secretary.

Civil society organisations have been flourishing in Bangladesh particularly after the collapse of the autocratic Ershad regime. Most of these organisations are development oriented, though in the last few years some of them have been increasingly concerned with human rights violations and giving legal aid to vulnerable sections of the population. However, uptill the signing of the treaty between the Bangladesh state and the rebel Shanti Bahini, only a small

proportion of these organisations have been concerned with the Hill Tracts.

The CHT issue has remained a delicate and touchy one for the Bengali middle-class, even after the polity of Bangladesh had attained a formal democratic character. Human rights violations have remained the concern of a handful of lawyers, academics and human rights activists and left party workers and students. Many Pahari activists complain that civil society organisations are reluctant to take up frontline activity. The National Committee for the Protection of Fundamental Rights was formed in 1991 as an advocacy organisation for both Pahari and Bengali scholars and activists.

Recently however, the Hill Tracts issue has also been receiving the attention of the women's movement as was reflected in the Kalpana Chakma case. The women's movement too had been and still is largely development oriented and the issue of women's rights as human rights proliferated among organisations as an instrument of development (Guhathakurta, 1996). Women's organisations registered as NGOs were limited by their manifestos that prevented them from actively getting involved in political situations. However, recently the movement has been getting more 'political' i.e. taking up issues, which had direct repercussions on the state. Women's organisations and NGOs formed a common platform, the Sammilita Nari Shomaj which enabled them to bypass the limitations of their organisational agendas and protest the rape and murder of 14 year old Yasmin from a broader platform. Even after the Yasmin incident, the Sammilita Nari Shomaj continued to protest state violence against women, later on taking up the Kalpana Chakma case.

It may be mentioned that the HWF had participated in the March 8th 1994 rally of the women's movement with their

slogan Autonomy for Peace. They also went to the NGO Forum of the Women's Conference in Beijing in 1995 with the same slogan. However although the National Preparatory Committee Towards Beijing, NGO Forum '95 constituted a separate task force on indigenous women, barely two lines were included on the topic in the summary of the official NGO report. This reflected the hesitation on the part of some NGOs to deal with an issue, which had become a matter of political controversy. On the other hand, the movement, which rallied behind Kalpana Chakma was exceptional to the extent that many human rights and women's organisations demonstrated on the streets and joined hands with the Left and Trade Union activists in protesting the kidnapping in unambiguous terms. This may have been possible due to the more relaxed atmosphere following the coming to power of a government who had specific electoral promises about the CHT.

However it cannot be understated that the position and status of Bengali middle-class activists fighting for their rights on the streets of Dhaka are very different to those fighting for their rights and dignity in the frontline of existence, the CHT. Needless to say the stakes are much higher in the latter case. The fate of Kalpana Chakma is a sad reminder of this.

The above movement also demonstrates the failure of Bengali middle-class led organizations to engage with questions of ethnicity and more seriously nationality. After the CHT accord has been signed, while celebrating 8th march, International Woman's Day, the same Sammalita Nari Shomaj which has campaigned actively for Kalpana Chakma, turned on a group of indigenous women representing the Hill Women's Federation who had brought with them a banner saying that their struggle shall stop only with autonomy! The organizers of Shommilito Nari Shomaj asked the HWF members to put down their banner as the slogan was "too political"! It seemed

that what was really meant was that it went against the sovereignty of the Bangladesh state, an argument very close to the one being offered by the Bangladesh state and its military establishment especially in denouncing any Pahari (hill) voices who critiqued the peace accord! What had the women's movement learnt from its engagement with the Kalpana Chakma issue? It seemed that they had rallied their support to HWF on the basis of a very abstract construction of human rights without looking at the specificity of politics in which this rights was based on. This specificity entailed taking a hard look at notions of citizenship, nation, national self-determination and ethnicity. The hard realities which Kalpana Chakma faced as a woman of her community taught her more about these things than all the fancy words deliberated at the Beijing Conference, which she could not attend because she did not have enough money to pay for her registration. (Guhathakurta, 2000).

Recent developments : Kalpana's long term impact

A new development has taken place outside the mainstream women movement, which has had important consequences for the CHT activists as well as other indigenous peoples such as Garos. Two of the more centrally located university campuses of the country, Dhaka University and Jahangirnagar University experienced some of the worst incidents of sexual harassment ever reported. But in both Universities, first in Jahangirnagar and then in Dhaka University, it was the women students who were in the frontline of protests. Most students' branches of mainstream political parties not only steered away from them but also vehemently attacked such attempts, thus revealing the ruthless patriarchal culture of traditional students' politics. The young students who protested (both male and female)

were supported by a few students group of left leaning who were willing to take on board the gender issues in their political agenda. After the crisis was over, the networks developed during these times endured and an effort was made to translate this into a sustained social movement. Networks and alliances were contracted in response to other incidents of sexual violence, which rocked the country and a kind of loose network of organisations and individuals were formed under the banner of the Jouno Nipiron Protirodh Mancha (Platform against sexual harassment). This is in the formative stage but it bears a certain dissimilarity from the above mentioned Sammilita Nari Shomaj at least in two ways. First, the Mancha constitutes both men and women, therefore in the real sense it is not part of the women's movement. Second, it takes into consideration both class and the nationality question on board and hence associates itself with as well as supports both left-oriented groups as well as indigenous peoples movements, like the PCP, HWF and the upcoming Bangladesh Garo Chattro Shongothon. But this platform has also served groups like the PCP and HWF (those still contesting state policies) as a forum in which they can demonstrate solidarity with issues of general concern. Some of these issues have been sexual harassment, eviction of slums and brothels, environment policies of the state and the politics of oil exploration. As such the same groups who had been concerned solely with issues of ethnic discrimination are broadening their participation and thereby strengthening their democratic foundations in the wider body politics. Simultaneously the PCP and HWF who have had a longer and arduous history of struggle than the other indigenous people's organisations are now actively involving them in build up networks among indigenous students groups such as the Garos. Interestingly, the Bangladesh Garo Chattro Shongothon

made its first debut in national politics by effectively protesting the rape and murder of a Garo domestic worker in Mymensingh. They are effectively networking with PCP, HWF, and other member organisations of the Mancha on specific gender concerns as well as other issues that link up with their agenda. In a leaflet demanding proper investigation and justice for the alleged rape and murder of Garo domestic worker Levina Howie, their demands included among others, issues such as constitutional recognition of all nationalities, solution to land related problems, investigation and justice for all crimes committed against women. (BAGCHAS Leaflet, 1999). This is perhaps an indication that some of the issues which linked up gender and ethnicity, which was lacking from the mainstream women's movement, is being compensated for in this forum. It seems that though Kalpana Chakma had disappeared from our midst, she has clearly left her legacy behind.

It is clear from Kalpana Chakma's quotes above that hill women had argued the case for greater participation of women in the movement as well as for the inclusion of the gender issue within the agenda of the party. But at the same time they realised that they needed to be free of ethnic discrimination as well. Kalpana Chakma in an article talked of their vision of a peaceful world: "We want a society where men and women would enjoy equal rights. Also where one class of people would not exploit another class of people or where one community will not be able to dominate and abuse another community (Chakma, 2001).

References:

Akhter,S. (1996) Kalpana Chakma Udhao Keno? (Why has Kalpana Chakma Disappeared?) in *Bhorer Kagoj*, 17 July.

Ain O Salish Kendra (ASK) (1996) *ASK Bulletin,* September.

Bangladesh Garo Chattra Shongothon, Leaflet distributed for demanding justice for the rape and murder of Garo domestic worker, Levina Howie, 25th August 1999, Dhaka.

Bhorer Kagoj, (1996) 24th August

Bhorer Kagoj (1996) 16th May.

Bhorer Kagoj (1996) 22nd May

Chakma, K. (1996) Kalpana Chakma's Diary, published serially in *Bhorer Kagoj*, 24th July, 29th September and 6th October.

Daily Star, The, (1994) sub editorial report, January.

Daily Star, The (1995) 5th September.

Dastidar,P. (1956) *Birkannya Pritilata*, Dhaka, Nabaprokash Bhobon.

Guhathakurta, M. (1985) Gender Violence in Bangladesh: The Role of the State, in the *Journal of Social Studies*, no. 30.

Hill Women's Federation (HWF) (1995) Leaflet distributed in *NGO Forum, Beijing*.

Memorandum to the Home Minister presented by 12 organisations, 14.7.96

Mohsin, A. (1996) The Nationalist State and the Chittagong Hill Tracts 1971-1994 in *the Journal of Social Studies*, no. 74.

Children, Peace Initiatives and Activism

Bina D'costa

Dr Bina D'Costa, Peace, Conflict and War Studies Program, The School of International, Political and Strategic Studies, College of Asia and the Pacific, The Australian National University

Children's struggles are often linked with a variety of advocacy strategies and social and political movements. While images of children have historically been used to frame advocacy measures, children's direct participation until comparatively recently has been almost non-existent in advocacy and activism. The rationale was that while it was critical to advocate for children's agency and empowerment, ultimately it was adults who framed policies. Such an advocacy approach was universal in global governance, including in transnational movements, anti-trafficking networks, and in state governance mechanisms. Children are also participants in political movements – both peace and protest movements.

Children's representations in global and local advocacy strategies – their participation and the political framing of their identities – illustrates that the multifaceted and sometimes paradoxical engagement of civil society in child protection and child rights discourse is an ongoing and significant factor that must be recognised in order to

understand and properly accede to the rights of children in post-conflict society.

The Transformative Politics of Advocacy: Children as Zones of Peace (CZOP)

Children's visibility is raised in both global and local advocacy by drawing attention to their vulnerabilities and marginalisation. However, this approach also includes initiatives to integrate children's voices into advocacy programs, and from early 2000 in encouraging children's peace movements.

In the early 1980s, Nils Thedin, then a delegate of Sweden to the Executive Board of UNICEF, lobbied for children's organisations to stress 'children as a conflict-free zone in human relations.' In Lebanon, many children from different communities and factions – Druze, Shiite, Christian, Palestinian, and others – attend summer camps for a period for several years as part of a peace education campaign. As the idea of promoting children as 'zones of peace' developed through these initiatives in different parts of the world, prominent individuals supported negotiation processes in a number of conflict societies. For example, in the early 1980s, James P. Grant, then Executive Director of UNICEF, joined forces with Archbishop Arturo Rivero Damas of El Salvador to broker 'days of tranquillity' between the government and the rebel forces, which allowed health workers to carry out vaccination programs throughout the country.

The protection of children from harm is enshrined in the last paragraph of the Graça Machel report, which urges the need to claim children as zones of peace (CZOP). This was embraced enthusiastically by the UNICEF office in Colombo in early 2000. A study conducted by the Reflecting on the Peace Practice Project (RPP) in 2001 recorded that people felt that

children's voices could influence the dominant attitudes regarding the conflict in Sri Lanka. In the first phase, UNICEF Colombo initiated a series of consultations with a wide range of stakeholders from, for example, the Ministry of Defense, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), religious organisations, local and international non-governmental organisations (NGOs and INGOs), schools, and communities directly affected by the conflict. The agreement stipulated that CZOP would provide a positive advocacy function and bring attention to the effects of conflict on children. A loose coalition of interested agencies and individuals was formed as a result of this consultation process, with over 250 participants from civil society. The result was a booklet titled *The Children as Zones of Peace: A Call for Action, Promoting and Protecting the Rights of Children Affected by Armed Conflict in Sri Lanka* that was closely based on the Machel Report and published in English, Sinhala and Tamil. The booklet recorded that by 1998 an estimated 380,000 children were displaced – many of them repeatedly – and up to 250,000 remain displaced. Landmines and unexploded weapons created several civilian victims every month, the majority being children. Approximately 900,000 children living in the war zones experience a variety of problems, from reduced medical care to displacement, rape, and recruitment as soldiers.

Sixteen agencies working in Sri Lanka endorsed the CZOP initiative. However, the different mandates across the agencies constrained the extent to which CZOP could succeed. There were disagreements about CZOP's public stand as a group against the recruitment of child soldiers. These concerns also affected how Sri Lankans perceived the CZOP, and ultimately the initiative was not very effective: 'CZOP is

not controversial enough; the concept is too obvious (we can all agree that children are important) and therefore easy to dismiss or ignore.'

Practitioners have taken the phrase apart, pointing to the political and cultural inappropriateness of each of the words. For example, in the interviews given to the RRP, some observers noted that even though children made choices to join military forces at times of conflict, they could not easily be separated from the family sphere. Adults continued to form a part of their world and to offer safety. Death of a parent, a family member or a teacher affected a child's peace. Also, the term 'zone' was politically loaded. Earlier, UNESCO declared Jaffna as a 'zone of peace' that the LTTE dismissed since there was an implication that Jaffna could not be attacked. Some worried that 'zone of peace' could mean an anti-Tamil Eelam position. Others questioned whether children could constitute zones of peace; whether zones were geographical locations; and even whether adults should tell children they were zones of peace, particularly when they experienced violence on a daily basis. The implicit message for children in this naming process could be that adults were out of touch with children's everyday realities. In addition, NGOs pointed out that it is not only armed conflicts that affect children's security. Challenging issues of class, caste, and minority identities must be included in the broader definition of peace. The term as a whole did not make much sense to Sinhala, whereas the Tamil translation was closer to the spirit of the phrase – 'children are sacred places' in seeking to establish an umbrella of protection.

In Sri Lanka, the concept was understood as one that was owned by UNICEF, which limited local legitimacy. CZOP in Sri Lanka did not emerge following a needs assessment of the

country, but rather was an outcome of a report commissioned by the General Assembly of the UN. This example of an advocacy effort initiated by international organisations in a local context raises questions regarding the extent to which a concept with universal implication and applicability needs to be tailored to suit specific political and cultural settings, or even whether it is practically possible to do so. UNICEF's approach in Sri Lanka was careful not to offend the warring factions, including the government. While the strategy was to transform the attitude towards children, the top-heavy operational design of the CZOP as led by UNICEF was criticised as not being forceful enough. For example, in May 1998, the Special Representative of the Secretary-General of the UN on Children and Armed Conflict, Olara Otunnu, visited Sri Lanka. Prior to his visit, UNICEF ran a print media campaign that included narratives of four children affected by violence in conflicts in Sri Lanka. The campaigns were run via television and radio channels with the understanding that they should be informative but non-confrontational.

As such, children were present at the first stage of the CZOP in Sri Lanka only as subjects of international advocacy efforts. Children's vulnerabilities in conflict situations in Sri Lanka were highlighted by representing them primarily as victims in need of protection, but they were given no say in designing the protection mechanisms. The politics of the armed conflict in Sri Lanka influenced the success of the CZOP program and constrained children's ownership and participation at a minimal level. The staff at the UNICEF Colombo office believed that the ongoing conflict seriously undermined the traditional importance given to education, as schools were used for recruitment centres for both the LTTE and the paramilitary forces of the government. One of its

initiatives was to sponsor theatre groups that allowed children to express themselves and motivated parents to send them to school. However, some parents were not satisfied with UNICEF's approach of encouraging children to take initiative and support each other to go to school, believing that financial support for children was more important. At this time, although children participated in theatre groups, it was adults – their families, the NGOs and the INGOs and other stakeholders – who were the primary beneficiaries of these programs.

By 2005, a transformation was visible in the CZOP approach as children's voices began to be directly included as a result of increasing awareness of effective ways of including children. The CZOP initiative considered that the global and local norms and perspectives of integrating children's voices in the design was a more effective way of carrying out its agenda. As a result, whereas in 1998 the images of children were used to raise awareness of their vulnerabilities, by 2005 there was a conscious shift to include children's thoughts in the promotion of peace. The CZOP initiative carried out a nationwide survey of 1500 children between the ages of nine and sixteen, from different religions, ethnic groups and socio-economic classes. A poll released in May of that year revealed that if they were President, only three per cent of Sri Lankan children would be in favour of fighting a war. Most children would instead prefer to promote peace and bridge political and ethnic differences. Children responding to the survey felt that if the armed conflict was resolved, the money otherwise spent on the war could be used to develop schools, to help children from different ethnic groups coexist, allow children in the North and East to return to school, and rebuild schools destroyed by war. In addition to measuring children's

attitudes towards war and peace in Sri Lanka, the poll aimed to take a vital first step in ensuring children a voice in the peacebuilding process. The UNICEF Representative in Sri Lanka was quoted by the press: 'Although child rights are now on the peace process agenda, children are not given the opportunity to effectively participate in the peace process, this Poll should act as a starting point to enable greater representation of children in peace building.'

Sri Lanka's twenty-six years of protracted conflict ended after extremely violent battles in 2009. The UN estimates that 40,000 civilians died in the five months before the war formally ended in May 2009, when the LTTE surrendered. Other estimates suggest that a minimum of 70,000 died in these five months, while the government of Sri Lanka claimed that the number was 10,000. The government declared a No Fire Zone (NFZ) on 20 January 2009 on a thin strip of land estimated to be 35 square km in Mullaithivu, on Sri Lanka's northeast coast. During these five months the government violated international norms and systematically subjected these areas to aerial and artillery bombardment. On the other hand, the LTTE also committed war crimes by not allowing civilians to move out of the NFZ. Its fighters prevented civilians from leaving LTTE territory, and in the final weeks shot those trying to flee to safety. It forcibly recruited children as young as 14 and used forced labour to build its defences. While no age-disaggregated data exist for the last stage of the battle, all reports confirm that many children perished in 2009 despite remaining the NFZ. In 2012, Channel 4, UK showed footage of 12-year-old Balachandran Prabakaran, the son of the LTTE leader, Velupillai Prabhakaran. He was executed while in military custody along with five men, believed to be his

bodyguards. The documentary showed how Balachandran was given a small final meal and then shot dead at a close range.

While CZOP is valuable for negotiation and even humanitarian intervention, the Sri Lankan example illustrates that international advocacy of CZOP has certain limitations. Lack of political will, violation of international and local norms, and labelling children as enemies and hostages could break down the gentle image of CZOP, which appears to be successful only at times when warring factions are willing to compromise. Educational programs, however, are one of CZOP's more successful advocacy strategies. According to UNESCO, there are currently sixty-seven million children not receiving schooling throughout the world, and over forty per cent of them are in conflict-affected countries. Representatives of Côte d'Ivoire, India, Liberia, Nepal, and South Sudan met in Nepal in May 2012 to work on the Schools as Zones of Peace (SZOP) program. The strategies that the forty participants discussed included: community ownership; the use of art-based therapy in conflict-affected areas of Chhattisgarh, India; child-friendly teachers in Liberia; and involving students in building drinking water taps in South Sudan.[3] Stressing that education is crucial to peace, this five-country initiative focused on the transition to peace by linking schools to the family and the community. The program was also implemented in Nepal through collaboration between the government and local and global civil society actors. UNICEF in Nepal asserts that the SZOP initiative succeeded in ensuring that more than one million Nepali children in more than four thousand schools directly benefitted from schools being kept open at times of political unrest.

[3] http://www.protectingeducation.org/news/countries-learn-nepals-schools- zones-peace-programme.

A very important outcome of CZOP has been the promotion of the role of children's in peace movements. While CZOP has targeted education and health programs, the constant reference to children's role in peacebuilding has also allowed the program to move beyond strategic interventions. However, as discussed below, it is not only CZOP that succeeded in effecting this change: a range of local and global advocacy strategies have promoted children's roles and responsibilities as peace activists.

Children as Activists

We can't change the whole world alone, but if I can teach people that if you put your hand in mine and little by little we join more hands, maybe we can construct a new world.[4]

When her friend Jorge died, Farlis Calle was traumatised and deeply shaken by the civil war in Colombia. In April 1996, the UN sent Graça Machel to investigate the impact of the conflict on Colombian children. Machel's call to children asking them to express in their own words how they felt about the war sparked a spirit of activism in Farlis. With research undertaken by her school student council, a children's movement was formed that worked within the national constitution to contest local elections and form a local government of children in her town municipality of Apartadó. Farlis and other young activists demonstrated unwavering courage in calling for a national ceasefire. Amidst death threats, Farlis averred 'You can't kill the hopes of kids!' On October 25, 1996, 2.7 million children voted for peace. The Colombian Children's Movement for Peace (CCMP) succeeded in establishing peace zones in schools and parks.

[4] FarlisCalle, aged 15, Colombiain Janet Wilson, *One Peace: True Stories of Young Activists*(Victoria: Orca Book Publishers, 2008), 11.

Almost no peace activism existed in Colombia until the early to mid-1990s. Although various political regimes initiated peace talks with guerrilla groups, organised citizens' networks were rarely invited to be part of these negotiations. Citizen's groups organised the first peace week in September 1987, which involved a variety of educational and social awareness events. After the collapse of peace talks between the government and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) and Ejército de Liberación Nacional (ELN) in 1992, peace activists organised themselves throughout the country and formed the National Network of Initiatives for Peace and against War (REDEPAZ) in 1993. Supported by REDEPAZ and UNICEF, children, including Farlis Calle and the Apartadó students, symbolically voted for peace. A year later, on October 26 1997, in a non-binding ballot measure during municipal elections, ten million adults also voted for peace, pledging their support for the Children's Mandate for Peace. Peace groups, church leaders and other members of civil society joined hands to organise a 'Citizen Mandate for Peace'. The CCMP was nominated three times for the Nobel Peace Prize. The organisation has grown to more than 100,000 members from 400 different youth organisations throughout the country. These events demonstrate that politicised environments can compel children to take action. Children have the power to mobilise and lead their communities towards positive change.

Children's activism also involves their voluntary participation in resistance movements and protests, some of which are violent in nature. Critics have claimed that media and education are responsible for motivating children to participate in demonstrations and resistance movements.

Voluntary participation of children in protests receives impetus from a number of causal factors, among them children's perception of danger; their daily witnessing of the impunity enjoyed by government forces and rebel groups; and in-group loyalties. In both the Israel-Palestine and the Kashmir conflicts children have been involved in civil disobedience movements that at times have involved violent protests. The stone-pelting practices of protest movements for many children and youth have been voluntary, while in the case of Kashmir, the Indian government has maintained that foreign states were responsible in instigating youth violence.

Prior to President Barack Obama's visit to Israel on 20 March 2013, twenty-seven young Palestinian boys between seven and fifteen years were arrested in the West Bank city of Hebron for wearing Obama masks in public. The Israeli human rights group B'Tselem sought legal advice, and the Isreali Defense Force (IDF) released an official statement, claiming that '[d]ue to recent stone-throwing incidents toward the security forces and citizens in the city, the IDF arrested Palestinian youth who pelted stones. Seven have been taken for a police interrogation. Precedents of stone pelting in civil disobedience have long been visible in Palestinian movements, beginning with the resistance campaigns against the British between 1936 and 1939. Nevertheless, organised stone pelting by children and young adults took a new direction during the first intifada, from December 1987 until the signing of the Oslo Accords in 1993. At this time, youth – many of whom joined the resistance movement voluntarily – were also involved in a range of community activities. As a result of the Israeli siege, assaults, and restrictions on the

Palestinian press, many of them resorted to writing graffiti on walls as a means of political resistance. In the Palestinian uprising against the Israeli occupation of Palestinian territories, the youth in Gaza, the West Bank and East Jerusalem initiated a program of civil disobedience, pelting stones, rocks, bricks and petrol bombs. Cheap and accessible slingshots were effective in attracting international attention, as it emphasised the radically uneven level of resources available to the combatant parties, and the Israeli Defence Force's (IDF) use of excessive force to curb public violence. In the absence of antiriot troops, the IDF and the Border Police were provided with protective helmets, plastic and rubber ammunition, batons, and gas canisters. The Israeli government also invented a gravel-throwing vehicle with which to disperse rock-throwing mobs.

The Indian state has been equally hard on stone-pelting youth in state of Jammu and Kashmir (J&K). In June 2010 the Indian army killed three Kashmiris on a 'fake encounter' mission, later claiming that they were Pakistani infiltrators. The anti-India protest movements began when the opposition demanded the demilitarisation of Kashmir. In March 2011 the state government admitted that over 5,228 young protesters were arrested in 2010 in Kashmir, of which 4,900 were later released. In a press release in May the J&K state government revealed that over 1811 youth – against whom 230 cases were registered for 'involvement' in stone pelting during 2010 and 2011 unrest in Kashmir – had been granted amnesty under a scheme announced by the Chief Minister Omar Abdullah. The Chief Minister made it clear that the amnesty would not extend to those who were involved in arson and damage to public and private property.

A child's or a young adult's social, cultural and political identity is shaped by the world she or he is exposed to. For Palestinian and Kashmiri children, stone pelting and writing graffiti are rituals of resistance through which they make choices in their everyday lives and take back a modicum of control from the authorities. In both cases childhood is militarised, and the political framing of movements make children's role politicised as well. As these examples illustrate, the issue of children's activism in protest movements is complex and often impelled by how they perceive their state's actions. The Israel-Palestine and Kashmir conflicts demonstrate that political movements have the potential to harden children's social and cultural identities, politicising their actions and encouraging children to participate willingly in violent protest movements.

Images of children affected by conflicts in Gaza, Syria, Iraq, Afghanistan and elsewhere continue to fill our television screens; indiscriminate attacks on civilian areas or attacks directly targeting civilians took a terrible toll on children. They were killed by explosive weapons, air strikes or the use of terror tactics in places where intensifying hostilities included widespread grave violations against children. However, we must question the selective moral outrage of the international community and the focus of various advocacy efforts to respond to crimes committed against children.

On the night of 14-16 April, 2014, Boko Haram, an extremist group abducted 276 female students from the Government Secondary School in Chibok, Borno province of Nigeria. Though violence has occurred in Nigeria for years, the massive abduction shocked the international community

into assisting the search for the missing girls. The reporting in various international media thoroughly captured the public opinion in the United States. It deployed 80 troops in Chad to assist in the search of the schoolgirls. Marking one hundred days since the incident, Gordon Brown, the UN Special Envoy on Global Education and the former Prime Minister of the United Kingdom writes, 'For an adolescent with plans, dreams and ambitions, 100 days must seem an eternity. But they are not alone. The world has not forgotten these girls. Not in 100 days, not for one day.'[5] Organised by the Global March Against Child Labour, on July 23, 2014 demonstrations were held in Africa, Asia and Latin America. For example, led by Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) schoolgirls in Pakistan campaigned for girls' right to education. Similar campaigns were organised by the Bachpan Bachao Andolan group, which rescues children from bonded labour in India and Walk Free, the anti-slavery organisation in different parts of the globe.

The narratives of the kidnap of the Nigerian girls range from the resurgence of al Qaeda to humanitarian to the persecution of minority Christians to the deprivation of education opportunity for women. The International community also took note of the social media #BringBackOurGirls campaign which effectively began to raise awareness of the crisis. On the other hand, the civil war in Syria claimed 11,420 of its children by December 2013. Further, an estimated 130 children have been kidnapped by the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), in Manbij, a Syrian town in early 2014. In May, according to the Human Rights Watch another 153 children were abducted by ISIS from the

[5] Available at, http://edition.cnn.com/2014/07/23/opinion/brown-nigeria-boko-haram-girls/

mostly anti-Kurdish town of Ain-al-Arab. Some critics observe that the horrific experiences of children in Syria and Iraq do not make the lead news anymore and could not shock the international community into action.

The international community has often supported education and health projects in conflict zones and in countries in transition to rebuild societies. Similarly, in recent conflicts extremist groups tended to have targeted educational and health facilities such as schools, hospitals and health clinics. Schools and hospitals have also been bombed during the most recent offensive of Israel against Hamas in Gaza in July, 2014. Human rights organisations in Gaza such as Al Mezan Center for Human Rights and the Palestinian Center for Human Rights continued to update the number of Palestinian death that included 249 children by the third week of the offensive. The Israeli government and Palestinian NGO disagreement over the numbers or the questions of who is child, or how should one distinguish between child/minor civilians and child/minor combatants; mixed reaction of the international community; and sharp criticisms from the United Nations Secretary General Ban Ki Moon directed towards Israel after an airstrike that targeted the UN school in Gaza indicate that there are also tensions in the international advocacy efforts about how best to respond to children's experiences in conflict zones. Images of children are also used as propaganda tool by different warring factions. The face of an injured or a dead child invokes more emotions then the image of an adult. While the role of civil society including children's groups has important potential it cannot compensate for the failures of international, regional and national policy efforts to end conflicts and achieve peace. One

important lesson from these examples and insights is that civil society efforts to curb violence against children and to involve children in peace initiatives are also embedded in the national and global political history of various conflicts and their multiple representations.

Walking to Feed the Hungry

Ven. Bhikkhu Bodhi

Today, I believe, we need to put our great spiritual traditions to the grindstone, to equip them to tackle the powerful global challenges facing humankind, such as war, poverty, social injustice, and the over-exploitation of the environment. I call the attitude we need "conscientious compassion." Conscientious compassion is a moral vision driven by the pangs of conscience and spurred by a deep identification with the pain of the world. This is not mere sentimental compassion, a sublime and leisurely disposition of the heart. It's a fierce compassion that urges us to struggle relentlessly, even against immense odds, to establish a reign of social and economic justice based on a sense of human equality and the intrinsic dignity of every person. We might also call this a path of sacred action, of action rooted in a firm faith in the sacred imperative to correct injustice everywhere and create a world that works for everyone.

My own journey into the path of sacred action was for me a surprising one, since by temperament I'm not an activist but a quiet contemplative and scholar. My greatest personal pleasure is to live undisturbed at my monastery in upstate New York studying and translating Buddhist texts. But it seems fate had another destiny in store for me.

I was born and grew up in New York City, but I wound up living in Asia for 24 years, 22 of those in Sri Lanka, where I was

ordained and trained as a monk. I returned to the United States in 2002. In 2007 a popular North American Buddhist journal named *Buddha dharma* invited me to write an editorial essay for their summer issue. In the essay, titled "A Challenge to Buddhists," I expressed my belief that for Buddhists to respond effectively to the demands of our time, they must be ready to stand up as an advocate for justice in the world, to provide "a voice of conscience for those victims of social, economic, and political injustice who cannot stand up and speak for themselves." I saw this as a deeply *moral challenge* marking a watershed in the modern expression of Buddhism.

When the essay was published, I did not tell anyone about it, but some of my students and friends found it on their own and began to discuss it among themselves. They then brought me into the conversation. Before long we were drawing up plans to establish a Buddhist relief organization, which we called Buddhist Global Relief. Initially we thought we could broadly help victims of natural disasters and social injustice, but it quickly became apparent that we needed a narrower point of focus. Through my experience in Asia, as well as my readings on the internet, I was aware of the wide extent of chronic hunger and malnutrition in today's world, and we thus decided to make chronic hunger and malnutrition the specific focus of BGR.

Buddhist Global Relief came into being in June 2008. We're an all-volunteer organization. We've been extremely fortunate to attract skilled and dedicated people to both the board of directors and our operational team. We don't have any paid staff, or even a physical office. Our executive director is a retired telecom engineer, originally from Vietnam, who

works from her home near Boulder, Colorado. The assistant director is a retired professor living in Seattle, and the board members and team members are spread out from New York and Pennsylvania to Florida, Chicago, and California.

Over the six years of our existence, we have launched over 60 projects. These range from Vietnam and Cambodia through India, Bangladesh, and Sri Lanka to Africa, Haiti, and the United States. We operate by forming partnerships in the countries where we operate. These are generally formed with small regional organizations whose staff members know the people, the culture, and the language, but sometimes we partner with larger organizations like Oxfam America and Helen Keller International. We invite prospective partners to submit proposals for projects, and we then review the proposals and select those most compatible with our mission.

As a small organization we can't tackle emergency disaster relief, which requires a budget in the multi-millions. Our projects aim at durable and sustainable solutions to hunger that tackle the problem at its roots. One type of project offers direct food aid; for example, we've had an ongoing project in Haiti since the massive earthquake of 2010, providing substantial hot meals to children in a district of Port-au-Prince. Another type of project supports ventures in small-scale organic agriculture, mainly benefiting women farmers. We have ongoing projects of this type in Cambodia, Vietnam, Kenya, Ethiopia, Rwanda, and Malawi, as well as other countries.

By studying about world hunger, we learned that one of the factors most responsible for poverty in many traditional cultures is the subordinate status of girls and women, and thus still another type of project aims to provide them with a

ladder from poverty by improving their status. In Cambodia, for instance, we've been partnering with Lotus Outreach on a project that provides food aid to poor families on condition that they allow the girls to remain in school. We started this project in 2009, with people living at the bare edge of survival. Now more than 80 girls from the early batches are studying in college and university—the news brought tears of joy to my eyes! In Sri Lanka and India we support projects that provide vocational training to poor girls, who in India come from the Dalit community, the former "untouchables." Our project with Moanoghar also fits into this category. By providing children from poor families, many of them orphans, with the chance to receive a good education, we hope to give them a chance to emerge from poverty. To give women a more prominent role at home, we support them in developing "right livelihood" projects, either in agriculture or home industries. Over the past couple of years we've been establishing partnerships in the United States, where poverty and hunger are widespread, with one is six persons dependent on food stamps for their meals. Our present focus here is on supporting urban and home gardens.

Our primary fundraising activity is a "walk to feed the hungry." We started out in 2010 with one walk, in New Jersey. In 2011 we had three walks—in New York City, Michigan, and the South Bay of California. In 2012 we had about ten walks, from coast to coast, including walks by our beneficiaries in India and Cambodia. We have had even more walks in 2013 and 2014, again including walks in India and Cambodia.

Walking can function as more than a process of getting from one place to another. It can also serve as *an act of conscience* by which we project our values and ideals out into

the world. Walks have taken on this role numerous times in the past century. Gandhi's walks along the dusty roads of India were part of his peaceful strategy for freeing his country from the grip of the British Raj. Reverend Martin Luther King's walks in the cities of the American South helped win civil rights for millions of disenfranchised African Americans. Maha Ghosananda's "Dharma Yatras" in Cambodia attempted to heal the wounds left by two decades of brutal conflict. Recently, a People's Climate March in New York City reminded world leaders that people are concerned about escalating climate change, which will have disastrous impacts all around the world—from the U.S. agricultural heartland to India, Maldives, and Bangladesh to the island-nations of the South Pacific.

Over the past five years, the long walk has become the primary method for Buddhist Global Relief to raise funds to sponsor our projects helping poor people escape the trap of poverty. While the direct purpose of this walk has been to raise funds, the act of walking together for several miles has a more profound spiritual meaning, serving to express our fundamental moral convictions. On reflection I can see in our "Walk to Feed the Hungry" three layers of significance, which blend and reinforce each other with every step that we take.

At the most obvious level, the walk is an expression of generosity and compassion. By walking together, we enable people to make donations to support our projects. By walking together, we manifest concern for the poor and hungry. Our steps are acts intended to alleviate suffering. Through collective action we express our belief that all human beings are essentially alike, that we all merit the resources essential to a decent life. We also make a commitment to extend a

helping hand. We reach out across oceans, continents, and cultures to lift up those cast down by poverty. We equip them with the means to uplift themselves: with education, training, tools, food, and seeds.

At a second level, our walk expresses our sense of conscience. It affirms our awareness of an impersonal imperative pointing us towards social justice. By walking we express the recognition that something is fundamentally wrong with a global social and economic system that treats human beings as disposal. We resist a system that pushes a billion people into the pits of poverty and crushes them beneath the weight of constant hunger. We express moral revulsion at the cruel miscarriage of justice that occurs when, amidst an abundance of food, six million people—over half of them children—die each year from malnutrition and hunger-related illnesses. With our silent steps we proclaim that the global food system must guarantee everyone a sufficient quantity of healthy nutritious food. More broadly, we advocate for a new world order founded on the pillars of social justice and respect for the inherent dignity of every human being.

At a third level, walking becomes a way of expressing our own real nature, of manifesting the deep potentials for generosity and goodness inherent in the human heart. By walking in the company of spiritual teachers and kind-hearted friends, we knock down the narrow walls of self-concern and give rise to a new perspective—a universal perspective—that takes the good of all as our guiding ideal. By walking in solidarity with the world's poor, we repudiate the cynicism of the dominant culture which regards human nature as corrupted by incurable selfishness and greed. Rather than

yielding to the dictates of blind self-interest, we show that, as individuals, we flourish best when we nurture our innate impulses to generosity, love, care, and concern. Even more pointedly, we express the hope, trust, and conviction that humanity as a whole flourishes best when we all flourish together. We walk because we look upon one another as lost brothers and sisters. We walk to share the burden of suffering with the weakest in our midst, and we rejoice in discovering our power to uplift those who urgently need our help.

By walking to feed the hungry, we show that it is not economic competition that is going to save our world. The secret to transforming the world, the key to security and safety, lies in cooperation and collaboration, in compassion for all beings in the wider web of life. The key to our redemption from the brink of self-destruction lies in helpfulness, generosity, and love, channeled into selfless action on behalf of all sentient beings, including people we will never know or see. As we travel through this journey of life and death, we walk together as a way of demonstrating our primal unity. We walk together to embody in action our intrinsic and inseparable solidarity in the quest for well-being, happiness, and security.

I encourage everyone who wishes to experience the joy of generosity and compassion to find a way to express compassion in collective action. We can link up with friends and colleagues to find means of realizing conscientious compassion.. By acting together, we can accomplish much. We don't have to be spiritual giants. What we need most is the trust that, if we take the initiative to act, the deep spiritual forces of the universe will come forward to help us. In mysterious ways that defy rational explanation, these forces

will be there in the background silently supporting us, bringing us into contact with the right people and opening up unexpected opportunities to serve. What is called for is a deep reservoir of compassion, born of contemplation, meditation, and prayer, and a strong intention to devote one's efforts to the service of others. It's been my experience that once we bring these factors together, the rest will unfold almost miraculously.

দ্বিতীয় অংশ

মোনঘর ও প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি

The Value of Moanoghar

Mujin Sunim

Congratulations on staying alive for 40 years, it is truly an achievement. But actually, it is hardly surprising as Moanoghar is a school with a mission. Established in 1974 by Buddhist monks from the Chittagong Hill Tracts, Moanoghar looks to give a chance to the most isolated and destitute children in the region.

Personally I feel that Moanoghar is special.

Maybe some of that specialness is in the school song. Do you remember it?

Moanoghar Song

Our Land, our Home
Moanoghar is the home to All
We live here amidst hardships and happiness
We all are brothers & sisters in the community

If we live here (together)
We shall all be Enlightened

By following the path shown by the Buddha
Let's all strive for the betterment of Many
We shall follow the Middle Way
And shall have no fear

We shall find happiness if we respect the Principles of the Buddha
We shall overcome all sufferings
We shall endure all challenges of our Time
And we shall find bliss in our life

Our Land, our Home
Moanoghar is the home to All
We live here amidst hardships and happiness
We all are brothers & sisters in the community

Text: Sugata Chakma (Nonadhan)

So if we are going to take this song to heart, what does it mean to follow the Buddha's Path and how does Moanoghar do that?

The first way in which the students and staff of Moanoghar put in action the Buddha's teaching is by practicing tolerance. Everyone is welcome! Even though the school only caters for indigenous students (because they have special requirements) and the majority are Buddhist, everyone and anyone is welcome to visit and spend time with the children or help out. This is a fundamental Buddhist value because of the understanding that everything and everyone is inter-related: my happiness is yours and your happiness is mine; your sadness is mine and my sadness is yours.

The second way in which Moanogharians live the Buddha's way is by actively living compassion. There is a wonderful feeling of good-will and warmth throughout the school; of the students to each other, of the staff…. If there is to be any happiness between people, in the world then we must all be well armed with compassion in order to deal with the problems of life. The perfection of compassion coupled with the perfection of wisdom, a very intangible value, are the qualities of a Buddha and they form the cornerstones of the Buddha's teachings. For children to be introduced to compassion is an important part of their education.

Moanoghar is open to ideas, to new people, to events. This openness is one more core value of Buddhism and goes

with tolerance. It also enables Moanogharians to deal with the good times and the bad in skillful ways. At the school, there is a constant search for new ways to manage and change, even the smallest child has a voice that is listened to. This lends the school a richness which is missed when people close down, consider they know it all or are unwilling to listen to new ideas.

Finally, morality is center stage in the school. Most of the tutors – the adults that looks after each residence – for the boys are monks. This sets a certain tone, a certain atmosphere. The students have examples of dedication and hard work before them every day. This is because the monks, even if they are not very good monks, have chosen the ordained life (from which they can leave at any time) in order to make a special effort to improve themselves. In this way, the children learn to appreciate the sacrifices that so many in their community are making (to keep the school going and to improve it constantly.)

And the Middle Path? That is the path of moderation, of knowing and accepting hardship and happiness, of dealing with them correctly. That awareness of what life is all about and how to live without regret or misgiving is the Middle Path. It is respect for everyone and everything. It is clear mindedness and life in the present moment, concentrated and not distracted so as to avoid mistakes and steer clear of hurting others or wasting our precious resources. These are all the ideals, the lofty goals of the Buddha's teachings to us. The first step is to know this and then to put it into practice. Moanoghar slowly and gently makes its members aware in order that each person lives to the full of his or her potential and glory.

As the song says, we are all "brothers and sisters" so that even if the residential students eat only twice a day, even if

not everyone is the best, there is still a solid and excellent foundation of living values established in each student, in each graduate. In fact, it is so strong that many of the staff are ex-students and many others in the community at large give all they can to keep the Moanoghar tradition alive.

May Moanoghar continue to grow and improve!
May Moanogharians actively contribute to World Peace!
May Moanoghar continue forever!

My Discovery of Non-violence, From Vietnam War to Moanoghar and Chittagong Hill Tracts

Pierre Marchand

I was born on 19 November 1954. The year was terrible in France. It was one of the coldest winters in recent memory in France, the cold was so bitter that thousands died from it, particularly in the low income slums areas of the biggest French cities. A young French religious priest, Abbé Pierre, had the audacity to make an appeal over French radio to raise donations to help these poor people who were suffering so terribly from the cold. Out of this appeal was born the international association « Emmaüs ». Of course, I was too young to remember the sufferings of the people and to witness the generosity of the people who responded to the appeal of Abbé Pierre. But I have heard so many people of talking about him and much later, I was lucky to meet and know him personally. This encounter left an indelible influence on my personal views and philosophy. I particularly retain the importance of three teachings. Three essential values for life: compassion, action and perseverance.

When I was 6 years old, I came to know Rudolf in school. He was the son of a Russian immigrant. His father was a petty thief and mother was a prostitute. He was very poor and almost always very sad. Because of his family conditions, he was always badly dressed and also bad in school lessons. My

father asked me never to befriend Rudolf as he was afraid that I could under Rudolf's bad influence. I was profoundly shocked by the order of my father which I personally took as a total lack of compassion to the poor and the marginalized. Rudolf, to me, was a victim and not responsible for his condition.

Sometimes, an event, a meeting at the tender age of childhood leave an indelible mark in one's life. I have never forgotten Rudolf; knowing him left a strong impression on my world view and in my personality.

My mother was a nurse and my father, an engineer, an alumni of one of the most prestigious French engineering schools. He became an expert of big infrastructure projects, particularly of dams. He constructed dozens of such huge dams in many countries all over the world but never in Bangladesh. I am very proud of him. He is still alive, now 93 years old. Unfortunately, he suffers from Alzheimer disease for the last several years.

When I was 10 years old, my mother suddenly died of meningitis. We were playing in a park when she suddenly told us to return home. She was feeling a terrible headache. As soon as we had arrived at home, she called the doctor who arrived quickly. In the evening, she was hospitalized and 2 days later, she died. This was, of course, the worst moments for a young boy of 10 years old. I do not remember exactly who wrote these words; "the advantage of a broken heart is that it also opens other vista". I believe that the dictum is quite true. If you suffer next time, think about this short sentence.

Much later when I was 17 years old, my elder brother gave me a book, titled "The Strikers of the War", written by a priest, the Abbé Jean Toulat. At that time in many countries, the young people aged 18-19 years had to do compulsory military service. It means that they had to undergo arms training to be soldier in the future in case of war. But there

the scope to be "conscientious objector" which means that, young people had the choice of objecting to compulsory military service by evoking to the principle of one's moral rejection of military service. But this means the risks of prison sentence. The book explained the basis of non-violence and the rationale for conscientious objection. It is simply incredible how a simple book can change the direction of one's life. When I was called for compulsory military service, I refused to join for it. But unlike many others, I was not worried. I believe it was because I had been already the leader for a small group of people.

At the end of his book, Jean Toulat included a list of various associations engaged in non-violent struggles (in France). I decided to write to each of these organizations to know more about non-violence, the method of non-violent struggle and how I could involve myself with them.

From 1968 to 1972, I lived in Morocco – in Rabat, its capital city. The country is located in North Africa and still remains poor. The priest of the parish I frequented, asked us to give free French lessons to poor Moroccan students in an effort to make us practice charity. I joined the parish team. But, I came with a terrible shock. This was when I first discovered urban slums. I still vividly remember what I saw and it has left a mark in my thoughts.

Unfortunately, I was not very smart and took little notice to the fact that I was a lucky young man and had the opportunity to go to school and subsequently to university. I hardly did my studies and soon became a bad student as far as academic scores are concerned. I completed my graduation and enrolled myself in the faculty of medicine in the specialized field of psycho-physiotherapy (a discipline for the treatment of physically handicapped persons). But after the first year, I meet an extraordinary Buddhist master, the venerable Thich Nhat Hanh. After meeting him, I subsequently

decided to follow his teaching at another university; the Sorbonne.

As an 18 year old, I was the head of the group of non-violent actions 'César Chavez' and once, we invited a young Vietnamese woman who was involved with the Vietnamese non-violent movement during Vietnam war. I was very much moved by her speech and the following day, I went to see her again and meet with her teacher, the venerable Thich Nhat Nanh. I was profoundly moved after the meeting and right at that moment, I took the decision to join them and put my service for their efforts as much as I could.

Following this meeting, I stopped my studies thinking that it was only one or two years. In the meantime, my thoughts were focused on setting up of a voluntary organization, to make it grow up while also planning to resume my studies at some point. The objective of the association was to support the child victims who had been rendered orphans by the ongoing war. The name of the organization was decided as "Committee to Support for the Children of Vietnam". Sister Chan Khong, the assistant to the venerable Thich Nhat Hanh, was fluent in both French and Vietnamese and took the responsibility of translation of the files of the children and their correspondences. She worked really hard, always with a serene smile. Upon hearing the news of the association, my father was furious against me as I also decided to stop my studies. He threatened my Buddhist friends with a court case for abduction of a minor. By chance, the relevant French law changed in the same year and the age of adulthood was lowered to 18 years of age from 21 years.

This minuscule association to help the orphan children in the Vietnam war, has today become one of the largest French NGO 'Partage'.

What inspired me to found Partage was some chanced meetings with a number of extremely gifted persons, most

importantly, the venerable Thich Nhat Hanh and his assistant sister Chan Khong. In order to mobilize maximum support for the orphaned children in Vietnam, I decided to go to live with Thich Nhat Hanh in the Paris suburb.

There was a 'mutual bonding' factor in the growth of Partage. I used to play guitar and also sing. So I had the idea to propose to a number of friends who were all professional singers, to organize together a charity fund raising concert which we used to call 'hootnany' in France at that time. By good luck, many of them accepted to my proposal. 27 June 1973 was decided for the concert and a big concert hall in Paris was rented for the occasion. I remain profoundly grateful to Thich Nhat Hanh for trusting me and for agreeing to advance the money for the rent of the concert hall and other assorted expenses. In short, he showed on me enormous trust although he did not know any of the singers and artists besides that the fact that I had no previous experience of ever organizing a music concert. But the incident that took place next, changed everything. It is the kind of thing that apparently seems completely fortuitous, if not impossible. At the Paris metro station of « Odéon », I saw a man with a guitar on his back. I recognized the persons instantly; it was Graeme Allwright and I was a big fan of him. What a luck! I approached him without thinking anything and quickly explained him our plan for organizing the fund raising concert for the orphan children of Vietnam war. He immediately agreed to participate.

The next few days, we worked on the posters and other promotional materials and his name was particularly highlighted in all the posters for the concert. With him on board, the success was almost guaranteed but what we witnessed was beyond our expectation. There were as many people outside of the concert hall as there were inside. Later, we made a double disk which also sold very well.

Graeme Alright still remains a close friend of Partage. He has given numerous fund raising concert for Partage over the past decades. These concerts helped a lot in making familiar the concept of sponsorship thanks to the media coverage these attracted. He has made an enormous contribution to the success story that is Partage at present.

How this Partage became engaged from the orphans of Vietnam war to the children from the Chittagong Hill Tracts?

On that point too, it happened with a fortuitous meeting. My Vietnamese Buddhist friend Thich Naht Hanh made a stoppage in Dhaka on his way to South China Sea. He learnt that thousands of Vietnamese were fleeing from the country on ramshackle boats. Many of these boats sunk in high seas, taking tolls on thousands of their unfortunate passengers. He had the idea of renting a large boat to save these unfortunate people which he did with much success.

During his stoppage in Dhaka, he stayed at the Dhammarajika Buddhist Temple and there, as he told me later, met a young Buddhist monk who was a student in the University of Dhaka in the department of philosophy. His name was Bimal Bhikkhu. Bimal told him the situation in the Chittagong Hill Tracts, the existence of an orphanage 'Parbatya' and that the orphanage had little financial resources to receive more children. After this chanced meeting, Thich Nhat Hanh wrote me that I should absolutely meet this young monk and asked to support him in his endeavour. That's how Partage became involved in supporting the children in Chittagong Hill Tracts.

At that time, venerable Bimal Bhikkhu already had a clear idea of what wished to do at Moanoghar. The only point that I prevailed upon him was about receiving girl children in the institution. Bhante was already having lots of difficulty to convince the parents to send to school their boy children and on top of that, I was giving him one more problem by pleading

to receive girls in Moanoghar! The parents, at that time, were mostly indifferent if not even against the education of the girl children. They were afraid that with education, the girls would become arrogant, disrespectful to the elders and the traditions and leave home to seek jobs in big cities outside the Chittagong Hill Tracts.

I think one of the first girls to take admission in Moanoghar was called Durga Mala. After her, many other girls came to seek admission. The grown in the number of children was gradual; Bimal selected the children based on the principle of one-third girls and the remaining as boys. We always had very good relationship, always in good understanding. We also witnessed many dramatic moments together. Sudden flow of large number of children seeking admission in Moanoghar when the situation of the Chittagong Hill Tracts worsened.

I keep a vivid memory of the first time I visited Rangamati. It was the occasion to discover their lifestyle and their generous hospitality. Since the last few years after the signing of the Peace Accord, the foreigners are now allowed to visit the region.

At that time, my biggest expectation was to see the children finish at least SSC, as many as possible. It was more a question of number than quality. To my big surprise, many more children finished, have gone even far beyond that, up to highest level of tertiary education. It has been possible because of the dedication of the teachers of Moanoghar school. They deserve our utmost respect and congratulations.

When Moanoghar started, a key concern was durability of the hostels and other houses. The focus was to build permanent structures with bricks. However, every now and then, a compromise has had to be made with bamboo houses. There were also two other problems; water supply and

electricity. The management team also succeeded to resolve these problems effectively.

All the while during that period, Partage continued to grow, always by the same methods; through personal encounters. In the process, I travelled to more than 90 countries. Partage started first with the sponsorship of a child by myself and it now support more than 800,000 children in 20 countries.

I wish for Moanoghar what I also wish for the Chittagong Hill Tracts; the respect to diversity, to live in harmony with the nature and to always pursue non-violent methods of conflict resolution. I also wish that Moanoghar shows the path for the others in the CHT, in Bangladesh and in the world. There will be many future Bimal Bhikkhu, Prajnananda Mahathero and Shraddhalankar Mahatheros from Moanoghar, leading the region for social work, development and for the children's well-being.

I have learnt that there is now an alumnae association of the former students. This is a great initiative. More than anybody else they know what is good for Moanoghar. Their support is extremely important for Moanoghar. But there too, good leadership is essential. The alumnae association makes me hopeful for the future sustainability of Moanoghar.

All the indigenous peoples of the Chittagong Hill Tracts are non-Muslim. This is a historical fact. Majority of them follow Theravada Buddhism. For me, Buddha's teachings always remain an extraordinary guide. I invite everyone to learn the teachings of the Buddha to practice it in life. You are the repository of this rich traditions and culture of the region's indigenous people, you will have to carry it forward and embody it. Buddhism and indigenous culture is an art to living and you must start it with the daily life at Moanoghar.

My beloved Chittagong Hill Tracts

Sueti Zadjian

We, the people of CHT, are witness to a life with each of us having a unique experience and a story to tell. The events of the late 1970s and 1980s up to the period leading to the CHT Peace Accord, were tumultuous and dramatic, tearing up the very fabrics of social cohesion of the communities. I am too young to know the life of the generation of my grand-parents i.e. before the construction of the Kaptai hydro-electric dam. Everyone tells that it was a different age and people were so happy at that time.

Is it such a long time ago? No. It might appear to be different age but it's not so long ago. My grand parents had a peaceful life which everyone actually wish to have; a peaceful and serene life, full of solidarity and most importantly, no violence, no war and no sufferings of the people. Nobody dies from hunger. My grand parents had such a life.

What brought an end to this situation and such a short time? The peaceful life of my grand parents abruptly confronted a massive human drama with the construction of the Kaptai dam. Many were dislocated from their homes forever and this created the first exodus of the Chakmas beyond their ancestral territory.

Why and when does someone take the dramatic decision to leave his ancestral land? No one usually does it. We, human beings, are conscious of our territoriality; we closely like to

identify ourselves to the surrounding neighbourhood and environment that we are intimately familiar with and are attached to.

The Kaptai dam tore apart the social fabrics of the CHT people. This was the case with the family of my grand parents too. Like thousand others affected by the surging lake water, some of my grand-parents' families decided to leave for India while a few other headed to the opposite direction i.e. towards Myanmar (they never reached there, finally settling in Alikadam). Others simply moved to higher grounds on top of the nearby hills.

But the family was now scattered all over different places and most would not see one another again for the next 30-40 years! My father is one such happy person. He met the extended family members who separated from him at the time of the construction of the Kaptai dam. They now live in Monogang, Tripura in India.

There, after so many years of their separation, my father and his cousin were together face to face. No words for the first few minutes, just an intense look on each other's face. But then suddenly, an eruption of joy, laughter and tears. Mutual hugs. What an emotion! I saw it in front of me in 1987 in the refugee camps. It was strange to see the adults to cry like children. It must be very strong feeling for them.

The life of the CHT people has had further drama following the independence of Bangladesh and it continues still. The conflicts of the past decade have inflicted seriously, may be even irreparable, loss to their sense of identity and a deep wound. Will it ever heal? We must all strive for it. We must persevere for a reconciliation and mutual healing, and most urgently, need to work for the future that will guarantee the safeguards of our rich and proud cultural traditions and our collective identity as Jummas.

We must also shun all violence. Violence only breeds further violence and mutual hatred, the seeds for destruction.

I keenly look forward the day for peace and freedom for all. Peace for the Jummas and peace equally for the Bengalis. Life is too precious. It is a gift of God. We must learn to value the sanctity of human life. This day must come. Every one of us has the inherent right to happiness.

Life in the orphanage: Parbatya

I did not know the life of the Parbatya orphanage in Boalkhali, Dighinala. Most of my friends, who came to France, lived there. I met them at the Korbook refugee camps in Tripura, India. Life was harsh for them. There were little children but they had to manage everything by themselves.

In the barren and fetid atmosphere of the Korbook refugee camps, I stayed together with the other Parbatya children. This was life full of hardship but also equally joyful. We used to wake up very early in the morning with crowing of the cocks. After the cleaning and toilets, it was prayer time. All must get to the assembly of the prayer, in front of the image of the Lord Buddha. I liked the prayer although I did not know the prayers properly. These were all in Pali, the sacred language of the Tripitaka; the holy Buddhist canons. Some children were chanting the prayers, others were gesturing to appear themselves that they too, were seriously praying. I used to simply look at the others! There was a continuous sound of humming. It was always a mesmerizing experience.

The meaning of Parbatya

Parbatya gave the opportunity for education to the children from poorest of the poor and most marginalized families. This was also an opportunity to these destitute children to gain a certain respect and consideration from society.

Parbatya will remain as symbole of the success of the Jumma people, in particular to the Chakmas. It is the mother institution that sowed the seed for the other institutions, Moanoghar, Banophool, Bodhicariya and countless other establishments – small and large – across the Chittagong Hill Tracts, all created around the concept of utilizing the vitality of Buddhism and the resources of the Buddhist temple, to serve the poor and the destitute and to launch the idea that a religion should always be at the service of the community and not the other way around i.e. people serving a religion.

My life in Bangladesh and in France

I am not sure whether it is necessary but I shall nevertheless try.

My father Gondharaj Khisha (his true name is actually Pulin Bihari Khisha) was expected to inherit the position of headman from his father Bui Kumar Chakma. Our ancestral home was situated near Mahalchari. The family lost all its land holdings to the Kaptai dam and overnight became impoverished. He could never walk with his head high.

My childhood was very difficult. I was born amidst the darkest hours of the CHT conflicts when the life for everyone was in peril. Even for a small boy like me. Military operations were carried out almost on daily basis, gravely affecting the daily life of the communities. The threat to life and risk of violence was omnipresent. At this young tender age, I had to endure poverty, hunger, violence, sufferings, escape from ancestral homes and bear witness to exodus of communities. But I have also experienced the fellow-feeling and solidarity of the people, nice moments spent with friends in playing together and merry-making. I have written these experiences in detail in an autobiographical sketch, which was published

recently in France with the title, “Chakma, Orphelin des Hill Tracts: Histoire Tragique d’un Peuple Indigène du Bangladesh”.

In the village, I was asked to look after the cowherds of my father, as many children of my age in the village also used to do. But, it was not an easy task. I was running all the time after the cows that were moving non-stop from one place to another. My aunt used to help me a lot in this work. But this also allowed me to grow up and know intimately the surrounding nature, the fauna and flora, the various insects, etc which have all disappeared today. As I was growing up, this nightmare was becoming more and more apparent.

I was desperate to go to school. I did not want to look after cowherds all my life. I wanted to have a good education, to be successful in my life. I also often had to work in the rice fields of my family to assist my parents. This was very hard work. But what could I do? Did I have any choice ? Not much. My parents were poor. Moreover, the situation was very bad, with almost daily violence. We often had to flee from home and spent the night hidden in nearby jungles and hills. In Panchari where my family had moved after the Kaptai dam, was the venue of particularly bloody violence. The memories of these days are still terrifying to me.

Nevertheless, I continued school for 2 years irregularly.

Finally, we could not stay anymore in our village. The violence simply became too pervasive posing great danger to our lives. So, my father along with other villagers decided to flee to India. At least, our life will be free from violence. The escape was a trial, particularly for me. I did not have any energy to walk and climb the hills which simply seemed to be endless – one after another kept on appearing on our way. It took several days of walk on foot, always at night, in order to avoid the danger of being caught by the army patrol.

Life in refugee camps was another new experience. We found ourselves at Pancharam para refugee camp. We were among the first to reach there. A few days later, several thousands joined us in the camp.

I did not stay very long in the refugee camp. After several months in the camp, a nephew of my father came and took me home of my father’s cousin. I was hoping that I could start going to school. But, the situation turned out to be completely different! I was again tasked to look after cowherds. It was too cruel for me. While children of my age were going to school, I was spending my time to look after cowherds. I could not accept the situation anymore and at one point, I told my uncle about my decision to return to the refugee camp. I would rather confront a difficult life in the refugee camp with my parents rather than being exploited by others. I only spent a few months in my uncle’s home.

Life has given me occasions to encounter many injustices. But why do the poor and destitute have to face it most of the times? This is so unfair.

Life in the refugee camps resembled to be from a different world. Completely inhuman. A mockery to everything that stands for human dignity. For many families, it was absolutely tragic. One of my distant relatives lost 2 of his 3 sons. They died suffering terribly and he could do nothing. Everyone in the refugee camps were surviving on a meagre ration which consisted of a few kilograms of rice, some lentils and oil. Everyone was suffering from severe malnourishment. One has to see to believe.

As soon as I had returned from Monogang, I came to know that a group of children left for Calcutta and soon, they would be leaving to a foreign country. A monk came to see my parents to make a list of the children and to know whether, they were willing to include me in the list. Many parents were

afraid and did not agree to send their children to an unknown land. This is normal and understandable. An unknown foreign land means danger in the future!

But my father decided to include my name in the list. He was a brave man. He dreamt of travelling to unknown places and when he was young, even tried to go abroad. So, I was included in the list of children leaving for abroad, more precisely to France.

I still do not know why my father put my name in the list and why not my younger brothers. I never heard of France. I had read in my school books the name of many countries, such, America, Russia, China, Japan, etc. But never France. I had no idea there exists a country in the world, called France. Where it is located.

I had only a few days to prepare myself for the travel to Calcutta which would take me later, to France. I was anguished over what was waiting for me. I was happy but also afraid at the same time. But I was eager to leave the misery of the refugee camps and to look for luck to go to school.

Life in France

All the 72 children in the group always believed that once in France, we would be in another orphanage like institution and stay together. In the group, I did not know anyone expect Supayan who was also in the Pancharam para refugee camp with me. I was worried of what was awaiting in France for us. But life had changed forever. But for good reasons.

When are arrived at Paris Charles de Gaulle airport, I was exhausted from the very long journey. We arrived in the morning in the airport. There was a huge crowd and most importantly, white people. I had never seen myself any white people before. In the lounge, Dipti, wife of Pierre Marchand was speaking to us in Chakma with a microphone. She was

explaining to us about the adopting French families. Amidst the huddle, the number of the 72 children slowly started to disappear one by one. I became really worried. All of us believed that we were going to stay together in another orphanage. I also wanted to stay together at least a little more. But here, they were leaving one by one in company of some white adult persons.

I suddenly saw two white persons, a woman with short hair and a man with moustache and brown hair approaching me. They were Martine and Bernard Zadjian who later became my adopted parents in France. The moustache reminds me of the settlers Bengals who are next to our village in Panchari. I was really afraid. More importantly, I did not speak any French, nor English and they speak no Chakma, the only language I was able to speak. It was a miserable situation!

My first impression of them was that they appeared to friendly people. In case they were talking to me slowly and tenderly even if I did not understand a word of their talking. I was surprised by many things. Already, the rain the cold appeared to me very weird. It was drizzling. In Bangladesh, we were used to torrential monsoon showers.

My future parents took to their car. In CHT, I never rode on a car. It was really stupefying to see so many cars everywhere. I was also worried where they were taking me. My brain was rumbling! The sudden separation from the other children was brutal to me and I was totally lost. Everything seemed so different from what I used to know in CHT and in the refugee camps. I remember my mother Martine giving me a meal of chicken with some rice which I quickly ate in the parking. My father Bernard started to drive the car but a little later, Martine replaced him. This was total surprise to me. In CHT, I never saw a woman riding on a bicycle, let along driving a car.

The journey took several hours to reach Martigues in southern France, not far from Marseilles, from Paris. I slept during most of the journey. When we arrived home it was late, already dark. I was alone with them. My future mother took off all my clothes; these simply quickly disappeared. I believed she threw them into the trash. I think she did it because of fear that I could become sick from the dirty clothes. And she was right on this. After that, my father gave a shower with soap, rinsed all my body as if I were a four year old child.

Both of them tried to talk with me. I believe they first told me their names. I did not understand anything. A little later, three children joined us; a boy who appeared to be a little younger than me and two girls. All three offered me some gifts on the occasion. They introduced themselves to me, which, again I did not understand a word. They surely had told me their name and age. Afterward, they showed me the home.

Can you guess what surprised me most at first in France? You cannot. It was neither our home, nor planes, nor the peoples. It was food! Does it sound ridiculous ? In CHT, everyone keeps a stock of rice at home. In France, in my new home, I did not find any rice stock nor other food items! There were no paddy fields nearby and in the shops, I never saw a sack of rice. But how do people still eat? It was the most important concern to me. I was afraid of dying from hunger.

Only slowly, I came to realize that people in France do not live with a whole stock of rice. Rather they buy when they need. But how do the shops replenish their stocks when there are no rice fields in France? Much later, I came to know about international trade; that the items which are not produced in France, are imported from other countries. No wonder that I never saw rice stock. Neither in my new home nor in shops.

I also saw snow for the first time in my life. Everything is white. I first thought this was sugar. Sugar everywhereI I even tasted myself. It was cold! Ha ! So it is, snow ! I started to discover new things every day and all the time.

Life and Study in France

Learning French was quite difficult for me, as is with all the foreigners. Even though, I was able to learn French rather quickly. I started to go to school immediately after our arrival in France. But it was quite an exercise. Outside environment was cold, with freezing winds in October/November, whereas in CHT, it was always hot. With my school bag on my shoulder, I started to go to school with my mother accompanying us; me, my brother Arnaud and my younger sister Emilie.

I found myself in a class with young children. I was the oldest in the group. The first day of school was quite funny. It is difficult to explain it now how I felt that day. It was clear that I was way behind the others in school lessons. When the bell rung, everyone huddled to the class room and took seat on their chairs. I simply followed them. The name of the class teacher was Madam FINETTI. She was a nice young woman but too me, at first she seemed to be quite strict. In the class room, everyone took their seat but I stayed standing. She addressed me and tried to start a conversation. I think she said something like “do you speak English?” and other words to see if I understood English. I just remained totally silent. Not a word came out of my mouth. In any case, I did not understand anything. Everyone, by now, was staring at me. I cannot tell what the other children were thinking of me. But for me, I was a catastrophe. A shame! I believe the children saw, for the first time in their life, someone like me. I could neither speak French, nor English nor any other language than Chakma and some words in Bengali. Whereas, they did not

understand a work of Chakma, nor Bengali. The school was going to be difficult.

During the class break, everyone came to see me. I was the new student. I come from a faraway country; Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. A country faraway and lost. No one has any idea where Bangladesh is. Some of them tried to speak with me. I was incapable reply anyone. A girl in the class, named Constance, tried to help me. She stayed near me and even shared her tiffin with me. She also helped in the class lessons.

I started to go to school regularly. I started to make good progress in French and also in the other subjects. My mother helped me a lot. I progressed quickly in the school; from class I, I was directly promoted to class III and the following year, to class V. From class VI onward, I followed regular school calendar. I completed my baccalaureate in a single attempt.

This is thanks to Parbatya that I could come to France. It is also important not to forget the initiatives by Pierre Marchand and Bimal Bhikkhu. I shall remain ever grateful to my parents in France.

Our story – the 72 children – remains unique in the history of the Jumma people in CHT. As a child in the refugee camp, I was living in a situation like dark age. This is incredible to see where I am now. With the other fellow Jummas in France, I talk often about the future of CHT and our brothers and sisters who remain there. Life there has not changed much. Even after several decades I had left for France.

At this moment, beginning of the 21 century, we need to be aware of our duty and responsibility towards CHT. We are privileged to be in France. We have here a relatively safe and secured life whereas many in CHT are still subject to abject poverty and lack of security. The violence has not stopped yet.

Rather, it has taken more sinister turn. The Jummas are now divided into factions and they continue to fight one another. This is a shame.

Today, I take it as mission to continue to work for the CHT and to help as many poor children as possible.

A Personal Journey to the Discovery of the Chittagong Hill Tracts and its Peoples

Elisabeth and Paul Nicholas

Thursday, 19 November 2009. Here we were in front of the courtyard of Parbatya with Smriti Bikash. It was an emotional moment for him and also for us. It is there that the children of Parbatya gathered together under the surveillance of the army. Around them were gangs of Bengali settlers menacingly nearby. Smriti was telling us, sometime with a smile in the presence of his wife and son, this very tragic episode of his life in the Parbatya Ashram before finding shelter in the refugee camps of Tripura, India. He was showing us the locations of the different buildings; hostels, dining hall, temple and also football playground. Of course, there were no more any such buildings, burnt into ashes as soon as after the children had fled.

This very painful episode, both for him and for us, is at the origin of an encounter that has changed our life. Elisabeth and me, together with our 4 children, decided to respond to an appeal of the NGO “Partage avec les Enfants du Tiers Monde” that were looking for ‘provisional’ host families to receive children who took shelter in refugee camps in India and who previously fled Chittagong Hill Tracts, Bangladesh to escape

from the ongoing conflicts in the region. We said ‘yes’ without ever thinking this response would take us in the future.

That response opened us to a completely new culture, a new people - the Jummas - and led us to discover the Chittagong Hill Tracts about which we had little reason to worry for. That response, given quite many years ago, took us finally to the Chittagong Hill Tracts in 2009 to see by ourselves the beautiful region and it’s even more beautiful people and their culture at the invitation of Smriti, our adopted son and his Chakma wife, Nila. We received a warm welcome everywhere we went. We were the parents of Smriti and Nila from a far away country and understood immediately that we were part of the ‘family’. Jino, the only son of Smriti and Nila was two years old at that time and he too, was visiting land from where his parents originally came.

We discovered the beautiful topography of the Chittagong Hill Tracts. All the Jummas we met in France before going to Bangladesh, always proudly described to us how their land is so beautiful. We were sceptical about their views. But no! They are true absolutely. This land, the region of Chittagong Hill Tracts, seduces immediately its visitors; how to forget the chains of hills and mountains, the serpentine rivers and streams, the villages on the perch of the hills and in the valleys, the muddy trails leading to the villages, the beautifully dressed women in their traditional clothes. One may make the list still longer!

We lived through intense emotional moments. We also met, for the first time, the mother of Smriti. We can very much tell that even without knowing a word of Chakma language, we had a genuine communication with her. I still remember Elisabeth and Smriti’s mother laughing loudly at the playful tricks of Jino. We could see how much Smriti’s

mother was looking into Jino's face to re-discover the image of Smriti who had left her at a young tender age long time ago. She was so happy to see that Smriti now had a family in France and understood that the circumstances of life has given us a beautiful gift - Smriti – who is now our son as much as hers.

In her company, we travelled long routes in shaky vehicles on roads full of potholes all across the region. We came across all over very passionate encounters.

A little later, we went to Langadu, to the house of the grand-parents of Nila who raised her after the death of her parents. In the house, there was a photo of Nila when she was 15 years old. The photo was fading and around it there were the photos of mother Theresa, a revered Buddhist monk and an image of the Buddha. We could feel how strongly they are attached to their grand daughter.

We went to visit the places where she grew up; her village, the sources from where they family used to collect water, the fruits orchards the family used to cultivate with trees of pomelo, guava, banana, papaya, etc.

We also went to see the school where she studied when she was child and where, much later, she also worked as teacher. There were a few hundred children, all in their school uniform. As soon as we entered the classrooms, all stood up in respect to us. It was an impressive image to us; to witness the discipline of the pupils and the respect to us as guest.

Before leaving for the Hill Tracts, we visited the big, tall buildings that decorated many neighbourhoods of the city. Many of these buildings are used for garments factory. Nila, herself, had experience of garments factories in Chittagong and she explained to us the harsh and often, inhuman conditions, which the poor women endure in their work.

These were through such series of episodes that we could understand the life of Nila and what the young generation of the present-day CHT often face.

Once went to a place called Marishya in company of Nila's family and Smriti's mother. It was to join in a funeral ceremony of a person, who died a few days ago. The simplicity and serenity of the event was moving to us. Very solemn decorations. Sombre religious rites. The offerings of flowers, incense and other items. Of course, we could not fully grasp everything but it revealed to us the central place Buddhism plays in the life of the people, particularly the Chakmas.

We have always admired the tolerance and the openness of the people in the region. When Bimal Bhikkhu came in France, we met him. We asked him what we should do about the religious education of the adopted children and in our case, for Smriti. We shall always remember his response; "I trust your wisdom. What is important is that they become good human beings, citizens of the world and that they receive a good education".

During our trip, we have really discovered the rich cultural traditions of the Jummas, in particular the Chakmas. To see a Chakma woman working on waistloom to weave a beautiful pinon was an unforgettable experience. The dexterity of her fingers. Suave judgement on the motifs that combine the various colours and the texture. We also came upon an old man who was capable of writing in Chakma alphabet. He recounted the proud history of the Chakma people, their determination to struggle, their adherence to the Buddhist principle of tolerance and non-violence.

The last big trip we made, took us to Feni via Khagrachari and Panchari, also in company of Smriti's mother. We went to visit one of Smriti's uncles who had a large horticultural

plantation. There, we could see the border between India and Bangladesh and the recently constructed barbed wire wall. There, we also came to realization the arduous trekking that Smriti, as a young boy, had to make when they were fleeing from the violence raging in the region at that time. The treacherous tracks amidst the hill slopes are still traceable but the forests of that time are now largely decimated and replaced by dense shrubs and bushes. We could easily imagine what a horrendous experience it must have been for the people, particularly women and children, to undergo such a long journey to save their life.

Everywhere we went, we immediately felt the warmth of the people and soon came to the realization that we're now part of this large family of the 72 children.

The experience of these encounters has raised my interest to know even more about the CHT, its proud peoples, their rich cultural traditions and their determination to safeguard their identity. I have, thus, recently started a project in collaboration a university faculty which will surely end with the publication of a book. I continue to closely interact with the 72 most of whom are now married with families and children, and also the families who received the children. This is such a wonderful journey. An experience that mutually benefits to all and enriches us to be better human beings.

As part of this project, Elisabeth and me, we have interviewed many of these 72 children and their adopted families. We are often moved to hear them; stories which are sad to hear but often, are also so passionate. They all follow now their professional career. Many are successful and are very proud of what they have achieved. Most importantly, we

see how strongly they remain attached to their ancestral land and cultural traditions.

By receiving Smriti, we did not only accept a young boy who became a member of our family, we also have joined to this vast and rich network of friendship and mutual affection. We often find a Chakma friend or Tripura friend in France or in Bangladesh. All are very proud of their culture and history. What made us to respond to the appeal of Partage? We have never thought thoroughly at that time. But when we try to take a stock now of our experience over the past years, we are so happy and grateful to see that Smriti was a generous gift to us. Because of him, we have made new friends in France and beyond. This has allowed us to know a very proud people and their rich cultural traditions. We take the vow that this culture continues to flourish in the time to come. Bangladesh will be even richer then.

A Family Reminisces…

Martine and Bernard Zadjian

9 months. The length of a pregnancy.

9 months between January 17 and October 6 1987. On that January day, snow had fallen on Martigues, a very exceptional event in the South of France. The day before, we had received the news: “they are coming!” We would be going to get Sueiti at the airport in Paris. We were very excited and couldn’t wait!

Ready to go!

But just at the last minutes, the phone rang. A dramatic turn of events had occurred; the plane had taken off with 72 empty seats. The children had not got their passports because of a diplomatic imbroglio between India and Bangladesh.

We finally received a letter in October 1986 from the association “Partage avec les Enfants du Tiers-monde”, signed by Pierre Marchand, asking us the following question: “Is it possible for you to host a child between 5 and 15, a “war refugee”, for a period which is not yet determined?”

Well, in the 80’s, our family with three young children, had reached a form of serenity and stability. This had led us to look into the possibilities of sharing that security with a child who had not been lucky enough to have it. Adoption or hosting a child during the holidays, both were realistic

possibilities for us. Both of us were teachers and we were allowed to choose both options.

We fulfilled the required French legal conditions for adoption or temporary hosting. The condition was to have at least 2 children of our own to facilitate the boy’s integration into his newly adopted family. We gave ourselves 10 days to think it over before agreeing. But we could not agree without the consent of our three children. Catherine was 10, Arnaud 8 and Emilie 5. They asked us lots of questions about why this child was coming to France, his origin, his appearance, his skin colour… We told them that they could think about it later when the boy himself joins us as a new family member. All three were very enthusiastic about the idea and it was with great joy that we applied to host a child.

In 1987, a campaign was launched to bring the children over to France. It was run jointly with ‘Partage’ and by the families who had decided to host a refugee boy. The association ‘Familles d’accueil’ (trans. Host Families) was created and chaired by Mme D’Hautuille. Thousands of letters were sent, a petition was signed by a number of political and religious personalities, members of civil society, artists and writers. The national and regional media, television and press were alerted.

The host families were very active and many articles were published in the regional newspapers.

In our region (Southern France), the newspaper ‘Le Provençal’ came to each of the three host families’ homes; the Nicolas’, the Gays and ourselves. On April 19, 1986, they published an article. We and our children went to Paris to meet with the other host families from all over France at the request of a monthly magazine to pose for a photo all together which would be published with that of the 72 boys we were waiting for. It was the first time we had met the other host families and it was a very encouraging and inspiring

meeting. We went back home strengthened in our desire to bring over those children.

But, there was the period of 9 months wait! It seemed very long and was trying for us. We went through periods of hope and discouragement as the negotiation to bring the children in France vacillated between three countries: France, India and Bangladesh.

****

Finally, the good news came! The plane had taken off with 72 boys on board and would soon be landing in Paris the next morning; Tuesday October 6 at 7am. We quickly arranged for our children to stay with friends and without wasting a second, we drove to Paris, 800 km. away from our home. In our luggage, we took warm clothes for Sueiti and a rubber ball.

On October 6, early in the morning, we met with all the families who assembled in the big hall of the airport, divided by regions where they live. There was great excitement in the group despite the early hour and the grey sky. Martine was nervous; she was waiting for the children to appear on the tarmac to be absolutely sure of their arrival. Bernard was serene but excited by the very imminence of the moment. “There, they are!” All the necks stretched out towards the entrance of the hall.

Pierre Marchand, the Venerable Bimal Bhikkhu, Mr and Mme D’Hauthuille, and others guided the children towards their families. Sueiti was distressed and tired. He was not smiling. He was lost among all the families and their friends, the journalists and the Secretary of State for Human Rights. He had left everything of his faraway native land to seek refuge in a new country. France was his new home now.

“Wow, how skinny he is!” That was the first thing that came to my mind. Our first contact was a little hesitant, awkward: the hug, the kiss…… not very appropriate! (Bernard)

“I had thought over many times in my head. And when Sueiti was in front of me, I didn’t know whether I should kiss him, hug him……..” (Martine)

Sueiti slept in the car most of the way back. We first showed him the house and his bedroom before going to pick up the children. Arnaud gave him a clown’s face which he had drawn to welcome him. Sueiti smiled for the first time.

During the evening meal, Sueiti avoided the Indian dishes and chose Western food. He surprised us all by cutting up his pear with a knife and fork. “Maybe he’s the son of a prince!” said the kids, in raptures.

“Unfortunately, I have very few memories of Sueiti’s arrival in our home. Could it be because of my young age (6 years old) or more than likely, because of my sieve-like memory? But I know that at the time, I was very impressed by Sueiti.” (Emilie)

“When you arrived in France, I discovered a skinny boy with wide-open eyes. I could feel the fear in your eyes… and the exhaustion. I really felt sorry for you, thinking of the pictures of starving children in the world. I think that feeling has never left me since. I have always felt great empathy for you, to the point where I could no longer bear the difficulties you had been through or that you are still going through today.” (Arnaud)

“After 2 days’ waiting at a school-friend’s house, I come through the door of the flat. There, casually lying in an armchair was a thin boy in a familiar dressing-gown. I was immediately charmed by that jovial face and radiant eyes. Then I noticed the comic strip that he was holding open in

front of him, it was upside down and that sparked off our first laughs together.

From the very beginning, I was sure that all would happen very naturally, that Sueiti was already part of the family. He seemed nice and kind.

Then during the first night, I heard Sueiti and Arnaud laughing in their bedroom even if they did not share a single word of the same language.

My strong feeling as the older sister was bounced with joy as I knew at that point that Arnaud (the only boy among the siblings until then) had found a brother and a playmate.

Then, later on, we four kids shared endless games in the cottage, wild games of tarot with dad as the 5th member, and games of doubles at tennis.

Now as an adult, I am aware of the real treasure of this relationship and of the feeling that my brother's arrival was so natural, so normal." (Catherine)

"The first time I saw you with no clothes on, I was curious to see the two strings that you wore around your waist and your wrists, without ever daring to ask where that could have come from." (Arnaud).

"I gave him his first shower. Sueiti was not used to tap water. I was utterly shocked how skinny he was; his knees were bigger than his thighs!" (Bernard).

All these first times! The whirling of the water in the toilet was a wonder to him. Electricity surprised him and he played with the light switches to make the lights go on and off. At 4 o'clock in the morning, he would be watching television in the drawing room. He would move back with apprehension when he saw the movement of the sea, the waves worried him and he expected to see crocodiles. He thought the snow at the side of the road was sugar and promptly took his hand away on touching it.

It was a period of learning of which we have very fond memories. And yet, Sueiti remained very reserved; he did not address us, adults, but communicated with the children. Undoubtedly, a culture which respects its elders is the reason why he kept his distance from us.

****

On December 20, all six of us left for Paris, we had been invited by the National Assembly for a Christmas party along with the other host families. It was enchanting, as much for us as for Sueiti! There among the gold and the crystal chandeliers in the ceremonial room, we were experiencing a true fairy tale.

By December 1987, Sueiti had learnt to read and knew enough French to make himself understood and to understand us. He taught us that his first name was actually Sueiti and not Shaddan, as his papers indicated.

He filled up whole pages of drawings representing armed soldiers. At night, Arnaud, who was sharing a bedroom with him, heard his nightmares. Six months after his arrival, he burst out crying. He could no longer bear to be consoled and locked himself in the bathroom for ages.

"I was not very curious about your origins; I didn't dare ask you any questions thinking it would be too difficult for you to talk about your nightmarish memories. I have a very strong memory of a nightmare you had when we were in the same bedroom. But also stories about witches and various other things which I listened to carefully and which scared me a bit nevertheless.

I loved it when we both kneeled down, you in front of the image of Buddha and me in front of mine of Jesus, and we said our prayers. Your way of praying intrigued me." (Arnaud)

****

The support by our three children, the local school where the teachers were waiting impatiently for him (the headmaster did his utmost to get him to talk with the local Provençal accent) along with the fellow children from the area, all this helped Sueiti to rapidly find his marks in this new environment.

"In the school playground, I was very proud to be his little sister; during the "fake" battles under the covered playground, Sueiti was the boy to challenge. But no, even when there were several of them, he always won the fights. I can picture my brother standing with 2 or 3 kids clinging to him, trying to destabilise him. But he stood his ground and always ended up by forcing them, one by one, to the ground.

"At school, I don't have many memories of us; we each lived our lives separately".

At middle school, you fought with a Roma boy who came to study from time to time but who everybody feared.

The fight lasted for ages and was overwhelming. I don't think either of you won and you became friends afterwards. I seem to remember that one of the tough nuts of the school had even said to me that he would protect me if I wanted him to, because of the admiration he had for you.

Then we didn't go to the same high school, so we lost contact, a little." (Arnaud)

Sueiti worked well at school in spite of his difficulties in mathematics. By working hard in the school holidays, he caught up and passed his baccalauréat at the normal age of 18.

He discovered the diary of Anaïs Nin in grade 12. This was a good thing for he started to write his own diary. He could express everything that he did not tell us. Sueiti was secretive and we suffered from not knowing his feelings or being able to help him.

****

We spent our holidays and weekends in the country, in a region of hills and woods. This little natural paradise was a great playground for the four children and, for Sueiti, the opportunity to renew contact with his life in the hills of CHT. His brothers and sisters marvelled at his agility.

"His dexterity in the trees also impressed me. At our cottage, lost in the scrub of the Luberon, I remember how Sueiti would climb up an oak tree to heights which we never dared to go to. I wondered how he managed not to be scared just at that height! Then, just to show us how simple it was, and that there was no need to be scared, he came close to the edge of a branch and jumped from that tree, caught hold of the branch of a neighbouring oak and climbed down that one... Well done, brother!! Shame he didn't go on climbing, he would have been a champion!" (Emilie).

"At the cottage, we would have great cherry stone battles. We would explore the vicinity. We would play at scaring each other during the night in the forest. We would climb trees like monkeys. Great times indeed." (Arnaud)

"We would go windsurfing together, but your energy didn't allow you to use the wind easily. I would have loved to tack with you out at sea, alone in the world. In the end, I don't think we shared the same interests. But we used to fight a lot, which I couldn't stand because you controlled me each time very quickly with only two fingers. We also used to try and catch each other playfully before having a shower, we often used to laugh." (Arnaud)

We regularly met with the two other host families, the Nicolas' with Sriti and the Gays with Smritimoy. The country games, playing ball allowed our uprooted children not to feel too isolated. Being keen hikers, we organised a few outings with other families; the kids enjoyed the makeshift camps during which they could give free rein to their endless energy

with collective games. But Sueiti did not understand how we could enjoy walking for walking's sake, whereas we had far more sophisticated means of transport at our disposal. For him, walking remained a means of survival and not a pleasure.

Big gatherings, like the camp in July, were organised in the mountains with 27 other children along with their brothers and sisters and their host families, so as not to cut off the bond which had united these children for more than a year.

****

In 1992, Sueiti was 13. He wanted to have the same name as us. We talked to him about full adoption and its irreversible character. He was sure of himself. We started the adoption procedure which was simplified as we were his tutors. Catherine, Arnaud and Emilie wrote a letter in which they agreed to have Sueiti as their brother. And on December 9 1992, Sueiti officially became our son. His birth name was given back to him.

"In March 1991, I was on my own at home when I received a video cassette from the association "Familles d'Accueil." I watched it. Adult Chakmas were sitting on the ground and listening to Pierre Marchand and Bimal Bhikkhu. They talked, then each adult spoke in front of the camera. A rather tall long-faced man expressed himself. I picked up the word "Sueiti" a few times; I turned it back and listened again. It was really "Sueiti" that I heard. I guessed this man was his father and that he was sending him a message. I was very moved. I decided to leave the cassette of this man and wait for all the members of the family to come home. Without preparing them for what they were going to see, I sat them down in the drawing room and put the cassette on. I could not take my eyes off Sueiti. "My father! It's my father!" There was

nothing else to add, I am still overwhelmed by emotion today." (Martine)

From that day on, we did all we could to come into contact with Sueiti's family. And in July 1994, Sueiti, along with Bernard, met up with his father Pulin and his mother Conica at the Bodhicariya orphanage in Calcutta, after 7 years of being separated. Sueiti's parents had a leave of 8 days to stay outside the refugee camp.

"The meeting was moving; after the first long emotional moments, Sueiti got a real telling off from his parents (especially his mother, I think) because he had almost completely forgotten his mother tongue. As for me, I tried to communicate with Pulin in my very imperfect English but which matched his quite well even if his was a little better. On the other hand, it was more complicated with his mother for we had no words in common, only glances. She smoked the traditional water pipe (the daba) quite heavily, and I quite liked the pipe myself; Konica observed me for a long time with my pipe in my mouth until the day she asked me to let her try (but apparently she did not really enjoy it!). I also remember a day when we visited Calcutta in the rain, we (Sueiti and I) wearing hiking boots and Konica in flip-flops wading in 10 cms of muddy water. Sueiti absolutely wanted to offer his parents a hearty meal with meat in a Calcutta restaurant, and it was a very successful day all round. It was monsoon time with temperatures reaching almost 40°C; when the raindrops reached the concrete structures, you could hear a hiss of immediate evaporation! The goodbyes were very hard for Konica, and undoubtedly for Sueiti; when would they see each other again?" (Bernard)

Pulin, Bernard and Sueiti wrote a contract which defined the help that we would bring to the family along with few French friends, help that would be continuing until the

refugees reached their village. On his coming of age, Sueiti would go to the CHT himself when his family also could return to their ancestral home from the Indian refugee camps. He would undertake projects like buying a rice field, installing a pump, digging a pool.

It was during these missions that he met the young lady who has become his wife, Kajola. They have given us two wonderful grandsons, Tony and Hugo. We look after them during the school holidays and have great times with them.

****

When he grew up, after the age of 18, Sueiti felt the need to meet with his fellow Chakma brothers in France, those who experienced violence, exile and the same trauma as him. He met them at Arunjyoti's house in Saint-Martin-de-Crau.

Sueiti had been abandoned so often and suffered so much and we under-estimated the gravity of it. We did not always understand his needs and did not always react fairly to his problems. In 2013, he wrote an autobiography in French, "Chakma, an orphan of the Hill Tracts" in which he tells the story of his life from his childhood until his departure for France. We were shattered by his revelations, the horror he had been through. In it, he also expressed the joy of experiencing a peaceful childhood, in close affinity with the rhythm of nature and the fondness for his family.

When we asked him why he had never spoken of this past, he answered: "you wouldn't have believed me, you would have thought I was exaggerating."

"Over and above all these memories… I love you more than anything in the world, just like all the other members of our big beautiful family, and I am also counting your family who are still back home… a big family… with all their stories." (Arnaud)

We are now grandparents and heartily wish for the happiness of our children and grandchildren. We know that Sueiti will never forget his past in Bangladesh and that he is still very pre-occupied by his family's destiny. But we hope that he finds peace. May our love, however imperfect, help him to find it.

****

Adoption of a boy from Chittagong Hill Tracts; Testimony of a French family

Marie-Claude and François Rubin

We can write an entire book on this topic to recount the joy, difficulties and anguish. So many anecdotes. So many tell-tale stories to tell. To much joy and emotion to share with. The story is about the battle for adopting a Chakma young boy from the refugee camps in Tripura state, India, who took shelter there to escape violence from his native region of Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.

This is also a story of an unimaginable adventure that life has given us; to adopt Arun Jyoti and later, Lakkhi Shanti. It's also about a relationship that binds us mutually in support of the tribal people in the CHT from where they both come. These actions continue to endure through our association "Peoples des Collines" (Peoples of the Hills).

In 1978, we received an appeal by the French NGP 'Partage' to sponsor a child from the third world; India, Bangladesh and other countries. We accepted to sponsor a child. Our objective was to help know and share with our 4 biological children about the luck they have in France and that many other children around the world are not so lucky.

In 1983, we created the first local support group of Partage in Lyon and became more involved to mobilize more humanitarian support for poor children in the world. From

that point, we took up a key mission; to find more sponsors among our extended family members, friends, friends' of friends and so on. The group becomes larger and soon we were able to find about 150 sponsors, in particular for the Bodhicariya school in Calcutta, India.

In 1986, violence erupts all over the CHT region. Particularly bloody and violent incidents took place which forced many tribal peoples to seek shelter in refugee camps in the state of Tripura, India. The refugees would stay in the camps till the end of 1997 and could only return following the signing of the CHT Peace Accord.

In these waves of violence, the orphanage 'Parbatya' was also destroyed. The children and the staff fled where they could. Many found themselves in refugee camps in Tripura, India while a small number could come to Moanoghar much later. It is Pierre Marchand and Bimal Bhikkhu who, at first, had the idea to bring the children in France who had been previously sponsored by Partage.

72 visas were immediately delivered by France and appeal was launched to the members of Partage to host the children temporarily. We were already deeply involved as volunteer with Partage. So, we immediately agreed to receive a child in our family. But, the wait for him was long and took almost a year. Three governments had to agree on the modalities; Bangladesh, India and France, to take out these 72 children from the refugee camps.

6 October 1987, all the French families were at the Paris airport with the expectation to finally see the face of the child who we had been waiting so long. We were happy that we were personally going to be witness to help a child from the Third World who we had been already supporting for a long time through various means.

We were happy to have Arun Jyoti among us. We greatly appreciate his humane qualities, his charisma, all of which has given further strength and conviction to our activism in the field directly with the CHT Jumma people.

But, we also would like to share also here our problems and the difficulties with Partage. We were dismayed by the discovery later of wrong information and more importantly, by the absence of subsequent support and follow up from Partage once we received the child in family;

-Before receiving the child, we were told that the child is an orphan. We discovered it much later that most of them had parents.

-There was hardly any preparation for the children that they were going to live with French families individually. They all expected to stay together as they used to be in Bangladesh in a sort of Parbatya-like institution.

-At the beginning, all of us thought that the children would stay 3-5 years in France after which they would return to Bangladesh to their communities. We had to quickly realize that the stay was going to be much longer as the situation in the CHT rather worsened.

-Their age was false. In some cases, their administrative papers showed 10 years less than their real age. Arun Jyoti and Lakkhi shanti were possibly 19 to 20 years old when they arrived in France, as medical and dental examinational results approved. Later, this was also confirmed by Arun Jyoti's mother. In their passport, they were 11 years only.

- Depending of the age, the level of education also varied. This was particularly a problem for the older children. They could not get into proper classes given their difficulties to learn a totally new language. This led also to further consequences in their future professional orientations. All had the high ambition to succeed but many could not pursue it

given their initial problem in the school. Arun Jyoti, in particular, suffered from years of depression when he realized that he had to learn vocational trade instead of higher studies because of these difficulties.

-About half of the children came with a name which was not their real name given that the initial list kept on changing again and again. New children were inserted in the place of others who decided to opt out and they took the former's name in the place of their real name. Many faced further problems in the succeeding years because of this 'identity crisis'.

So all these misunderstanding provoked des problems for the 'host fsmilies' and also for the children. Many changed their families in the subsequent years and many do not have contacts anymore with their adopted families. We, ourselves, received Lakkhi Shanti, in his second year following problems with his original adopted family. He wanted to be independent and finally decided to live on his own after 5 years of stay in our family but before we could find help him to find a job and accommodation.

How many letters we wrote to Partage to help us with proper counseling but always received the same reply, "you are responsible for the child as host family". It was with much joy and happiness we agreed to receive the child but we remain convinced also that in doing so, we helped Partage too. Our act generated publicity for Partage to grow bigger.

On ours part, we were blessed to have Arun Jyoti in the family. He has a big heart, very warm personality and almost immediately established very good relations with our 4 biological children. This created a feeling of mutual respect with dignity which has enriched all of us as human beings.

Arun Jyoti has been always aware of the strength of the witness. In the beginning, he used to always accompany me in

the meetings with the local group. This was very inspiring for all of us and persuaded us to increase our level of volunteering for the local group. Subsequently, we decided to found the association “Peuples des Collines” which allowed us to remain engaged more substantively, but also with more human touch and without any financial charges for a big NGO like Partage.

Since 1996/97 when the government started to allow foreigners to visit CHT. Following the signing of the Peace Accord, the refugees returned home from the camps in India. But many continue to live in precarious conditions.

Our local group have since established itself as a separate association with the name “Peuples des Collines” (Peoples of the Hills). From 1997, we have been supporting small scale projects in the field. One was a partnership with Bishop’s office of the catholic church in Chittagong who are active in Bangladesh for the 150 years. The other concerns supporting ex-refugees for income generation. These are all small scale intervention, largely for income generation without consideration to any orientations related to faith, ethnicity or creed. We also have supported in setting up medical dispensaries in Barishal and in Tulaban, CHT. We have recently supported Moanoghar in procuring beds for the residential children and also renovation of the residential hostels.

Here is the stocktaking ! A simple sponsorship for Bangladesh, agreed 40 years ago have led us to the discovery an amazing people, a beautiful region and sustained engagement to ameliorate their socio-economic conditions. Life preserves many surprises for us as long as we remain positive to the events.

Much time has elapsed and has helped to overcome much of the past difficulties. The young boys who arrived in October 1987 are all adults now. Many have now their own families.

They all work hard and put hope on their children so that they will pursue higher studies which they could not do because of various difficulties.

This is our testimony. This is what we lived through, ourselves. We are immensely grateful to this wonderful discovery. We now have a big family of the ‘72’ and we keep strong relations with each one of them. It has helped us to enrich and grow ourselves, among and between all the members of this big family.

What conclusion may we draw from this fantastic adventure ? Help the people to grow themselves amidst the environment they know intimately. This is the way forward for nurturing their sense of identity with honour, joy and dignity.

Marie-Claude et François Rubin
20 Novembre 2014, Ternay, FRANCE

সদ্ধর্ম চেতনা ধারণ করতে হলে সাধারণ শিক্ষা অপরিহার্য

সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের

[সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরর জন্ম ১৯২৫ সালে। তিনি এখন বাংলদেশের উপসংঘ রাজ। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম শহরের নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করছেন। বয়স প্রায় ৯০ বছর। বুদ্ধের একনিষ্ঠ শিষ্য হিসেবে তিনি কেবল ধ্যান-সাধনায় মগ্ন থাকেননি। ধর্ম সাধনার পাশাপাশি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষে, বিশেষ করে শিক্ষাহীনতা দূর করতে তিনি নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বয়স তাকে এখনো কাবু করতে পারেনি। এই বয়সেও তিনি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়ান সদ্ধর্ম প্রচার তথা মানুষের দুঃখ মুক্তির দেশনা দিতে। তার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলায় বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহারকে কেন্দ্র করে ***পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম*** ও রাঙ্গামটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলায় রাঙ্গাপানি মিলন বিহারকে কেন্দ্র করে ***মোনঘর***'সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। মোনঘরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মোনঘরের ৪০ বর্ষপূতি উপলক্ষে মোনঘর সম্পর্কে তার মূখ থেকে শুনতে গত ০৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের মহোদয়ের সাক্ষাৎকার নেন মোনঘরের নির্বাহী পরিচালক অশোক কুমার চাকমা ও স্পনসরশিপ কর্মকর্তা নন্দ কিশোর চাকমা। তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হয়। সেগুলো কিছুটা সম্পাদনা করে চুম্বক অংশ পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হলো।]

প্রশ্ন: ভান্তে, অনেকদিন পর আপনার সাথে দেখা হলো। আপনি কেমন আছেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: বয়স হয়েছে। ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদে কোন মতে আছি।

প্রশ্ন: আপনার সময় কীভাবে কাটে?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: বই পড়ি। ফাং (নিমন্ত্রণ) গ্রহণ করি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই। গাড়িতে করে যাওয়া অনেকটা সহজ।

প্রশ্ন: ভান্তে, আমরা জানি আপনার সারা জীবনের কর্মের ব্যাপ্তি অনেক ব্যাপক। এ পর্যায়ে এসে আপনার জীবনের কর্ম নিয়ে আপনি কী সন্তুষ্ট?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: ...ভাল কাজ সমাজের জন্য মঙ্গলজনক। সংবর্ধনা দেওয়া হয় আমার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে, মানুষের ভিতরে যাতে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হিসেবে লোকজন এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন।

প্রশ্ন: ভান্তে, পাঠকদের জানতে ইচ্ছে করে আপনার শৈশব সম্পর্কে। একটু বলবেন কী?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: আমার জন্ম ১৯২৫ সালে চট্টগ্রাম জেলাধীন রাউজান থানার অন্তর্গত উত্তর গুজরা ডোমখালী গ্রামে। আমার বাবা পুলিশ বিভাগে চাকুরী করতেন। আমার বয়স যখন দেড় বছর তখন মা মারা যান। ...ডোমখালী গ্রামের পাঠশালায় আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এখানে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করি। তারপর বিনাজুরী নবীন এম.ই স্কুলে ভর্তি হই। এখানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করি। এরপর ৩-৪ বছর পর্যন্ত আর কোন লেখাপড়া হয়নি। পরে শ্রামণ অবস্থায় মির্জাপুর হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই এবং সেখানে প্রবেশিকা পরীক্ষা (এসএসসি) পর্যন্ত পড়ালেখা করি। সেটা খুব সম্ভবত ১৯৫২ সালে।

প্রশ্ন: ভান্তে, আপনি কখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: আমি তখন জোবরা গ্রামে ছিলাম। ঐ গ্রামের সুগত বিহারে ১৯৪৪ সালে শ্রামণ হই। এরপর ১৯৪৯ সালে ভিক্ষু হিসেবে উপসম্পদা লাভ করি। ১৯৫৫ সালে মির্জাপুর থেকে রাউজানের বিমলানন্দ বিহারে গিয়ে অবস্থান করি।

প্রশ্ন: ভান্তে, আপনি চট্টগ্রাম ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। তখন তো পার্বত্য চট্টগ্রাম খুবই দুর্গম ছিলো। কেন আপনি পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে অনুপ্রাণিত হলেন এই ব্যাপারে একটু বলবেন কী?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: আমি তখন রাউজানের বিমলানন্দ বিহারে অবস্থান করছিলাম। তখন ১৯৫৭ সাল। একদিন বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত বিমলানন্দ মহাস্থবির এক সভা ডাকলেন। ঐ সভায় তিনি জানালেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ভিক্ষু চাওয়া হয়েছে। কে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে রাজী আছেন তা জানতে চাইলেন। তখন বিমলানন্দ বিহারে আমরা দু'জন ভিক্ষু ছিলাম। বিহার অধ্যক্ষ ভদন্ত বিমলানন্দ মহাস্থবিরকে বললাম, দু'জনের মধ্যে আপনি যাকে নির্দেশ দেন; আমরা যেতে রাজী আছি। বিহার অধ্যক্ষ আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে নির্দেশ দিলেন। আমিও পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে উৎসাহিত হলাম এই ভেবে সেখানে অনেক জমি পড়ে রয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর, সব মিলিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ থাকবে। বিহার অধ্যক্ষের নির্দেশক্রমে একদিন আমরা ৫ জন ভিক্ষু পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সেখানে বিহার উৎসর্গ করা হবে। আমরা ছিলাম ভদন্ত গুণালংকার মহাস্থবির, ভদন্ত জিনবংশ মহাস্থবির, ভদন্ত শান্তিপদ মহাস্থবির, ভদন্ত গিরিমানন্দ ভিক্ষু এবং আমি জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু।

আমরা পায়ে হেঁটে এবং লঞ্চে রাঙ্গামাটি যাই। রাঙ্গামাটি পৌঁছে আনন্দ বিহারে রাত যাপন করি। তারপর সেখান থেকে বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলায় মুবাছড়িতে যাই। সাথে ছিলেন ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু (বর্তমানে প্রয়াত)। তখন চলাচলের পথ খুবই দুর্গম ছিলো।

প্রশ্ন: পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথমে কোন বিহারে অবস্থান করেছিলেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মুবাছড়ি বৌদ্ধ বিহারে। ঐ গ্রামের দায়ক বিন্দু কুমার খীসার আমন্ত্রণে সেখানে যাই। তিনি বিহারের জন্যে ৯ কানি জমি দান করেছিলেন। সেখানে নতুন বিহার নির্মাণ করে দানোৎসব করা হয়। নতুন বিহারে তিন বছর অবস্থান করি। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলে মুবাছড়ির বিহারের ভিটাসহ সবকিছু পানিতে তলিয়ে যায়। সেখান থেকে ১৯৬০ সালে বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহারে যাই। সেই সময়ে দীঘিনালা এলাকাতে কেবল দু'টো বৌদ্ধ মন্দির ছিলো। একটা বড়াদমে, অন্যটা ছিলো দৌলাইমা কিয়াং (বৌদ্ধ বিহার)। বড়াদম কিয়াং-এ একজন মার্মা ভিক্ষু ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন রোগা। আর দৌলাইমা কিয়াং-এ কোন ভিক্ষু ছিলেন না। শুধু মন্দিরটা ছিলো।

প্রশ্ন: ভান্তে, আমরা জানি আপনি সেই দীঘিনালায় বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহারকে কেন্দ্র করে "পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম" এর কাজ শুরু করেছিলেন। আপনার মাথায় অনাথ আশ্রম করার চিন্তা আসলো কেন? এ ব্যাপারে একটু বলবেন কী?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: জনগণের উপকার হয় এমন কিছু একটা করার জন্যে মাথায় চিন্তা ছিলো। কিন্তু কী করা যাবে? তখন কোন ভাল পরিবেশ ছিলো না। এলাকার জনগণ শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে ছিলো। মনে হলো অনাথ আশ্রম করলে সবচেয়ে বেশি মানুষকে উপকার করা যাবে। গরীব, অনাথ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু করা যাবে। কাপ্তাই বাঁধ সবেমাত্র নির্মিত হয়েছে। বহু লোক উদ্বাস্তু। দীঘিনালায় অনেক লোক বাস্তু-ভিটা হারিয়ে চলে এসেছে। এইসব লোকজনের নিজেদেরই খাওয়া-দাওয়ার সংগতি নেই, ছেলেমেয়েদের পড়া-লেখার চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ কোথায়? সেই চিন্তা থেকে অনাথ আশ্রম করার উদ্যোগ নিই। আমি তখন কিছু ছেলে-পেলে বিহারে পড়াতাম। তাঁদের খরচপাতি আসতো মন্দিরের দান-দক্ষিণা থেকে। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে অনেক ছেলে পড়া-লেখা করতে পারতো না। চিন্তা করলাম যে জনসাধারণের (দায়ক-দায়িকাদের) দান-দক্ষিণা দিয়ে আশ্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সেই সময়ে দীঘিনালার এক অফিসার ছিলেন; তার পুরো নামটা মনে নেই, নামের শেষে লস্কর আছে। ঐ লস্কর সাহেব মন্দিরে বেড়াতে আসতেন। তাকে অনাথ আশ্রম গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানালাম। তিনি আমার পরিকল্পনার কথা শুনে বেশ উৎসাহ দিলেন। তার পকেট থেকে

প্রথম ১০০ টাকা অনুদান দিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন মহকুমা অফিসারকে (এসডিও) অনাথ আশ্রমে নিয়ে আসার। তার কথা মতে, পরের দিন এসডিও সাহেবকে অনাথ আশ্রমে আমন্ত্রণ জানানো হলো। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। তিনিও অনাথ আশ্রম গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রচন্ড উৎসাহ দিলেন। তার মধ্যে দেশপ্রেম ছিলো, দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো। তিনি বললেন, ইংরেজরা সুদূর লন্ডন থেকে এখানে এসে কাজ করতে পারলে আমরা কেন নিজের দেশে নিজেদের উন্নয়নের জন্যে কাজ করতে পারবো না? এসডিও সাহেব বান্দরবানের মন্ত্রীকে (বোমাং রাজপরিবার থেকে তৎকালীন সরকারের আমলে একজন মন্ত্রী ছিলেন) এই অনাথ আশ্রমে নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানানোর পরামর্শ দিলেন।

প্রশ্ন: ভান্তে, এই অনাথ আশ্রমের কাজ এগিয়ে নিতে কাদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: পরবর্তীতে রাঙ্গামাটিতে গিয়ে জেলা প্রশাসকের সাথেও দেখা করি। তিনি বললেন, এটা তো ভালো কাজ। আপনি সমাজ কল্যাণ অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন। সেই সময়ে সমাজ কল্যাণ অফিসে একজন চাকমা বাবু ছিলেন। তিনি বললেন, বরাদ্দ অনেক আছে, কিন্তু সরকার কাজ খুঁজে পায় না কোথায় টাকা ঢালবে। আপনি বাঙালী ভিক্ষু, আপনার বুদ্ধি বেশি, আপনি জানেন এবং পারবেন কী করতে হবে...। এই এলাকার উপজাতীয় লোকজন সবাই সহজ-সরল এবং বোকা। চট্টগ্রামের হোয়ারা পাড়াস্থ সুগত ভিক্ষুর পরামর্শ চাইলাম - অনাথ আশ্রম করতে হলে কী কী করতে হবে। তিনি বললেন, প্রথমে অনাথ আশ্রমের জন্যে নিবন্ধন অবশ্যই জরুরী। তার জন্যে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এজন্যে ৭-৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। আমি সভাপতি হই এবং বাবু বলরাম চাকমাকে সম্পাদক করা হয়। এই কমিটি দিয়ে রাঙ্গামাটি সমাজ কল্যাণ বিভাগ হতে পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের জন্যে নিবন্ধন নিই। নিবন্ধন প্রাপ্তির পরবর্তী বছরে অনাথ আশ্রমের জন্যে ৫,০০০ টাকার অনুদান অনুমোদন দেওয়া হয়। চাকমা রাজা ত্রিদীব রায়ের সাথেও অনাথ আশ্রম গড়ার ব্যাপারে পরামর্শ করি। তিনি সানন্দে এগিয়ে আসলেন এবং অনাথ আশ্রম করার জন্য যথেষ্ট জমিজমা দান করলেন। তিনি আরও পরামর্শ দিলেন কমিটিতে সরকারী চাকুরীজীবি অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য। প্রথম কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে বাবু শরৎ চন্দ্র চাকমাকে (প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন) সম্পাদক করা হয় এবং আমি সভাপতি হই। এই কমিটি গঠন হওয়ার পর আরো ৫,০০০ টাকার অনুদান দেওয়া হয়। সমস্ত হিসাব-নিকাশ রাখার দায়িত্ব বাবু শরৎ চন্দ্র চাকমাকে দেওয়া হয়েছিলো...

প্রশ্ন: ধর্মীয় ধ্যান সাধনার বাইরে আপনি কেন এই অনাথ আশ্রম গড়ার কাজে মনোনিবেশ করলেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: এই একই প্রশ্ন তখন সরকারও করেছিলো। আশ্রম গড়ার মূল কারণ ছিলো, তখনকার সময়ে সেই এলাকার লোকজন অন্ধকারে ছিলো, শিক্ষার অভাব ছিল। পরিস্থিতি ভালো ছিল না। প্রচুর উদ্বাস্তু ও গরীব লোকজন। তখন দীঘিনালাতে কেবল দু'টো স্কুল ছিলো - একটা বোয়ালখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়, অন্যটা ছিলো দীঘিনালা জুনিয়র হাইস্কুল।

প্রশ্ন: ভান্তে, এই অনাথ আশ্রমের ছাত্রদের কীভাবে সংগ্রহ করেছিলেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: গ্রাম থেকে এসেছিলো। শুরুতে ৩০ জনের মত ছাত্র ছিলো। অনাথ আশ্রম হওয়ার পর অনেকে নানা প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করলো। অনেকে বলা শুরু করলো, ভান্তের কারণে এখন গরু চরানোর জন্য রাখালও পাওয়া যায় না। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, "ভান্তে, অনাথ আশ্রম কারে বলে?" বলতাম, "যার মা বাবা কেউ-ই নেই, তাদের জন্যে"। তখন অনেকে বিভিন্ন ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। অনেকে হুমকিও দিতো।

প্রশ্ন: এই অনাথ আশ্রমের ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কীভাবে করেছিলেন? এটা কী খুব সহজসাধ্য কাজ ছিলো?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: দায়ক-দায়িকাদের কাছ থেকে দান-দক্ষিণা পেতাম। গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে ছেলেরা ভিক্ষার চাউল সংগ্রহ করতো, প্রত্যেক পরিবার এক কেজি বা দেড় কেজি করে চাউল দিতো। অনেকে চাউল ভিক্ষা দেওয়ার ভয়ে আশ্রমের লোকজন দেখলে লুকিয়ে থাকতেন। আবার অনেকে সহযোগিতা করতেন। যেমন, অশ্বিনি মহাজন (বড়ুয়া) প্রতি মাসে এক বস্তা করে চাউল পাঠাতেন।

প্রশ্ন: ভান্তে, আপনি কখন পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: ১৯৭৫ সালে।

প্রশ্ন: কেন চলে এলেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: তখন সবেমাত্র সামরিক বাহিনীর আনাগোনা শুরু হয়েছে। আশ্রম নিয়েও নানা কথা হচ্ছে। তখনকার একজন মান্যগন্য লোক এসে বললো, "ভান্তে, আপনাকে লোকজন বিশ্বাস করে না"। তখন মনে হলো, যারা আমাকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্যে কীভাবে কাজ করি। তাই চলে এলাম। ...দীঘিনালা থেকে চলে আসার আগে দায়িত্ব হস্তান্তরের জন্যে একটা মিটিং ডাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তৎকালীন ব্রিগেডিয়ারের কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়ায় সভা করা সম্ভব হয়নি। খাগড়াছড়িতে এসে সভা ডেকেছিলাম। তখন খাগড়াছড়িতে এক বড়ুয়া স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছিলেন। তার মাধ্যমে সভা আয়োজন করার জন্যে প্রশাসনের অনুমতি নিই। সেই সভাতে আমার শিষ্য ভদন্ত বিমল তিষ্য ভিক্ষু ও ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুকে ডেকেছিলাম। তাদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসি।

প্রশ্ন: ভান্তে, আপনার হাতে গড়া আশ্রমের অনেক শিক্ষার্থী বর্তমানে দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছেন। তারা আপনার সাথে যোগাযোগ রাখেন কী?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের কেউ কেউ যোগাযোগ করে।

প্রশ্ন: ভান্তে, এবার আসি মোনঘর প্রসঙ্গে। মোনঘর প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটু বলবেন কী?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে তখন সরকারী লোকজন দীঘিনালায় বোয়ালখালীতে যেতে চায় না। তখন ভদন্ত বিমল তিষ্য ভিক্ষু এ রকম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে আমাকে চিঠি লিখতো। একবার বনবিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেদিন সেখানে রাত্রি যাপন করি। সে সময় মিলন বিহারের বিহার অধ্যক্ষ আমার শিষ্য ভদন্ত প্রিয়তিষ্য ভিক্ষু আমাকে রাঙ্গাপানি মিলন বিহার পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। এরপর আমি রাঙ্গাপানি মিলন বিহারে যাই। সেসময় একটি সভা আহবান করা হয়েছিলো। রাঙ্গাপানি মৌজার হেডম্যান উপস্থিত ছিলেন। খচ্চুয়া চাকমা ছিলেন। আলাপ আলোচনার পর ঐ মিটিং-এ হেডম্যান খচ্চুয়া চাকমাকে অনাথ আশ্রমের জন্যে জমি দিতে বললেন। তখন খচ্চুয়া চাকমা বললেন, আমি গরীব মানুষ। এই জমি দেওয়া হলে আমি কীভাবে চলবো? তখন হেডম্যান আশ্বাস দিলেন, তার জমির পরিবর্তে খচ্চুয়া চাকমাকে অন্য জায়গা থেকে জমি দেওয়া হবে। খচ্চুয়া চাকমা থেকে ২ একর জমি ৪,০০০ টাকায় কেনা হয়। তারপর অন্য একজনের কাছ থেকে আরো ২ একর জমি ৪,০০০ টাকায় কেনা হয়। বর্তমান স্কুলের সামনে নীচের জমিটা ৪,০০ টাকায় কেনা হয়।

প্রশ্ন: এই জমি কেনার জন্যে টাকা কীভাবে সংগ্রহ করেছিলেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: লোকজন দান করেছে। (হেসে হেসে বললেন) কেউ কেউ গরু দান করেছে অনাথ আশ্রম ও স্কুলের জন্যে। অনেকে এসে জিজ্ঞেস করতো, "ভান্তে, গরু বিক্রি করবেন না কি?" (হেসে হেসে বললেন) "আমি ভান্তে মানুষ, কী জবাব দিই"! বিহার পরিচালনা কমিটির লোকজনকে দেখিয়ে দিয়ে বলতাম, "ওরা জানে"।

প্রশ্ন: ভান্তে, মোনঘর নিয়ে আপনার স্বপ্ন কী ছিলো?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে। চাকরী-বাকরী করবে। সরকারী কর্মকর্তা হবে। স্কুল হবে, কলেজ হবে...

প্রশ্ন: ভান্তে, আপনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেও সাধারণ শিক্ষার উপর সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: শিক্ষার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের কল্যাণ সাধন করা। এটা বৌদ্ধধর্মের মূল শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তা ছাড়া সমাজ কল্যাণমূলক

প্রতিষ্ঠান করতে হলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার জন্য সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। মানুষের নৈতিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটাতে হলে সাধারণ শিক্ষারও প্রয়োজন। মূলকথা হলো, সদ্ধর্ম চেতনা ধারণ করতে হলে সাধারণ শিক্ষা অপরিহার্য।

প্রশ্ন: ভান্তে, মোনঘরসহ আপনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলবেন কী?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন- জোবরা গুণালংকার অনাথ আশ্রম, চন্দ্রঘোনা জ্ঞানশ্রী শিশু সদন, নুরপুর প্রভাতী শিক্ষা, বিনাজুরি ধর্মপ্রতিক অনাথ আশ্রম, গুইমারা অনাথ আশ্রম, জয়পুরহাট উসাই জ্ঞানশ্রী শিশু সদন, রংপুরে জ্ঞানশ্রী বিদ্যাপিঠ প্রভৃতি। সবগুলো প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র প্রাইমারী পর্যন্ত লেখাপড়া করানো হয়। আর্থিক অভাবে এর বেশী করা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন: ভান্তে, আপনার সৃষ্ট এবং আপনারই শিষ্যদের গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে শিক্ষার আলো ছড়াতে পেরেছে যা আজ অবধি চলমান রয়েছে; সাধারন জনগন এমন মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার অনুভুতি কি?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: আমার কথা হচ্ছে শিক্ষা লাভ করলে মানুষের মধ্যে চেতনার উৎপন্ন হবে। ১ জনে ১০ জন শিক্ষিত করতে পারবে, ১০ জনে ১০০ জন এবং ১০০ জনে ১০০০ জন - এভাবে সমগ্র জাতি লেখাপড়া শিখতে পারবে। এটাই ছিল আমার দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রশ্ন: আপনার সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন ও কাজের ফলে গড়ে ওঠা তৃতীয় প্রজন্ম আজ মোনঘর পরিচালনা করছে। তাদের প্রতি আপনার কোন উপদেশ বা পরামর্শ যদি থাকে?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: তারা সৎ জীবন-যাপন করে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করুক। মানুষের ভেতর সৎজ্ঞান উৎপন্ন করে দিক যাতে সবার মঙ্গল হয়। দা দিয়ে ভালো কাজ করা যায়, আবার মানুষও হত্যা করা যায়। তদ্রুপ জ্ঞান বা বিদ্যা দিয়ে ভালো বা খারাপ উভয়ই করা যায়। শিক্ষা দিয়ে মানুষের মধ্যে সৎজ্ঞান উৎপন্ন হোক এ কামনা করি।

প্রশ্ন: ভান্তে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে আপনার কোন পরামর্শ থাকলে?

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: তখনকার দিনে সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিনি, নিজস্ব শক্তি ও চেষ্টা দিয়ে গড়ে তুলেছি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হয়েছেন। সবাই এগিয়ে আসলে একটি স্থায়ী ফান্ড বা তহবিল গঠন করে দেওয়া যেতে পারে, যাতে একটি প্রতিষ্ঠান (মোনঘর) তার কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং দেশের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো কাজ করে।

প্রশ্ন: ভান্তে, অনেক কষ্ট করে আমাদেরকে মূল্যবান সময় দিলেন। মোনঘর এবং দি মোনঘরীয়ান্সের পক্ষ থেকে আপনার সু-স্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামানা রইল। ভান্তে আমাদের বিদায় বন্দনা ।

ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের: তোমাদের প্রতিও আমার আর্শীবাদ রইল।

মোনঘরে সোনালী দিনগুলো

ডা: পরশ খীসা

সালটা ১৯৮৪। আমি তখন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছুটিতে বাড়ীতে এসেছি। হঠাৎ আমার এক শিক্ষক উনার নববধুকে সঙ্গে নিয়ে রাঙ্গামাটিতে আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। স্যারকে কোথায় রাখবো, কীভাবে রাখবো চিন্তায় দিশাহারা। শেষ পর্যন্ত কোন রকমে হোটেল ড্রিমল্যান্ডের একটি রুমে স্যারদের থাকার বন্দোবস্ত করা গেল। এবার স্যারকে রাঙ্গামাটি শহর ঘুরে দেখাতে হবে, তিনি শুনেছেন রাঙ্গামটি একটি খুবই সুন্দর-পরিপাটি শহর। কিন্তু তখনকার সময়ে রাঙ্গামাটি শহরের পর্যটন শিল্প এখনকার মত পরিপাটি হয়ে গড়ে উঠেনি। সবেধন নীলমনি "বেইন টেক্সটাইল"। রাঙ্গামাটিতে, এবং সম্ভবত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে, বেইন টেক্সটাইল উপজাতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠান। সেই সময়ে যে গুটিকয়েক পর্যটক রাঙ্গামাটিতে বেড়াতে আসতেন, তারা কোন না কোন উপজাতীয় বস্ত্র কিংবা হস্তশিল্প সামগ্রী কিনে নিতেন। অন্তত: রাঙ্গামাটির বিশেষ স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে হলেও। এই কথাটি চিন্তা করে একটি বেবীটেক্সী ভাড়া করে স্যারকে নিয়ে বেইন টেক্সটাইলের শো রুম তবলছড়ির ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনীতে যাই। বেইন টেক্সটাইলের সত্বাধিকারীনী মিসেস মঞ্জুলিকা চাকমা আত্মীয়তায় আমার মাসি হন, তাই অতিথিদের খানিকটা আপ্যায়নও করা হলো।

তখন কেউ একজন বললেন, রাঙ্গাপানিতে একটা সুন্দর আশ্রম গড়ে উঠেছে, অতিথিদের সেখানে নেয়া যেতে পারে। তবে কিভাবে যাওয়া যায়? তখনকার যোগাযোগের উপায় ছিল তবলছড়ি বাজার থেকে সাম্পান ভাড়া করে সোজা মোনঘরে যাওয়া (বর্তমান ভেদভেদী থেকে রাঙ্গাপানি পাকা রাস্তা তখনও নির্মিত হয় নি)। তখন আমি তবলছড়ি বাজার থেকে একটি সাম্পান ভাড়া করে স্যারদের নিয়ে মোনঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আধা ঘন্টার মত সময় লেগেছিল মোনঘরে পৌঁছাতে। পাঠক, এতক্ষন উপলব্ধি করতে পারছেন তখনকার সময়ে রাঙ্গামাটির হ্রদে অনেক পানি থাকতো এবং আমরা সরাসরি মোনঘরের প্রেসিডেন্ট ভবন তথা টেম্মাংশালার ঘাটে এসে নেমেছি। সেবারই **"মোনঘর"** নামক প্রতিষ্ঠানটিতে আমার প্রথম পদার্পন। মুগ্ধ

হয়ে স্যারদেরকে সারা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখিয়েছি। স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে মোনঘরের তৎকালীন পরিচালক শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার ভান্তে বর্তমান হাসপাতাল এর জায়গার উপর নির্মিত একটি ঘরে বাঁশের তৈরী কতগুলি খাটে আবাসিক ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করে ছোট ছোট শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন। এই হচ্ছে আমার প্রথম দেখা মোনঘর এবং মোনঘরের স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্র।

এরপর আমি মোনঘরে যাই ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৮৯ এর মার্চে আমার ইন্টার্নিশীপ শেষ হবে। ভবিষ্যতে আমার জীবনের ক্যারিয়ার কী হবে সেই বিষয়ে বাবার সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করি। আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম চন্দ্রঘোনা খ্রিস্টিয়ান হাসপাতালের পরিচালক ডা: এস.এম. প্রু চৌধুরীর সাথে দেখা করবো, সেখানে চাকুরীতে ঢুকা যায় কি না। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করবো আমার প্রয়াত বাবা ডা: ভগদত্ত খীসা এবং ডা: চৌধুরী দু'জনেই সমসাময়িক সময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনা করেছেন। আমার দ্বিতীয় চয়েস ছিল, বাবার আরেক বন্ধু তৎকালীন পিজি হাসপাতালের (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) প্যাথলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বি. আর. খানের অধীনে কাজ শিখে এই লাইনে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা।

বাড়ীতে এসে বাবার কাছে আমার প্রস্তাবনাগুলো বলতেই বাবা বলে উঠলেন, "Why not মোনঘর"?

তখনই জানলাম মোনঘরের চিকিৎসকের পদটি খালি হবে বা খালি হতে যাচ্ছে। আর তখনই আমার মানসপটে ভেসে উঠল সেই ১৯৮৪ সালে দেখা মোনঘর এবং এর গ্রামীণ, নিরিবিলি ও শান্ত পরিবেশ।

আমি পরের দিন দেখা করতে গেলাম মোনঘরের তৎকালীন সাধারন সম্পাদক ও সকল কর্মকান্ডের কান্ডারী শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথের মহোদয়ের সঙ্গে। রাঙ্গামাটিস্থ তবলছড়ির আনন্দ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ হিসেবে তথায় উনার আবাসস্থল। প্রথম সাক্ষাতে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, আমি একজন চিকিৎসক। যাহোক পরিচয় পর্ব শেষে তিনি বললেন যে, অচিরেই মোনঘরের চিকিৎসকের পদটি খালি হতে যাচ্ছে। তখনকার সময়ে কর্মরত চিকিৎসক ডা: শৈ প্রু চাই চৌধুরীর সাথে মোনঘর ব্যবস্থাপনা কমিটির বনিবনা হচ্ছিলো না। ভান্তে আমাকে বললেন, আগামীকাল আমি আপনাকে মোনঘর দেখাতে নিয়ে যাবো।

পরের দিন আমাদের বাড়ীর গেইট থেকে আমাকে তুলে নিয়ে ভান্তে সহ মোনঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাহন ছিল তার সেই বিখ্যাত সাদা রঙের ডাবল পিক আপটি। আর ড্রাইভার ছিল আমার অতি পরিচিত শান্তি ড্রাইভার বা শান্তি আসাম (মোনঘরে তারঁ পরিচিতি "দাদু" হিসেবে)। দাদু ছিলেন আমার প্রয়াত নানা পুলিন চন্দ্র দেওয়ান (ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সরকারের আমলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের

অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী) এর অফিসের ড্রাইভার। পরিচিত ড্রাইভার পেয়ে তাই আরো একটু স্বচ্ছন্দবোধ করছিলাম। কিন্তু গাড়ীর দৌড় দেখা গেল ভেদভেদী পর্যন্ত, গাড়ী আর যাবে না। অর্থাৎ গাড়ী চলাচলের রাস্তা ছিল কেবল মাত্র ভেদভেদীর লন টেনিস গ্রাউন্ড পর্যন্ত (বর্তমানে এখানে মাদ্রাসা সম্বলিত একটি মসজিদ তৈরী করা হয়েছে)। এরপর কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু। মিনিট দশেক হাঁটার পর আমরা মোনঘরে পৌঁছলাম। প্রথমে মোনঘরের টেম্মাংশালায় আবাসিক ভান্তেদেরসহ অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে পরিচয় পর্ব।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো মহোদয় তার স্বভাবজাত বিভিন্ন কথাচ্ছলে গোটা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখালেন এবং একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন - শ্রীমৎ সত্যানন্দ ভান্তে, শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি ভান্তে, শ্রীমৎ পান্ডিতা ভান্তে (উলাপ্রু মারমা), শ্রীমৎ কীর্তিলংকার ভান্তে (কীর্তিলংকার চাক), শ্রীমৎ বিমল জ্যোতি ভান্তে, শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভান্তে (বিমলানন্দ চাকমা)সহ বাবু মনোরঞ্জন বড়ুয়া প্রমুখ। তারা সবাই মোনঘরের পরিচালক শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার ভান্তের তত্বাবধানে বিভিন্ন ভবন তথা হোস্টেলে ছাত্রদের দেখাশুনা করেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হলো প্রেসিডেন্ট ভবন তথা টেম্মাংশালায়। এই ভবনটি একসময় মোনঘরের প্রবাদ প্রতিম সভাপতি শ্রীমৎ বিমলতিষ্য মহাথেরো মহোদয়ের বাসভবন ছিল বিধায় এই ভবনকে সকলেই প্রেসিডেন্ট ভবন হিসেবে অবহিত করে থাকেন। প্রসঙ্গত: বলে রাখি এই গুণী মানুষটিকে আমি আমার মোনঘরের সংশ্লিষ্ট জীবনে কোনদিনই কাছে পাইনি।

দুপুরের দাওয়া-দাওয়ার পর ভান্তে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কবে নাগাদ যোগদান করতে পারবেন? আমি মনে মনে বললাম আমিতো একপায়ে খাড়া। তবে আমার ইন্টার্নশীপ শেষ হবে ২৩ মার্চ ১৯৮৯ সালে। আমার ইচ্ছে ছিল আমি আমার দীর্ঘ সাত বছরের আবাসস্থল রাজশাহী ছেড়ে আসবো ৭ এপ্রিল। কারণ ১৯৮২ সালের ৭ এপ্রিল আমি রাজশাহী শহরে পদার্পন করি- একেতো এই দিনটি আমার জন্মদিন- প্লাস যুবাবয়সের আবেগ বলে কথা। তাই ভান্তেকে বললাম - আমি বিজুর পরপরই যোগদান করবো। ১৯৮৯ সালের বিজুর পর এপ্রিল মাসের ১৫/১৬ তারিখে যোগদান করলাম মোনঘরের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা হিসেবে।

এপ্রিল, ১৯৮৯ এর আগে মোনঘরের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করে নিলে ভালো হয়। মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হলে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো আমার প্রয়াত বাবা ডা: ভগদত্ত খীসার রিজার্ভ বাজারস্থ

চেম্বারে। তিনি বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসাসেবা দিতেন, শুধুমাত্র প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার চার্জ ছাড়া। অনেকটা তাঁর হাত ধরেই মোনঘর মিনি হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু। ছাত্র-ছাত্রীদের অসুখসহ স্বাস্থ্যের রেকর্ড সংরক্ষণ করার জন্য তাঁর পরামর্শক্রমে প্রথম মেডিকেল বুকলেট ছাঁপানো হয় (এখনো সেই বুকলেটগুলি ব্যবহার করা হয় কিনা আমার জানা নেই)। এরপর পূর্ণকালীন চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করেন ডা: রূপেন্দু চাকমা (ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসক), তৎপরবর্তী ডা: শ্যামলী চাকমা (ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসক)। মোনঘরের ইতিহাসে প্রথম এমবিবিএস চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করেন আমারই একবছরের সিনিয়র এবং একই মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ডা: প্রীতিলেন্দু দেওয়ান। এর পরপরই যোগদান করেন ডা: শৈ প্রু চাই চৌধুরী, তিনিও এমবিবিএস। তৃতীয় এমবিবিএস চিকিৎসক হিসেবে আমার মোনঘরে যোগদান ১৯৮৯ সালে। এরপর সুদীর্ঘ নয়টি বছর (মাঝখানে একবছর বাদে) কাটিয়েছি আমার প্রিয় মোনঘরে। তবে আমার পূর্বসুরীরা খুব সংক্ষিপ্ত সময় মোনঘরে কাটিয়েছেন। আমি যোগদান করার পর আরও একজনকে খন্ডকালীন হিসেবে পেয়েছি- ডা: রবীন চাকমাকে (ডিপ্লোমাধারী)। মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কিভাবে ডা: ভগদত্ত খীসাকে মূল্যায়ন করবেন আমি জানি না, তবে আমি বাবার ছায়াতলে থেকেই মোনঘরের চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়েছি। কারণ তখনও আমি একজন নবীন চিকিৎসক- যদিও আমাদের পাঁচ বছর মেয়াদী কোর্স শেষ করার পার আরো এক বছর ইন্টার্নশীপ করতে হয়-তবুও প্রথম প্রথম রাঙ্গামাটি শহর থেকে বিচ্ছিন্ন মোনঘর-রাঙ্গাপানির মত স্থানে নিজেকে খুব অসহায় মনে হতো।

প্রসঙ্গত: একটি ঘটনার কথা বলি। সুজন চাকমা নামে এক সিনিয়র ছাত্রের তখন প্রচন্ড জ্বর-৩/৪ দিন পরও কোনমতে জ্বর কমছে না- আমি অসহায়বোধ করছি। সেক্রেটারী ভান্তেকে বলাতে উনি তার গাড়ীটা দিলেন। বিকেল বেলা বাড়ীতে এসে বাবাকে বললে, উনি বললেন-অস্ত্র ছাড়াতো আমি কোথাও যাবো না। তখন বাবাকে নিয়ে রিজার্ভ বাজারের চেম্বার থেকে মাইক্রোস্কোপ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্যামিকেলসহ আমি মোনঘর হাসপাতালে হাজির হলাম। তারপর ঝটপট ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য স্বাভাবিক পরীক্ষাগুলো করার পর বাবা বললেন- এটি ম্যালেরিয়া নয় - তোমার মত চিকিৎসা চালিয়ে যাও। পরবর্তী ২ দিনের

মাথায় জ্বর নেমে যায়। সুজন চাকমাকে এখনো রাঙ্গামাটিতে দেখি এবং সেই প্রথম জীবনের স্মৃতির কথা এখনো মনে পড়ে যায়।

আমি যখন মোনঘরে যোগদান করি তখন প্রতিষ্ঠানটির যৌবনকাল শুরু বলা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে দু'টি জেলার লোকজন (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা) মোনঘরে তাদের সন্তানদের ভর্তি করানোর জন্য পাগল। একপর্যায়ে মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্য ৮৮০ হয়েছিল। আমার ভূল না হলে সেটি ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যা। কোন এক বছর সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ওমর ফারুক মোনঘর পরিদর্শনের সময় তার এক কলিগকে বার বার বলছিলেন- ৮৮০ জন এতিম- Mysterious বিষয়। ভবন এবং জায়গার তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে সেক্রেটারী ভান্তে একের পর এক নতুন ভবন তৈরী করতে থাকেন এবং এই বিপুল পরিমাণের নির্মান কাজ দেখাশুনা করার জন্য বাবু ত্রিরতন চাকমাকে (রাঙ্গামাটি শহরে বহুল পরিচিত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব) আবাসিক প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। একই সঙ্গে স্পন্সরশীপ প্রোগ্রামে ম্যানেজার পদে নিয়োগ দান করেন বাবু মুকুন্দ চাকমা ও সহকারী হিসেবে বাবু সৌভাগ্য মঙ্গল চাকমা ও আমার বন্ধুবর ইঞ্জিনিয়ার বাবু রমেশ বিকাশ চাকমাকে। আর এদিকে ভবন তত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ পান- প্রজ্ঞালোক ভান্তে, সুমনানন্দ ভান্তে, বাতায়ন শ্রমনসহ আরো অনেকে। আর ছাত্রীদের একমাত্র আবাস স্থল বিশাখা ভবনে প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব পালন করতেন নিভা চাকমা (নিশানের মা) ও অচ্ছেদতারা খীসা (বিনয়াদিত্য মা) প্রমুখ। পরবর্তীতে ম্যানেজিং কমিটির দাবীতে ইন্দিরা বড়ুয়া ও তৎপরবর্তীতে তার ছোট বোন চয়নিকা বড়ুয়া দায়িত্ব পালন করেন।

এবার আমার চিকিৎসা বিষয়ে আসি- মোনঘর মিনি হাসপাতারের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সার্বক্ষনিক ছিলাম আমি এবং ওয়ার্ডবয় বাবু নির্মল চাকমা আর খন্ডকালীন ডা: রবিন চাকমা। পরবর্তী নার্স হিসেবে যোগদান করেন মিসেস কামনা চাকমা এবং উত্তরা চাকমা। প্রথমদিকে রুগীদের জন্য জেনারেল ডাইনিং হল থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হতো। পরবর্তীতে রুগীদের উন্নত খাদ্যের কথা চিন্তা করে মোনঘর মিনি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় সকাল, দুপুর এবং রাতের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। নতুনভাবে নিয়োগ দেয়া হয় বাবুর্চি কাম আয়া হিসেবে নীহারিকা তালুকদারতে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর বিশাখা ভবনের

জন্যও নিয়োগ দেয়া হয় (শুধুমাত্র ছাত্রীদের জন্য) শুচিতা চাকমাকে। এখন আমার কাজ কি?

প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আউট ডোর রুগী দেখা। মোনঘর মিনি হাসপাতালের বেডের সংখ্য ছিল দশ, আর বিশাখা ভবনের সংখ্যা সঠিক মনে নেই। সকাল ৯-৩০টার দিকে ছাত্রদের ডাইনিং হলে সকালের ভাত (লাঞ্চ) দেয়া হতো। সেই সময়ে বিশাখা ভবনে আমি এক চক্কর দিয়ে আসতাম। আসলে সকাল ১০টার পর কোন কাজই থাকে না। নি:সঙ্গ অবস্থায় কাটিয়েছি অনেক বছর। বিকেল ৩টার পর আরো কিছু রুগী দেখতে হতো। ঠিক ৫টার পর ছাত্রদের রাতের খাবার (ডিনার) দেয়া হতো। এরপর আরো নি:সঙ্গতা। এই নিস:ঙ্গতা কাটাতে আমি যাদেরকে সবচেয়ে সিনিয়র ছাত্র হিসেবে পেয়েছি, তাদের সাথে মিশতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু একজন ছাব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে মেলামেশাটা তেমন জমে উঠেনি। পরবর্তীতে চেষ্টা করেছি স্কুলের আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে মিশতে- কিন্তু তাদের সঙ্গেও পারিনি- তাদের পরিবার কেন্দ্রিক মনমানসিকার জন্য।

মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের তৎকালীন স্বাস্থ্যগত সমস্যার কথা বলি- প্রধানতম সমস্যা ছিল- চর্মরোগ, চর্মরোগ এবং চর্মরোগ। আমাদের স্বাস্থ্য বাজেটের ৮০% অর্থ ব্যয় করতে হতো এই রোগটির জন্য। মোনঘরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সপ্তাহে একদিন টেম্মাংশালায় আভ্যন্তরীণ পরিচালনা কমিটির বৈঠক হতো। এ সব বৈঠকে অনেক সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্বাবধায়ক-আবাসিক ভিক্ষুদের সাথে আমার প্রায়ই বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হতো। কারণ কিছুই না ভবন তত্বাবধায়ক-তত্বাবধায়িকাগন যদি আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখাশুনা করেন তাহলে চর্মরোগের সমস্যা প্রায়ই দূর হয়ে যাবে। এ সব বিষয়ে বিতর্কের কারণে অনেক ভান্তের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। চর্মরোগ বিস্তৃতির আরো একটি কারণ ছিল সুপেয় পানীয় জলের অভাব। আমার মোনঘর জীবনের প্রথম দু'তিন বছর পানীয় জলের জন্য নির্ভর করতে হতো কাপ্তাই লেকের পানি এবং ছোট ছোট পাহাড়ী ছড়ার উপর। ১৯৯১ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর একটি গভীর নলকূপ বসানো হলে পানীয় জলের সমস্যার কিছুটা লাঘব হয়। অন্যান্য শারিরীক সমস্যার মধ্যে ছিল ঋতু পরিবর্তনকালীন ভাইরাস জনিত জ্বর, ম্যালেরিয়া এবং বিভিন্ন ধরনের Accidental Inimy ।

অনেক সময় রুগীর অবস্থা মারাত্মক হলে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হতো। বেশ কিছু রুগী চট্টগ্রামে পাঠাতে হতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে। তখন সমস্যা হতো রুগীর দেখাশুনা করা নিয়ে। নীতিগতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক হচ্ছেন ভবন তত্বাবধায়ক-তত্বাবধায়িকরা। কিন্তু ছাত্রদের ভবন তত্বাবধায়করা হলেন আমাদের ধর্মীয় গুরু ভান্তেরা। ধর্মীয় রীতিনীতির কারণে আমাদের সমাজে তাদের চলাফেরা সীমিত পর্যায়ে। প্রথম দিকে আমি নিজেই বেশ কিছু রুগীকে নিয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের চেম্বার ও হাসপাতালে গিয়েছি। কিন্তু আমি না থাকলে মোনঘরে আবার সমস্যা দেখা দিত। এ সব সমস্যার সমাধানের জন্য পরবর্তীতে বাবু মনোরঞ্জন বড়ুয়াকে আমার হাসপাতালে ন্যস্ত করা হয়-চট্টগ্রামে বিভিন্ন হাসপাতাল ও বিশেষজ্ঞ চেম্বারে রুগীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজ অনেক বছর পরে হলেও আমি উনার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্নেহ ও মায়াময় ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

বিশাল একটা ক্যাম্পাস এবং আট শতাধিক আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী থাকা সত্বেও চিকিৎসাবিদ্যা প্রয়োগ করার মত লজিস্টিক সাপোর্ট তখন মোনঘরে তেমন ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি জড়িয়ে পড়েছি মোনঘরের সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক বিষয় উন্নয়নে। একে একে প্রায়ই প্রত্যেকটা সৃজনশীল ব্যবস্থাপনা কাজে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হই। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন কর্মকান্ডে আবাসিক ভান্তেদের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করেছি। আমাদের পরিচালিত কার্যক্রমগুলো ছিল- বিতর্ক, কুইজ ও দেয়ালিকা পত্রিকা প্রতিযোগিতা, নাটক মঞ্চায়নসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখনো মনে পড়ে বুলবুল বড়ুয়ার অভিনয়, লেখক ও নাট্যকার হিসেবে কিশলয় চাকমার আবির্ভাব।

এরই মধ্যে মোনঘর এবং অধুনালুপ্ত খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালাস্থ পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের (সাধারনভাবে পার্বত্য নামে পরিচিত) কিছু সিনিয়র ছাত্র তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে তারা মোনঘরে এসে সময় কাটাত। কারণ তখনকার সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে যাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এদের মধ্যে মিঃ বিমল কান্তি চাকমা, মিঃ জওহরলাল চাকমা, মিঃ যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, মিঃ কীর্তি নিশান চাকমা ও মিঃ শশাংক চাকমা প্রমুখ। দেখা গেল

এদের সঙ্গেই আমার মনের মিল বেশী হচ্ছে। দেশের পরিস্থিতিসহ মোনঘরের উন্নয়নের জন্য তারা উন্মুখ হয়ে আছে। তাদের জন্য মোনঘর কর্তৃপক্ষ মোনঘরের ক্যাম্পাসে ব্যাচেলর ভবন তৈরী করে দিল। এক পর্যায়ে কথা উঠল তাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে। তখন ছাত্রদের তরফ থেকে প্রস্তাব করা হলো রমজান বন্ধের সময় তারা আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে কোচিং করাবেন। কয়েক বছর তারা রমজান বন্ধের সময় পুরো স্কুলটাই চালিয়েছিলেন। আমিও তাদের সাথে নবম ও দশম শ্রেনীর বিজ্ঞানের ক্লাশ নিয়েছি। পরবর্তীতে বাইরের কিছু ছাত্র [Moanoghar Higher Education Loan Program(HELP) এর আওতায়] মোনঘরে আনা হলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এসব ছাত্ররা কোনদিনই মোনঘরের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশতে পারেনি। এদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল মোনঘরের তৎকালীন সাধারন সম্পাদক ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের মহোদয়ের সঙ্গে। একই সঙ্গে গঠিত হলো মোনঘর ছাত্র কল্যাণ সংস্থা।

ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের মহোদয়ের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হিসেবে ঢাকার মিরপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়- বনফুল চিলড্রেন হোমস। ক্ষেত্র প্রস্তুত মোনঘরের ছাত্ররাও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করেছে- তাই একে একে মোনঘরে যোগদান করলেন জি.এম. হিসেবে বাবু জওহরলাল চাকমা ও এ.জি.এম. হিসেবে শশাংক চাকমা। ঢাকায় বনফুল চিলড্রেন্স হোমস এ বাবু বিমল কান্তি চাকমা একাউনটেন্ট হিসেবে এবং আবাসিক চিকিৎসক হিসেবে ডাঃ বিনোদ শেখর চাকমা যোগদান করলেন।

মোনঘর ছাত্র কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের সাহিত্য , সাংস্কৃতিক, ইতিহাস-ঐতিহ্য, অর্থনীতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন সেমিনারসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। কারিগরী ত্রুটির কথা বাদ দিলে আমার মনে হয়েছে এ ধরনের অনুষ্ঠান আজ অবধি পার্বত্য অঞ্চলে কোথাও হয়নি। এতদ্‌অঞ্চলের মেধাবী, জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তি ছাড়াও বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছিল শুধুমাত্র এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য। এদের মধ্যে চারু বিকাশ চাকমা, প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান, বোমাং চীফ মংশৈ প্রু চৌধুরী, ড. মানিক লাল দেওয়ান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হায়াত হোসেন ও অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, ড. ইমতিয়াজ আহমেদ

প্রমুখ। এখনও মনে পড়ে বিজুর সময় এলে মোনঘরে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। কোথাও শোনা যেত হারমোনিয়াম, বাঁশী, তবলার শব্দ, মোনঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি হিসেবে। সোজা কথা আমি আমার কর্কশ ছাত্র জীবনের চাইতে এই জীবনটা বেশী উপভোগ করেছি প্রাণভরে।

এবার শেষ পর্যায়ে আসি। আমারও কিছু স্বপ্ন ছিল আমার বিষয় নিয়ে। আমার ইচ্ছা ছিল- মোনঘরে ছোটখাট একটা হাসপাতাল হবে, মাইনর কিছু সার্জিক্যাল সমস্যার সমাধান করা যাবে এবং আশে-পাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ উপকৃত হবে। কিন্তু আমার চিন্তায় বোধহয় ভুল ছিল। মানুষকে আগে হতে হবে সচেতন এবং শিক্ষিত। মানুষের মনের মধ্যে যদি কোন সচেতনতা না থাকে- না থাকে শিক্ষা সে কোনদিন সুযোগকে গ্রহন করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি- পার্শ্ববর্তী রাঙ্গাপানি গ্রামের কথা। তখনকার সময়ে বলতে গেলে বেশ একটি আদর্শ গ্রাম। কিন্তু কোন কারণে তারা মোনঘর মিনি হাসপাতালে আসতো না। কোন কোন সময় কদাচিত একবারে শেষ সময়ে আসত, যখন ডাক্তারের কোন কিছুই করার থাকে না।

জীবনের সুখের স্মৃতির সঙ্গে দুঃখের স্মৃতিও আছে। তাই মোনঘর এর আমার নয় বছরের স্মৃতির মধ্যে কিছু দুঃখময় স্মৃতি উল্লেখ না করলে নয়। স্মৃতিময় নামে একজন Senior Student এর নাম সর্ব প্রথম উল্লেখ করবো। খুব সাধারন এবং ভান্তেদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশতো, হঠাৎ শুনি সে মারা গেছে রানীরহাট নামক জায়গায়, দু'বাসের চিপায় পড়ে সে মারা যায়। সে যে কেন এবং কি উদ্দেশ্যে ওখানে গিয়েছিল তা'র ভবন তত্তাবধায়ক তো দুরের কথা প্রশাসনের কেউ জানতো না।

আমার জীবনে প্রথম কোন লাশ যা আমাদের সবাইকে নিয়ে শেষ কৃত্যও করতে হলো। শুনেছি আমি মোনঘরে আসার আগেও একজন Senior Student TB সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে মারা যায়।

এরপর বিশাখা ভবনের ছাত্রী অবন্তির কথা এখনো জ্বলজ্বল করে মনে পরে,যার জ্বরের সঙ্গে Jaundice দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তার অভিভাবকরা মনে করলেন Jaundice এর জন্য পাহাড়ী চিকিৎসাই উপযুক্ত। আমার চোখের সামনে সেই ছাত্রীকে মোনঘর কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে এক প্রকার জোর করে নিয়ে যাওয়া হলো। অথচ দু'একদিন পর গভীর রাতে আমাকে ডেকে নেওয়া হলো সেই মেয়ের বাড়ীতে, রাঙ্গাপানি গ্রামে। তখন রুগীর heart failure develop (হৃদযন্ত্র বন্ধ হওয়ার পথে) করেছে। আমার পরামর্শক্রমে তাকে তাৎক্ষণিক রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে

স্থানান্তর করা হলো। কিন্তু এক দু'দিনের মাথায় সে মারা পড়ল। সম্ভবত Cerebral Malaria।

আরও একটা ছোট ছেলের কথা মনে পড়ে। রাঙ্গাপানি গ্রামেরই সন্তান। আমি IPGMR (Instate of Post Graduate Medicine & Research) বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (BSMMU)-এ সদ্য ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হয়েছি। তখনই রূপায়ন নামের ছেলে মারা যায়; সম্ভবত Cerebral Malaria।

আরও একজনের মৃত্যুর কথা বলে এই বিষয়টা শেষ করবো। ভদন্ত চিত্তানন্দ মহাথেরো আমাদের বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজের মধ্যে একজন অমায়িক এবং শান্তশিষ্ট ভিক্ষু ছিলেন। সেই চিত্তানন্দ ভান্তের মারাত্মক অসুখ, উনি তার ভোল্ল্যার বিহারে শয্যাশায়ী। তখনই আমি শুনেছি তিনি মোনঘরের সভাপতি। মোনঘরের নিত্য নৈমিত্তিক ম্যানেজিং কমিটির মিটিং-এ একদিন আমি প্রশ্ন রাখি আমাদের সভাপতির জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই? তখন প্রাণবন্ত আলোচনার পর প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে আমাকে দায়িত্ব দিলেন, তার জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে। আমি সুমনানন্দ ভিক্ষুকে নিয়ে ভোল্ল্যা থেকে ভান্তেকে এ্যাম্বুলেন্স-এ করে সুদুর চট্টগ্রামে হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করি। কিন্তু ভান্তের দেহের মধ্যে তখন মরন ব্যাধি Liver Cancer। যথাসময়ে এক সপ্তাহের মধ্যে উনি হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে মারা যান। এবং উনার মরদেহ আমি রাঙ্গাপানি মিলন বিহারে নিয়ে আসি। এরপর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ভান্তের শেষকৃত্যনুষ্ঠান করা হয়।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত, ৯ (নয়) বৎসর আমি মোনঘর এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সময় কাটিয়েছি। ১৯৯৬ সনের দিকে মোনঘর এর সার্বিক ব্যবস্থপনায় আমূল পরিবর্তন আসে। ভেনা: প্রজ্ঞানন্দ ভান্তেকে সরে যেতে হয় নেতৃত্বের পদ থেকে। মোনঘর এর ব্যবস্থাপনায় আসেন Five Member's Committee। কুমার নন্দিত রায়কে আহবায়ক করে সদস্য রাখা হয় ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, ডা: ভগদত্ত খীসা, নৃপতি ভূষন চাকমা এবং ভেনা: তিলকানন্দ মহাথের মহোদয়কে। আমার জন্য বিষয়টি অত্যন্ত বিব্রতকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তাদের মধ্যে একজন আমার বাবা এবং আর একজন আমার শ্বশুর। স্বভাবতই: নুতন ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা-আলোচনা উঠতে থাকে। প্রশাসন এর উচ্চ স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার দুরত্ব বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে আমি পদত্যাগ করার ইচ্ছা পোষণ করি। তখন আহবায়ক নন্দিত রায় আমাকে ডেকে বললেন, "আমাদের Interim period টা তুমি থাকো – এবং আমরা চলে যাওয়ার পর তোমার ডিসিশন তুমি নিও"। আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে আরও কয়েকটা মাস থেকে যাই। পরবর্তীতে Five

Member's Committee'র বিকল্প নেতৃত্বের নিকট ক্ষমতা হস্থান্তর এর পর আমি এপ্রিল ১৯৯৮ সালে মোনঘর থেকে এসে বর্তমান পেশাগত জীবনে ফিরে আসি।

মোনঘরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার অনেক কারণ ছিল। প্রকৃতির কাছাকাছি তিন পার্বত্য জেলার গরীব, অনাথ, ছিন্নমূল আদিবাসী জনগনের সঙ্গে লেগে থাকা, এটি একটি বড় কারণ। আর মনের মধ্যে একটি সুপ্ত বাসনা ছিল মোনঘর এর ব্যানারে পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য একটি স্বল্প খরচের হাসপাতাল গড়ে তোলা। তারই চিন্তা ভাবনা থেকে মনে হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য সবচাইতে জরুরী একটি Diagnostic Laboratory গড়ে তোলা। তাই মোনঘর কর্তৃপক্ষের নিকট আমি এই বিষয়টি তুলে ধরেছি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩-৯৪ সেশনে আমি তৎকালীন Institute of Post Graduate and Medicine Research (IPGMR যা বর্তমানে Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University – BSMMU) এর Clinical Pathology বিভাগে এক বৎসর মেয়াদী উচ্চতর প্রশিক্ষন গ্রহন করি। এরই ধারাবাহিকতায় বনফুল চিলড্রেন্স হোমের চিকিৎসক ডা: বিনোদ শেখর চাকমাকে শিশুরোগ বিষয়ে ঢাকায় উচ্চতর প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছিল। PG Hospital থেকে ফিরে আমি মোনঘরে Clinical Pathology বিভাগ চালু করি। অবশ্য এই সুবিধাটি ছিল শুধুমাত্র মোনঘরের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এর জন্য Malaria চিকিৎসা দেয়ার জন্য আমার কোন অসুবিধা হয়নি এবং দ্রুত সময়ে চিকিৎসা প্রদান সম্ভব হয়। পরবর্তীতে মূল্যায়ন করে দেখেছি আমার স্বপ্ন দেখাটা তখনকার সময়ের জন্য উপযুক্ত ছিল না।

আমি আমার মোনঘরে কাটানো সময়টাকে আমার জীবনের সোনালী সময় বলে উল্লেখ করবো। আমি এই সময়টাকে উপভোগ করেছি – চেয়েছি মোনঘর একটা স্বয়ং সম্পূর্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠুক। শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানশ্রী ভান্তের সুযোগ্য শিষ্যমন্ডলী - শ্রীমৎ বিমলতিষ্য ভান্তে, শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে, শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার ভান্তে, প্রিয়তিষ্য (সজ্জন) ও জিনপাল (সুবাস)দের - হাতে গড়া মোনঘরকে পেয়েছি তার দ্বিতীয় প্রজন্মে শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভান্তের সময়ে। এরপর প্রজ্ঞানন্দ ভান্তের সময়টা প্রায়ই চোখের সামনে দেখেছি এবং বিশাল কর্মযজ্ঞে সামিলও হয়েছি। তৃতীয় পর্বে আমি নেই। তবে সমসাময়িকদের হাসি ঠাট্টার ছলে বলেছি - হযরত মোহাম্মদ এর পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার সুযোগ্য চার খলিফা। এরূপ মোনঘরের চার জন সিনিয়র ছাত্র : বিমল কান্তি, জওহরলাল, কীর্তি নিশান এবং শশাংক বিকাশ। কালের আবর্তনে প্রথমোক্ত দু'জনকে আর মোনঘরের কার্যক্রমে দেখি না। বাকী শেষোক্ত দু'জন এখনো মোনঘরের সঙ্গে জড়িত আছেন। আমি আশাবাদী জনগনকে সম্পৃক্ত

রেখে দীর্ঘমেয়াদী এবং সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা করে অগ্রসর হলে মোনঘর আমাদের মাঝে চিরদিন সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকবে।

কৃতজ্ঞতা : *কীর্তি নিশান, শশাংক বিকাশ, অশোক, নন্দ কিশোর, যারা বারবার আমাকে এ লেখাটির জন্য অনুরোধ করেছেন। আমার লেখার কোন অভ্যাস না থাকা সত্বেও তাদের কারণে চেষ্টা করেছি লিখতে।*

আমার স্মৃতিতে গাঁথা এক আদর্শ প্রাতিষ্ঠান -"মোনঘর"

ছানোঅং চাক

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪। আনুমানিক বেলা আড়াইটা হবে। যথারীতি দাপ্তরিক কর্তব্য শেষ করে আমার ভাড়া বাসার অদুরে সুজনের দোকানে বসে দুপুরের খাওয়ার পর রুটিন মাফিক একটা পান খিলি মুখে দেবো, এমন সময়ে ল্যান্ডফোন এর এক অপরিচিত নাম্বার থেকে আমার মোবাইলে ফোন আসে। কিছুক্ষন তাকানোর পর ফোন রিসিভ করলাম। অপর প্রান্ত থেকে স্পষ্ট শোনা গেল এক পরিচিত কণ্ঠস্বর, ছোট ভাই নন্দ কিশোরের (বর্তমানে মোনঘরের স্পন্সরশীপ অফিসার)। মোবাইলে অনেক কথা হলো তার সাথে। কারণ পরের দিন তার নাইক্ষ্যংছড়ি আসার কথা ছিল। কিন্তু কাছাকাছি রামু পর্যন্ত এসেও পরের দিন হঠাৎ জামায়াত ইসলামীর আহুত হরতালের কারণে সেদিনই ফিরে যায় বান্দরবানে, পরে রাঙ্গামাটিতে। মূলত: নিরাপদে রাঙ্গামাটি ফিরে যাওয়াসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হলো তার সাথে। এক পর্যায়ে আলাপের শেষের দিকে নন্দ অনুরোধ সহকারে জানালো - 'ছানোদা, মোনঘরের ৪০ বছরপূর্তি ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ২০১৫ উপলক্ষে মোনঘর ও দি মোনঘরীয়ান্স এর যৌথ উদ্যোগে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। তাই উক্ত প্রকাশনাতে আপনাদের চাক সম্প্রদায় থেকে "মোনঘর" এর প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আপনার স্মৃতিচারণা মূলক একটা লেখা চাই। তার প্রস্তাবটা আমি সানন্দ চিত্তে গ্রহন করলাম। তবে তাকে বললাম - "নন্দ, দেখো, লেখালেখিতে কিন্তু আমি মোটেই অভ্যস্ত নই, তবে চেষ্টা করবো"। অতপর দোকান থেকে ফিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম এবং আমার স্মৃতিতে আনতে চেষ্টা করলাম আজ থেকে প্রায় দীর্ঘ দুই যুগ আগের সে সব স্মৃতির কথা, যে প্রতিষ্ঠানে আমি দীর্ঘ আট বছর ধরে ছিলাম। বিশেষ করে একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আবেগময় বয়স হিসেবে পরিচিতি 'বয়:সন্ধিকালের' দিনগুলো কাটিয়েছিলাম, সেসব দিনের কথা।

১৯৮৪ সালের কথা। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ (আনুমানিক), তারিখ ও বার মনে নেই। আমার প্রয়াত বৃদ্ধ পিতার (১৯৮৭ সালে পরলোক গমন করেন) হাত ধরেই মোনঘরে আমার প্রথম পদার্পন। সাথে আমাদের গ্রামের দূর সম্পর্কীয় এক আত্নীয় মামাতো ভাই থোয়াইছাউ চাক। মূলত: ঐ মামাতো ভাই আমাদেরকে অনেকবার

মোনঘরে পৌঁছে দেওয়া ও বাড়ীতে নিয়ে আসা কাজটা করতেন। সে জন্য তাঁর নিকট আমি আজীবন কৃতজ্ঞ।

বিগত কয়েক বৎসর ধরে আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী মোনঘরে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করে আসছে। তন্মধ্যে আমাদের গ্রাম (মধ্যম চাক পাড়া) থেকে দু'জন। এর মধ্যে একজন হলো আমার আপন তালতো ভাই এবং সহপাঠী অংছাইন চাক (১৯৭৯ সালে মোনঘরে চাক্ সম্প্রদায় থেকে ভর্তি হওয়া প্রথম চারজনের মধ্যে অন্যতম এবং বর্তমানে বান্দরবান সদরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে কর্মরত)। সে যা হোক, রাঙ্গামটি শহরের দক্ষিণ কালিন্দিপুরে আমার বড় দিদির বাসায় রাত্রি যাপন করে পরের দিন আনুমানিক সকাল সাড়ে আটটার দিকে "মোনঘরের" উদ্দেশ্যে বের হই। কালিন্দীপুর থেকে নৌকায় ঘাট পার হয়ে প্রায় ৪০মিনিট উঁচু-নিচু কাঁচারাস্তা হাঁটার পর মোনঘরে পৌঁছি। মূল ক্যাম্পাসে ঢুকার বাম পাশে একটি বাঁশের বেড়া ও ছনের ছাউনি দিয়ে তৈরি একটি বৌদ্ধ মন্দির। যেটি রাঙ্গাপানি মিলন বিহার নামে পরিচিত। মূলত: এ বিহারকে কেন্দ্র করেই এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন বলা যায়। প্রথমে আমরা মন্দিরে অবস্থান করি। এরপর আমার বড় দিদির পরামর্শ অনুযায়ী মোনঘরে কর্মরত (তৎকালীন ভবন তত্ত্বধায়ক ও মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক) আমার আপন দুলাভাইয়ের জেঠাতো ভাই অংক্যচিং চাক্‌কে (যিনি সবার কাছে চাক স্যার নামে পরিচিত এবং বর্তমানে তিনি বান্দরবান সদরের ডাকঘরে কর্মরত) খুঁজতে থাকি। পরে এক চাকমা ছেলে আমাদেরকে তাঁর রুমে নিয়ে যায়। তিনি তখন মৈত্রী ভবনের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি (অংক্যচিং চাক) কয়েক বৎসর আগেই আমার দুলাভাই *(বাবু মং মং চাক্, তিনি খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে 'চাক বাবু' নামে সর্বাধিক পরিচিত, বলা যায় তিনিই আমাদের পুরো চাক সম্প্রদায়ের জন্য রাঙ্গামাটিতে 'মোনঘর' এর অবস্থান সম্পর্কে আবিষ্কারক ও পথ প্রদর্শক)* এর পরামর্শ ও একান্ত সহযোগিতায় মোনঘরে চাকরি নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল চাকরির পাশাপাশি পড়ালেখা করা এবং একই সাথে চাক্ ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করা। উল্লেখ্য, তিনি সেই সময়ে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলেন।

সেদিন বাবাসহ আমরা সারাদিন তাঁর রুমেই (দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সহ) অবস্থান করেছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি (অংক্য চিং চাক্) মোনঘরে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে মোনঘর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে খোঁজ-খবর নিলেন, কিভাবে আমার ভর্তি নিশ্চিত করা যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা পর বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেলাম মোনঘরে এ বৎসরে আর কোন নতুন ছেলে-মেয়ে ভর্তি করা হবে না। আসন খালি নাই। খবর শুনে আমার চেয়ে বাবার কাছে যেন "বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো"। মূহুর্তেই বাবার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। বাবার এমন চেহারা দেখে তালতো ভাই (অংক্যচিং চাক্) বাবার উদ্দেশ্যে আশ্বস্ত সুরে বললেন, "ঠিক আছে, বড় মামা, আপনি ছানোকে (আমাকে) আমার কাছে রেখে যান। আমি তাকে ভর্তির চেষ্টা করবো"। এরপরও কিন্তু বাবা

কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারলেন না। অনেকটা নিরাশ হয়ে বিকালের দিকে আমাকে তাঁর (অংক্যচিং চাক্) কাছে রেখে বাবা বিদায় নিলেন বড় দিদির বাসায় ফেরার উদ্দেশ্যে। বাবা চলে যাওয়া পর আমিও বিষন্ন ও নি:সঙ্গ বোধ করলাম। মনে মনে ভাবছি, আমি এ কোন অথৈ সাগরে ভাসছি। ভাবছি বাড়ীতে ফেলে আসা আমার বৃদ্ধ মায়ের কথা (বর্তমানে প্রায় নব্বই বৎসর উপরে)। কারণ আমার মায়ের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল, যেহেতু আমাদের এখানে (নাইক্ষ্যংছড়িতে) গ্রামের আশে-পাশে কোন হাইস্কুল নাই, তাই কষ্ট করে হলেও রাঙ্গামাটিতে আমাকে পড়াশোনা করাবে। তাছাড়া মা মনে করতেন, বড় দিদিরা (স্বপরিবারে) যেহেতু দীর্ঘ বৎসর ধরে রাঙ্গামাটিতে অবস্থান করছেন, সেহেতু দুলাভাই আর বোনের সান্নিধ্য পেলে হয়তো আমার সবচেয়ে নিরাপদ ও সুবিধা হবে। উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে আমাদের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বর্তমানে আমি যে বিদ্যালয়ের কর্মরত আছি (তৎকালীন বেসরকারি) এটি ছাড়া আর কোন মাধ্যমিক স্কুল ছিল না। এ স্কুলটি আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় ৫ কি: মি: দুরে অবস্থিত।

ঘন্টাখানেক পর তালতো-ভাই অংক্যচিং মাস্টার তার ভবনের এক চাকমা ছেলের মারফতে আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী অংছাইন চাক্‌কে ডেকে আনলেন। কিছুক্ষণ পর অংছাইন এলে অংক্যচিং চাক তার সাথে (অংছাইন চাক) আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন এবং পরামর্শ দিলেন, "আজ তুমি তাকে (আমাকে) একটু নিয়ে যাও এবং তোমার সংগে রাখবি।" এর সাথে তাকে সতর্কও করে দিলেন যে, আমাকে এখনো কর্তৃপক্ষ ভর্তির অনুমোদন দেয়নি সুতরাং মোনঘরে আমি তখনও একজন অবৈধভাবে অনস্থানকারী। এতএব তিনি নির্দেশ দিলেন কোন সহপাঠী কিংবা কেউ জিজ্ঞেস করলে সে যেন বলে যে, আমাকে ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং একই কথা বলার জন্য তিনি আমাকেও বললেন। তারপর সে (অংছাইন চাক) আমাকে তার আবাসিক ভবন বোধি ভবনে নিয়ে গেল। এভাবে সে আমাকে সাথে রাখল এবং অনেকটা আমার গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করল।

প্রথম দিকে মোনঘরের নিয়ম-কানুন গুলো আয়ত্ব করতে বা খাপ খাওয়ানো আমার কাছে খুবই কষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে ভোর পাঁচটার আগে ঘন্টা বাজানোর সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠা, পরে সমবেত কণ্ঠে গাথা পাঠ (মোনঘর সঙ্গীত), সকাল-সন্ধ্যা বাধ্যতামূলকভাবে বুদ্ধের বন্দনা করা, কাজ করা, সময় অনুযায়ী ডাইনিং হলে খাওয়া, বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং রাত ১০টার মধ্যে বাধ্যতামূলক বিছানায় যাওয়া ইত্যাদি। সবকিছু ছিল রুটিন মাফিক। তৎসময়ে আমি যে ভবনে (বোধিভবন) সাময়িকভাবে ছিলাম, তখন ভবন তত্ত্বধায়ক কে ছিলেন আমার মনে নেই। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাকে বোধিভবন থেকে মৈত্রী ভবনে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে আবাসিক ছাত্রদের পরপর দুই বছরের অধিক একই ভবনে অবস্থান করার নিয়ম ছিল না। তাই ঐ বৎসর সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদেরকে মৈত্রী ভবনে রাখা হয়। আমি ছিলাম সপ্তম শ্রেণিতে। আমাদের ক্লাশে ঐ বৎসরে

বাইশারী (নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা অন্য একটি ইউনিয়ন) থেকে আমাদের সম্প্রদায়ের এক ছেলে ভর্তি হয়। তার সাথে পূর্ব পরিচয় ছিল না। তার নাম অংছাহ্লা চাক্ *(বর্তমানে কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরা খ্রীষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে উপ-সহকারী মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত)।* যেহেতু সেও নতুন, তাছাড়া স্বসম্প্রদায়ের লোক সেহেতু তার সাথে পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে যায় খুব অল্পসময়ের মধ্যে। দীর্ঘ আট বৎসর ধরে (কলেজ পর্যন্ত) আমরা দু'জনে খুব কাছাকাছি ছিলাম।

রাতের খাওয়ার পর প্রত্যেকের আবাসিক ভবনে অবস্থান বা উপস্থিত থাকা ছিল বাধ্যতামূলক। ভবন তত্ত্বধায়ক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা ভবনে ছাত্রদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য হাজিরা ডাকা হতো। মূলত: শ্রদ্ধেয় সুহৃদ স্যারই (সুহৃদ চাকমা, ১৯৮৮ সালে রহস্যজনকভাবে মোনঘরের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় নিঁখোজ হন, আমি তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি) এ সব কাজের দায়িত্বটা বেশী পালন করতেন। অত্যন্ত দুরদৃষ্টি সম্পন্ন, স্পষ্টবাদী, সদা হাস্যমুখ ও লেখালেখিতে খুব দক্ষ ছিলেন তিনি। প্রথম কয়েকদিন ছাত্র হাজিরা খাতায় আমার নাম ছিল না এবং সেজন্য নামও ডাকা হতো না। অনেকটা ভয়, দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চিত দিন কেটেছিল আমার। কারণ কর্তৃপক্ষের ভর্তির অনুমোদন ছাড়াই অবৈধ ভাবে আমি ভবনে অবস্থান করছি। তাই যে কোন সময় ধরাও পড়তে পারি এ আশঙ্কায়। এভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন যথাসময়ে ছাত্র হাজিরা খাতা হাতে নিয়ে সুহৃদ স্যারের আগমন এবং একে একে নাম ধরে হাজিরা ডাকা শুরু। সেদিন একেবারে সবশেষে আমার নাম উচ্চারণ করলেন। অনেকটা অপ্রত্যাশিত ও অপ্রস্তুত অবস্থায় আমি সাড়া দিলাম 'প্রেজেন্ট স্যার'। ভবনে অবস্থানকারী সকলেই আমার দিকে এক পলক তাকালো সাথে সুহৃদ স্যারও। নতুন ছাত্র দেখে তিনি কয়েকটি তথ্য জিজ্ঞেস করলেন, যেমন গ্রামের নাম কী? মা-বাবা আছে কিনা? কি করে? ইত্যাদি। আমি সবিনয়ে নরম সুরে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলাম। এরপর থেকে আমি খুব খুশী হলাম এবং এতদিন যে ভয় ও অনিশ্চিত দিন-যাপন করছিলাম সেটা অনেকটা কেটে গেল।

প্রথম ৭-৮ মাস মোনঘরের নিয়ম-কানুন ও নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো আমার জন্য খুবই কঠিন ও কষ্টকর ছিল। কারণ এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ে থাকলেও সে সময়ে সিংহভাগই (প্রায় নব্বই শতাংশের উপরে) ছেলে-মেয়ে ছিল চাকমা সম্প্রদায়ের। তাই স্বাভাবিক ভাবে সবাই চাকমা ভাষায় কথা বলতো। যেখানে আমি বাংলা ভাষা পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে ও বলতে পারতাম না, সেখানে আরো নতুন এক সম্প্রদায়ের ভাষা আয়ত্ব করাটা ছিল আরো কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে কথা বলার সময় শুদ্ধ উচ্চারণে ভাব বিনিময় করাটা ছিল খুবই কঠিন। আমার কথা বলার সময় উচ্চারণগত সমস্যার কারণে আমার চাকমা বন্ধুরা আমাকে নিয়ে খুব মজা করতো। পরে ভুল করতে করতে এক-দেড় বৎসরের মধ্যে আমি চাকমা ভাষা পুরো আয়ত্ব করলাম। এভাবে দেখতে দেখতে ৭-৮ বৎসর

কেটে দিলাম মোনঘরে। সাথে রইল স্মৃতি বিজরিত অনেক ঘটনা। যা একটা বই রচনা করলেও হয়তো শেষ করা যাবে না। তাই আমি এমনি একটা ক্ষুদ্র স্মৃতির কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১৯৮৮ সাল। খুব সম্ভবত: ডিসেম্বর মাস। সেই বৎসর সদ্য এস,এস,সি পাশ করে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছি। কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত ছিল বাঁশের বেড়া ও টিনশেডের একটি ভবন। এটি মূলত: মোনঘর এর মূল ক্যাম্পাস থেকে খানিকটা বাইরে পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রায় ২০-২২ জনের মতো ১ম এবং ২য় বর্ষের ছাত্ররা মিলে এখানে থাকতাম। আমার রুম মেট ছিল অময়ন্ত দেওয়ান, জ্ঞানান্ত চাকমা ও প্রজ্ঞাজ্যোতি চাকমা (যাকে আমরা ফুঙ নামে ডাকতাম)। আমাদের রুমের দক্ষিণ পার্শ্বের রুমে ছিল শৈলেশ্বর চাকমা ও বিনয় কান্তি চাকমা এবং উত্তর পার্শ্বে রুমে ছিল অনুমোদশী দেওয়ান (বর্তমানে মোনঘরে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত), প্রিয়তর চাকমা (বর্তমানে UNDP-CHTDF, খাগড়াছড়িতে কর্মরত), সুশীল বিকাশ দেওয়ান ও আরো অনেকে। একদিন (তারিখ ও বার মনে নেই) যাথারীতি কলেজ থেকে ফিরে সন্ধ্যা সময়ে খাওয়া-দাওয়ার পর কলেজ পড়ুয়া আমার এক বন্ধু (নাম মনে নেই) প্রস্তাব দিল, "চল, টিভি দেখতে যাই"? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়? সে আঙ্গুল তুলে ঈঙ্গিত দিয়ে দেখালো, "ঐ, প্রেসিডেন্ট ভবনে" *(এক সময় এ ভবনে মোনঘর এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমল তিষ্য ভান্তে এখানে অবস্থান করতেন, তাই এ ভবনটি প্রেসিডেন্ট ভবন নামে পরিচিত)।* আমি কোন ভাল-মন্দ চিন্তা না করে তাৎক্ষণিক তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। সাথে আরো অনেকে। কারণ প্রেসিডেন্ট ভবনের টিভিটা ছিল রঙ্গিন এবং অনেক বড়। সেখানে টিভি দেখার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে। ইতিপূর্বে আমাদের ভবনের অনেকেই সেখানে প্রায় সময় টিভি দেখার জন্য যেত। কিন্তু সংখ্যায় ছিল খুব কম। আজ সংখ্যাটা একটু বেশী হয়েছে। তবে আমি এর আগে কখনো যাইনি।

কিছুক্ষনের মধ্যে (আনুমাসিক সন্ধ্যা ৭টা) আমরা সবাই প্রেসিডেন্ট ভবনে পৌঁছলাম। টিভিটা ছিল পরিচালক ভান্তের শয়ন কক্ষে। রুমের দরজা খোলা এবং টিভিও চালু অবস্থায় ছিল। উপস্থিত সব বন্ধুদের সাথে আমিও ভান্তের রুমে প্রবেশ করলাম। পরিচালক ভান্তের শয়ন কক্ষের পাশে ছিল একসেট সোফা, একটি আলনা এবং মধ্যখানে কার্পেট বিছানো পাকা ফ্লোর। আমরা সবাই ফ্লোরে উপর বসলাম। তন্মধ্যে দু-একজন সোফার উপরে বসল। পরিচালক ভান্তে খুব সম্ভব তখন ভবনের বাইরে অবস্থান করছিলেন। পরিচালক ভান্তেকে সেবা যত্নে সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকতেন একজন শ্রমন। ঐ শ্রমনও আমাদের সাথে বসে টিভি দেখছিল। কিছুক্ষণ পর পরিচালক ভান্তে রুমে প্রবেশ করলেন। সদ্য ন্যাড়া মাথা। গোলগাল মাথা বিদ্যুৎতের আলোতে চিক্ চিক্ করছে। ভান্তের চেহারা দেখে আমি মনে মনে ভাবলাম, আজ আমাদের উপর বুঝি শনির দশা ভর করেছে। কারণ বিগত পাঁচ বৎসর ধরে আমাদের

সবার অভিজ্ঞতা ও ধারণা হলো যে, যেদিন পরিচালক ভান্তে মাথা ন্যাড়া করে ঐদিন তাঁর মুড ও মেজাজ একটু অন্যরকম থাকে এবং আমরা অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশী ভয় পেতাম। আজকেও তাই। রুম ভর্তি অনেকগুলো ছেলের সমাগম দেখে তিনি খুব বিরক্ত বোধ করলেন। স্বভাব সূলভ আচরণে সবার উদ্দেশ্য বিরক্ত সুরে বললেন, "কলেজে মাত্র ভর্তি হয়েছো, নিজেদেরকে খুব বড় মনে করতেছো? যাও, আমাদের সাথে বসে টিভি দেখতে চাইলে আগে এম.এ পাস করে এসো, তার আগে নয়।" এরপর আমরা লজ্জায় নীরবে স্থান ত্যাগ করে নিজ নিজ রুমে চলে আসি। আমি এখনো মাঝে মাঝে ভান্তের সেই স্মরণীয় উপদেশ বাণী স্মরণ করি। বিরক্ত হলে আমিও মাঝে মধ্যে আমার ছাত্রদেরকে তাঁর মতো বলেও ফেলি। ভান্তের ঐ দিনের কথাকে আমি উপদেশ বাণী হিসেবে মেনে নিয়েছি এ কারণে যে, পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তা যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, আমার চাক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করি (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)। যদিও পরবর্তীতে আরো অনেকে মোনঘর এর আর্থিক সহায়তা নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

আমাদের চাক্ সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষায় আলোকিত হওয়ার পিছনে মোনঘর এর অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাই এর পিছনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, যাঁদের অক্লান্ত শ্রম, মেধা, প্রজ্ঞা ও ত্যাগ রয়েছে, বিশেষ করে মোনঘর শিশু সদনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিমল তিষ্য ভান্তে, সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ ভান্তে ও পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার ভান্তেদেরকে আমি এবং আমার সম্প্রদায় আজীবন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে। যাঁদের ছায়ার আশ্রয় না হলে হয়তো আজকের আমার এ অবস্থানে আসা সম্ভব হতো না। আমি তাঁদের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলময় জীবন কামনা করছি। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বর্তমানে মোনঘর পরিচালনা পরিষদের সাধারন সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই কীর্তি নিশান চাকমা ও তাঁর সহযোগীদের, যাঁরা কঠিন-দু:সময় ও হাজার প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে এ মোনঘরকে একটি আদর্শ মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের অগ্রযাত্রা সুন্দর ও সফল হোক এবং আমি সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

উপন্যাস

এক রূপোলি নদী

সেলিনা হোসেন

সম্পাদক মন্ডলীর মন্তব্য

প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন এর পরিচয় বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে নতুনভাবে তুলে ধরার কোন প্রয়োজন নেই। সাম্প্রতিক সময়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল তিনি। তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর; গায়ত্রী সন্ধ্যা, হাঙর নদী গ্রেনেড, মগ্ন চৈতন্যে শীষ, যাপিত জীবন, পোকামাকড়ের ঘরবসতি ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সৃষ্টির তালিকায় ইতোমধ্যেই অন্তর্ভূক্ত।

১৯৮৬ সালে খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলায় বোয়ালখালীতে অবস্থিত **"পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম"** তৎকালীন অশান্ত পরিস্থিতিতে দুঃখজনকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আশ্রমে সেই সময় ১৫০ এর মত শিশু পড়াশুনা করছিল। আশ্রমের উপরে আক্রমনের সাথে সাথে, অবস্থানরত ১৫০ জন শিশুসহ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাই যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। অধিকাংশই পরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়, বাকীরা রাঙ্গামাটিতে মোনঘরে এসে ভর্তি হয়।

শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া এই শিশুদের মধ্যে ৭২ জন শিশুকে পরে ফরাসী বেসরকারী সাহায্য সংস্থা পার্টাজ আভেক লেজঁফঁ দ্যু টিয়ের মনঁড এর সহায়তায় ফ্রান্সের ৭২টি পরিবার দত্তক নেয়। শরণার্থী শিবির থেকে ফ্রান্সে দত্তক নেওয়া, সে আরেক দীর্ঘ কাহিনী। এই সংকলনে দত্তক নেওয়া চার পরিবারের এবং একজন শিশুর স্মৃতিচারণা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকরা নিবন্ধগুলো পড়ে দেখতে পারেন ***(দ্বিতীয় অংশের নিবন্ধ নং- ৩, ৪, ৫ ও ৬)।***

যাহোক, আমরা উপন্যাসটি'র কথায় ফেরত আসি। ১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত ইতিহাসের কাহিনী খুব কমই বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাঁপা হতো। পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের ধ্বংস হওয়া, ভারতের শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই নেওয়া এবং ফ্রান্সে দত্তক সন্তান হিসাবে অচেনা দেশে পাড়ি দেওয়ার কাহিনী তো নয়ই।

বস্তুত: ৮০'র দশকের পুরোটাই বাংলাদেশ ছিল স্বৈরাচারী শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট। সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বরই ছিল রাষ্ট্রীয় সেন্সরের কাছে রুদ্ধ। পরবর্তীতে ৯০'এর দশক থেকে, গনতন্ত্র পূন:রুদ্ধারের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের কথাও মাঝে মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে থাকে। একদিন এরকমেরই কোন এক পত্রিকার ভিতরের পাতায় প্রকাশিত একটি ছোট্ট সংবাদ (পত্রিকার সঠিক নামটির কথা লেখক স্মরণ করতে পারেন নি) সেলিনা হোসেনের চোখে পড়ে। সংবাদটি তাঁর সৃজনশীন মানবিক সত্বাকে আলোড়িত করে তোলে। কিন্তু পুরো ঘটনাটি তাঁর অজানা ছিল এবং সেসময়ে জানার মত কাউকে তিনি চিনতেনও না।

কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেন, ঘটনাটিকে নিয়ে একটি গল্প বা উপন্যাস লেখার। লেখাটি শেষ হওয়ার পর ২০১৪ সালে "নবরাগ প্রকাশনী" কর্তৃক "এক রূপোলি নদী" শিরোনামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর কাছে একটি লেখা চাওয়া হলে তিনি গল্পটিতে অর্ন্তভূক্ত করার পরামর্শ দেন। লেখকের অনুমতি নিয়ে এই গল্পটিই হুবহু মোনঘরের ৪০তম বার্ষিকীর সংকলনে প্রকাশ করা হল। *গল্পটির বিভিন্ন জায়গায় কিছু তথ্যগত ভূল রয়েছে। সেগুলিকে পাদটীকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

=এক=

জুন মাসের তেরো তারিখে একটা কিছু ঘটবে এমন আশঙ্কায় পাহাড়ের নিচে সমতলের কুকুরগুলো খুব ঘেউঘেউ করছিল। পার্বত্য অনাথ আশ্রমের[৬] তিনশ[৭] ছেলে গভীর নিষ্ঠায় প্রতিদিন পাঠ শিক্ষা করতো। কিন্তু কয়েকদিন ধরে আশেপাশের গাঁয়ের বাড়িঘর জ্বালানো-পোড়ানো শুরু হলে ওদের আর বই নিয়ে বসা হচ্ছিলো না। ভিক্ষু-শিক্ষকরাও ওদের আর পাঠ শেখার কথা বলতো না। সবাই খুব সন্তর্পণে চলাফেরা করতো, কোথাও জোরে কোনো শব্দ হলে ছোটরা একে অন্যের হাত শক্ত করে ধরে চারদিকে তাকাতো। তারপর হয়তো বুঝতে পারতো যে লিচু গাছের ডালে বসে কোনো কাক ডাকছিলো। নয়তো ঘরের পেছনে হুলো বেড়ালরা ঝগড়া করছিলো। বেড়ালগুলোর মেজাজ কখন যে কী রকম থাকবে তা বোঝা মুশকিল। তারপরও ওগুলোর ঝগড়া সাধারণ সময়ে তেমন কানে লাগে না। কিন্তু এখন সময়টা অন্যরকম। ভয়ানক ও বুক-আছড়ানো। বিশেষ করে মিলিটারির গুলির শব্দ শুনলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে দু'হাতে কান চেপে ধরে রাখে। ভাবে এই বুঝি যুদ্ধ শুরু হবে। সাইরেন বাজবে। তারপর পাহাড়ের উপরে ছুটে আসবে প্লেন। বোমা ফেলে গুঁড়িয়ে দেবে পাহাড়িদের গ্রামগুলো। অনাথ আশ্রমের তিনশ ছেলের বয়স পাঁচ থেকে বারোর মধ্যে। ওদের বুদ্ধিই বা কী? কিন্তু এইটুকু জীবনে ওরা অনেক কিছু দেখেছে। ওরা চোখ বন্ধ করে রাখতে শেখেনি।

দু'দিন ধরে সবাই প্রবল ভয়ে নেতিয়ে আছে। কারও মুখে কথা নেই। কথা বললেও ফিসফিসিয়ে বলে। ছোটরা নিজেরাই বিপদের আঙ্কায় এমন আচরণ করছে। বড়রা কেউই ওদেরকে এমন আচরণ করার কথা বলে দেয়নি। তারপরও ছোটরা বুঝে যায় যে সময়টা ভীষণ খারাপ। সামনে বিপদ।

দু'দিন আগে আশ্রমের কাছাকাছি বাড়িঘরগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় বাঙালিরা। বাড়ির লোকজনেরা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ পালাবার সুযোগ পায়নি। আর্মির গুলিতে অনেকে মারা গেছে, অনেকে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। বাঙালিরা পাহাড়িদের তাড়িয়ে দিয়ে বোয়ালখালের[৮] এই এলাকাটা দখল করতে চায়। বাঙালিদের

[৬] প্রকৃত নাম পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম

[৭] প্রকৃত সংখ্যা ১৫০ এর মত। আশ্রমের পরিচালক বৌদ্ধভিক্ষু এবং শিক্ষক, দায়ক এবং তাদের পরিবার সহ সবাই মিলে ২০০ এর সামান্য বেশী হতে পারে।

[৮] প্রকৃত নাম বোয়ালখালী

সঙ্গে আছে আর্মি। আর্মির সহযোগিতা পেয়ে বাঙালিদের সাহস বেড়ে গেছে। ওরা সমতল ভূমি থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে জমি-জমা দখল করে মেরে-ধরে হুলস্থুল কান্ড ঘটায় যখন-তখন। দশ বছরের উৎপল বলে, ছয় মাস আগে বাঙালিরা আমার বাবা-মাকে আমাদের বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দিল বলেই না আমি এই আশ্রমে এসেছি। ওরা আমাদের বাড়ি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

এখানে থাকতে তোর খারাপ লাগছে?

একটুও না। আমার মনে হচ্ছে স্বর্গে আছি।

ও আব্বা, তুই স্বর্গ কি জানিস?

শুনেছি স্বর্গ খুব সুন্দর জায়গা। ওখানে কারো দুঃখ নেই। এখানেও আমার দুঃখ নেই। তাহলে এটা স্বর্গ হবে না কেন?

ঠিক বলেছিস। এটা আমাদের জন্য স্বর্গই।

এভাবেই এরা এখানে দিন কাটায়। ভালো থাকার চেষ্টা করে। এখানকার কোনো কোনো ছেলেদের বাবা-মা আগুনে পুড়ে মারা গেছে, কেউ কেউ বাঙালিদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছে, কেউ আর্মির গুলিতে। অনেকের বাবা-মা এতোই গরিব যে অভাবের তাড়নায় ছেলেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে এখানে থাকলে নিরাপদে থাকবে। পড়ালেখা শিখতে পারবে। মানুষ হবে। সেভাবে ওরা নিজেরা তো নিজেদের মতো করে বেশ ভালোই আছে এখানে। এমন কোনো বিপদ হতে পারে ওরা তো ভাবতেই পারছে না। বেশি ছোট যারা তারা ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কখনো একসঙ্গে অনেকে কেঁদে বলতে থাকে, আমি মায়ের কাছে যাবো। আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু কেমন করে বাড়িতে পাঠাবে? অজানা বিপদের আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গেছে আশ্রম। ভিক্ষু-শিক্ষক এবং ছেলেদের ভীত চেহারায় আশার আলো নেই। আশ্রম পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। একদল পাহারা দেয়, আর এক দল ঘুমায়। এভাবে রাত কাটে। রাতে কুকুরগুলো তার স্বরে চেঁচায়। মনে হয় ওগুলো কাঁদছে। ছোটরা ঘুমুতে পারে না। ধড়মড় করে উঠে বসে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি কি বেঁচে আছি নাকি মরে গেছি? নীলাঞ্জন, লিচু গাছে আটকে থাকা ঘুড়িটা আমি তোকে দিলাম।

নীলাঞ্জন মৃদুলের কাছে গিয়ে বসে। বলে, আহ্ চুপ কর। এমন করে কাঁদার সময় এটা না।

তাহলে এখন কিসের সময়? আমি যে চুপ করে থাকতে পারছি না। আমার যে দম আটকে আসছে।

মৃদুল কাঁদতে কাঁদতে বালিশে মুখ গোঁজে। ওর ফোঁসফোঁস শব্দে অন্যেরা উঠে বসে। অন্ধকারে ওদের কালো কালো মাথাগুলো ছোট ঢিপির মতো লাগে। যেন ঢিপির ওপারে আকাশ নেই। আকাশে কোনোদিন চাঁদ উঠবে না। প্রত্যেকের মাথা হাঁটুর ওপরে নেমে গেলে প্রত্যেকের বুকের ভেতর থেকে কান্নার ধ্বনি উঠে আসে। তা পুরো আশ্রমে ছড়িয়ে যায়। ভিক্ষু-শিক্ষকরা সেই শব্দ শুনে দরজা খুলে বাইরে আসে।

ছোটদের কান্নার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুকুরগুলো চেঁচাচ্ছে। আর কোনো শব্দ নেই। ঘাতকেরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। যারা পাহারা দিচ্ছিলো তাদের কেউ কেউ ছুটে এসে বলে, আমরা কি ওদের থামতে বলবো?

একজন ভিক্ষু-শিক্ষক ধমক দিয়ে বলে, না। ওদের কান্না শুনুক আকাশ, মাটি, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ।

তাহলে কী হবে?

ওদের জন্য প্রার্থনা করবে। ওরা যেন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়–তার জন্য প্রার্থনা।

মৃণাল কান্তি বলে, আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই যা নিয়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। বলতে পারি, তোমরা এমন অন্যায় কোরো না। আমরা অবোধ শিশু। আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি। আমরা শান্তি মতো বাঁচতে চাই।

ঘাতকেরা শিশু চেনে না।

কে যেন জলদগম্ভীর স্বরে কথা বলে।

এসো আমরা প্রার্থনা করি। তাহলে ওরা বিবেকবান মানুষ হবে।

ওরা মাটির উপর বসে পড়ে। ওদের ঘার নিচু হয়ে যায়। ওরা বুকের কাছে হাত উঠিয়ে করতল যুক্ত রাখে।

আজ অমাবস্যা। মাথার উপরে আম গাছের ডাল থেকে শুকনো পাতা ঝরে দু'চারটা। কুকুরের চিৎকার থেমে গেছে। বাতাসের শনশন শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ওরা একে অন্যের নি:শ্বাসের শব্দ শুনতে পায়। পুলক কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি বাড়িতে যাবো।

অমর ওর হাতে চাপ দিয়ে বলে, ওরা তোমার বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পুলক। ওখানে এখন চাষ হয়। তোমার বাবা-মা তাকুমবাড়ি শরণার্থী শিবিরে আছে।

আমি কি আমার বাবা-মাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবো না?

পাবে, নিশ্চয় পাবে। একদিন-না-একদিন আমরা সুদিন ফিরে পাবো। আবার পাহাড়ের উপর আমাদের চমৎকার বাড়ি হবে। আমরা জুমচাষ করবো। মায়েরা ভাত রান্না করবে। গরমে ভাতের ধোঁয়া উড়বে আমাদের প্লেট থেকে। আমাদের কুকুরগুলো-

আহ্ থামো। এত কথা বলছো কেন তোমরা?

আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই না কেন শরণার্থী শিবিরে?

না, আমরা যাবো না। একজন শিক্ষক ওদের ধমক দেয়। ভিক্ষু-শিক্ষক নন্দলালের ভরাট কণ্ঠ শুনে সবাই বুঝতে পারে তিনশ শিশু নিয়ে শিক্ষকরা জঙ্গলের পথে পালাতে চান না। গহিন জঙ্গলের পথ শিশুদের জন্য নিরাপদ নয়। ওরা বিপদসঙ্কুল পথে হাঁটতে পারবে না। ওদের জীবনের ঝুঁকি তৈরি হবে। শিক্ষকরা চান না শিশুদেরকে আশ্রম জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঘন জঙ্গলে আকাশের নিচে দাঁড় করিয়ে দিতে।

ওরা কেন আশ্রম ছাড়বে? ওদেরকে একটি নিরাপদ জায়গায় রাখা হবে বলেই তো এই আশ্রম তৈরি হয়েছিল। শিক্ষকের ধমক খেয়ে ছোটরা গুটিসুটি বসে থাকে।

রাত বাড়ে। শিক্ষকদের কেউ কেউ প্রাঙ্গণে পায়চারি করছেন। বিমল ভিক্ষু ভীষণ উদ্বিগ্ন। তিনি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। দীর্ঘ বছর ধরে যত্নে, মমতায়, ধৈর্যে, পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন এই আশ্রম। মাত্র এক লহমায় সেটা কি বিলীন হয়ে যাবে? বিমল ভিক্ষু কখনও রাগে ফেটে পড়েন, কখনো অসহায় হয়ে দু'হাতে চোখের জল মুছতে থাকেন। কীভাবে নিজেকে স্থির রাখবেন ভেবে পান না। কীভাবে প্রতিরোধ করবেন সেটাও জানেন না। প্রাঙ্গণে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা ভয়ার্ত ছেলেদের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না অন্ধকারে, কিন্তু ওদের ভয়ার্ত চেহারা কেমন হতে পারে তা তিনি ঠিকই দেখতে পান। হৃদয় দিয়ে দেখেন, ভালোবাসা মমতায় দেখেন। ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। নিজের বাসভবন থেকে বেরিয়ে আশ্রমের চারপাশে ঘোরেন। না, ঘাতকরা অন্তত এই রাতে আশ্রমের চারপাশে নেই। মাত্র সাতদিন আগে দীঘিনালায় গিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছেন। লাভ হয়নি। কেউ কেউ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেছেন, আপনাদের জন্য তো ভারতে শরণার্থী শিবির আছে। চলে যান সেখানে। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার শরণার্থী শিবির খুলে রেখেছে তাকুমবাড়ি, সাবরুম, খরবুক, কাঁঠালছড়ি কতো জায়গায়। অসুবিধা কী চলে যেতে?

বিমল ভিক্ষু রেগে বলেছিলেন, কেন যাবো? এটাই তো আমাদের আদি জায়গা। আমাদের মাতৃভূমি। নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে কেন অন্য জায়গায় যাবো? আপনারা যাবেন?

ও বাবা তেজ দেখাচ্ছে!

পাছায় বাড়ি পড়লে তেজ ছুটবে।

ঠেলার নাম বাবাজি। গুঁতো দিলে ঠিকই ভারতে পালাবে। আর ক'টা দিন থাকুন। দেখবেন ঠেলা কাকে বলে।

অপমানে, লজ্জায় বিমল ভিক্ষু হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পিশাচের মুখ দেখা পাপ মনে করে বেরিয়ে এসেছিলেন অফিস থেকে। দীঘিনালা থেকে বোয়ালখালি বাসে চার ঘন্টার মতো[৯]। সেদিন মনে হয়েছিল যে বাসে তিনি উঠেছিলেন সেটা কোথাও থামবে না। তার আর নামার উপায় নেই। ওটা পথ ফুরালে যেখানে গিয়ে ধাক্কা খাবে সেখানে ওকে নামতে হবে। সে জায়গাটা ওর আর নিজের জায়গা থাকবে না। বিমল ভিক্ষু বোয়ালখালি ফেরার পথে চুপিচুপি কেঁদেছিলেন। আশ্রমের তিনজন ছেলে তাঁর বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো সামনের মহাদুর্দিন ওরা কি করে সামলাবে!

---

[৯] সেই সময়ে দীঘিনালা থেকে বোয়ালখালী যাওয়ার জন্য গাড়ী চলাচলের কোন উপযোগী রাস্তা ছিল না, কোন বাস সার্ভিস তো নয়ই। খানা-খন্দে ভরা রাস্তা মাঝে-মধ্যে চাঁদের গাড়ী চলাচল করতো। যোগাযোগের মাধ্যম সচরাচর ছিল পায়ে হাঁটা এবং দূরত্ব তিন কিলোমিটারের মত হবে।

এই মুহূর্তে তিনি চিন্তা, আশঙ্কায়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভীষণ চাপে আছেন। যেদিকে তাকান সেদিকেই তাঁর স্মৃতি। বুক ভেঙে যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন ঘাতকদের আগ্রাসন থেকে এ আশ্রম রক্ষা করা কঠিন হবে। তিলতিল করে গড়ে তোলা এই আশ্রমের সবখানেই তো শিশুদের পা পড়ে আছে, কোথা থেকে তিনি একটু জায়গা বের করবেন, যেটুকু দিয়ে ওদের বলবেন, তোমরা এইটুকু নাও, আর চেয়ো না।

তাঁকে অন্ধকারে আসতে দেখে ছুটে আসে কয়েকজন ছেলে। চেঁচিয়ে বলে আমাদের ভয় করছে।

তোমরা শান্ত হও।

ওরা কি আমাদেরকে মেরে ফেলবে?

ভগবান আমাদের সহায় হবেন।

ওরা আমার বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে। আমিও মরে যেতে চাই।

আমিও।

না, আমি মরতে চাই না। আমি ভান্তে হবো। মানুষের সেবা করবো।

এদের সঙ্গে বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না বিমল ভিক্ষুর। তাহলে নানা মিথ্যে কথা বলে এদের সান্ত্বনা দিতে হবে। সেটা সম্ভব নয়। শান্ত স্বরে বলেন, তোমরা যাও নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসে থাকো।

আমরা আপনার কাছে থাকি?

না, আমার সঙ্গে না। আমি চারদিক ঘুরে দেখবো। তোমরা যাও।

ছেলেরা নি:শব্দে চলে যায়। এই অন্ধকারে ওদের চোখ বুঝি বেড়ালের মতো জ্বলে। ওরা ঠিক ঠিক চলে যেতে পারে। আসলে প্রতিদিনের চেনা এই জায়গায় ওদের পা ভুল জায়গায় পড়ে না।

বিমল ভিক্ষু দূর থেকে খেলার মাঠটার দিকে তাকান। একদিন কি বাঙালিরা এই মাঠে বাড়ি উঠিয়ে বসতি বানাবে? মন্দিরটা কি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে? ছেলেদের থাকার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে আনন্দ ভবন, করুনা ভবন, পালকধন ভবন- এসব কি রাখতে পারবে? মুচড়ে ওঠে বুক। ওই দূরের রান্নাঘর। প্রতিদিন তিন-চারশ লোকের রান্না হয়। ওরা সারি করে বসে একসঙ্গে সকালের, দুপুরের, রাতের খাবার খেয়েছে। ফুলের বাগানে জল দিয়েছে। মৌসুমে ওরা ফুলগাছ লাগিয়েছে। এখনও অসংখ্য গাছে ফুল ফুটে আছে। যত ধরনের জবাফুল পাওয়া যায় সব এই আশ্রমে আছে। কত জায়গা থেকে এসব চারা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিমল ভিক্ষু বেশি কিছু ভাবতে চান না। বারবার চোখ ভিজে যায়। ফুটবল মাঠে ছেলেদের খেলা এবং অন্য দলের আনন্দ- উত্তেজনা সব কেমন আর্তনাদের মতো মনে হচ্ছে এখন। তিনি আর এ বাতাস বুকে টানতে পারছেন না। কেবলই আর্তনাদ আর কান্নার ধ্বনি তার কানে বাজে। তিনি দ্রুতপায়ে চারদিকে ঘুরে সবার কাছে এসে দাঁড়ান। ছোটদের কাছে ডেকে বলেন, তোমরা ঘুমুতে যাও।

কেউ কেউ বলে, আজ রাতে আমরা বুঝি বেঁচে গেলাম।

ছোটরা সারি বেঁধে ঘরে চলে যায়। প্রতিদিন খুব ভোরে পাখির ডাকে ওদের ঘুম ভাঙে। ওরা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সূর্য ওঠা দেখে। ফুরফুরে বাতাসে একে অন্যের হাত জড়িয়ে ধরে বলে, সুপ্রভাত। আমাদের জীবনে যেন শান্তি অক্ষয় হয়।

যে ক'জন ছেলে পাহারায় ছিল তারা নানা কথা বলে নিজেদের ভয় দূর করতে চায়। অরুন বলে, কোন তারাটা আমার মা বল তো?

তাপস বলে, আমার দেড় বছরের বোনটা যেদিন মারা গেলো মা মাটিতে মাথা ঠুকে কাঁদছিলো। আমি বোকার মতো মাকে বললাম, আমিও কি কাঁদবো? মা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আরও জোরে জোরে কাঁদছিলো। আমি ভাবছিলাম, মরে গেলে ছোট্ট বাচ্চারা বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর পাখি হয়। আমার বোনটা পাখি হবে। আর আমাদের বাড়ির আম গাছটার ডালে বসে ডাকবে। আমি বলবো, ছোট্ট পাখি ঘরে এসো। আমি তোমাকে চাল খেতে দেবো। জানিস এই আশ্রমে আমি একটি দারুন সুন্দর পাখি দেখতে পাই! আমার মনে হয় ওই পাখিটাই আমার বোন। ও ঠিকই আমার কথা বুঝতে পারে। ও কোন্ তারা সেটা আমি কখনো খুঁজবো না। ও তারা হয়নি। ও আমাদের ছেড়ে অত দূরে যাবে না।

ওদের মধ্যে একটু বড় বুদ্ধজয় বলে, আয় আমরা ফুটবল খেলি। এই আশ্রম থেকে যদি আমাদের তাড়িয়ে দেয় তাহলে তো আর কোনোদিন এই মাঠে খেলা হবে না।

এই মাঠটা ওরা কী করবে রে?

সবাই চুপ করে থাকে। এই মাঠ, এই আশ্রম দখল করে ওরা কী বানাবে, কেনই বা ওরা এমন হিংস্র হয়ে উঠেছে? ওরা তো কিছু করেনি, ওদের সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়াও হয়নি। তবে? বুদ্ধজয় নিজে নিজেই বলে, আমার মনে হয় এই মাঠটায় ওরা একটা বাজার বানাবে।

না, আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় ওরা ঘর-বাড়ি বানাবে। এখানে একটা পাড়া হবে।

নন্দকিশোর হিহি করে হাসতে হাসতে বলে, আমার মনে হয় প্রেসিডেন্ট এরশাদ হেলিকপ্টার নিয়ে এই মাঠে এসে নামবে। আর্মি বন্দুক নিয়ে তাকে স্যালুট দেবে। বাঙালিরা ফুলের মালা নিয়ে আসবে।

হিহি করে হাসে সবাই। তাপস চিন্তিত কণ্ঠে বলে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ এখানে এসে কি করবে? আমাদের মুন্ডুপাত? আমি চাই না প্রেসিডেন্ট এরশাদ এখানে আসুখ। যদি আসে তাহলে আমি হেলিকপ্টারের পাখা ভেঙে দেবো। সেটা যেন আর কোনোদিন আকাশে উড়তে না পারে।

তুই একটা হেলিকপ্টারের পাখা ভাঙলে কী হবে। আর একটা আসবে। দেখিস না আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে উড়ে হেলিকপ্টারগুলো আর্মি ক্যাম্পে রেশন নিয়ে যায়।

তিক্তকণ্ঠ ঝরে পড়ে খুদেদের দল থেকে। কেউ একজন বলে, ওই রেশন খেয়ে মোটাতাজা হয়ে ওরা আমাদের ওপর গুলি চালায়। আমরা মরে চিৎপটাং হয়ে যাই।

ঠিক বলেছিস। সুরমোহন কাকাকে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। কাকার চোখ দুটো খোলা ছিল। মুখটা হাঁ করা। গুলিতে বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো। রক্ত–।

চুপ কর। আমি শুনতে পারছি না।

পুলক ভেউভেউ করে কাঁদতে থাকে। স্তব্ধ হয়ে যায় পরিবেশ। কেউ আর ফিসফিস করেও কথা বলে না। একসময় বুদ্ধজয় চিৎকার করে বলে, আয় আমরা প্রতিজ্ঞা করি।

প্রতিজ্ঞা? কিসের জন্য প্রতিজ্ঞা?

আমরা একটা দল বানাবো। আমাদেরকে যারা মারবে আমরা তাদেরকে মেরে ফেলবো।

দল বানাতে হবে কেন? আমরা সবাই দলে দলে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেবো। আমরা যুদ্ধ করবো।

হ্যাঁ, আমরা যুদ্ধ করবো।

উৎপল বলে, আমাদের বড় হতে কত সময় লাগবে? আমার ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি যেন বড় হয়ে যাই। এক লাফে আকাশ ছুঁয়ে ফেলি। বন্দুক চালাতে শিখি। আমাদের মানুষদের হত্যার প্রতিশোধ নিই।

এই আশ্রমে এইসব কথা মানায় না।

আয় আমরা শান্তির গান গাই।

সামনে যুদ্ধ। এখন শান্তির গান চলবে না।

কখনো কখনো যুদ্ধই শান্তি। আমরা যুদ্ধের শান্তি চাই।

এটা আবার কেমন কথা?

যুদ্ধ আর শান্তি কি একসঙ্গে হয়?

প্রথমে যুদ্ধ, তারপর শান্তি। আমরা সেই শান্তির কথা বলছি।

আমাদের অস্ত্র কোথায়?

আমরা ওদের সঙ্গে পারবো কেন? আমরা তো কত ছোট!

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই বলে কেউ আর কথা বলে না। তখন শুদ্ধানন্দের নেতৃত্বে অন্য দল আসে পাহারা দেওয়ার জন্য।

এই তোরা সব ঘুমুতে যা।

তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে শুদ্ধ দাদা?

ছোট ছোট পোঁটলা গোছাচ্ছিলাম।

কী কী নিলে? আমরা তো সবাই একটা করে গুছিয়ে রেখেছি।

আমি গুছিয়েছি সবার জন্য দরকার হবে এমন একটা পোঁটলা। যেমন দু'টো হাঁড়ি, একটা ছুরি। অনেকগুলো ম্যাচ। দু-চারটা প্লেট, গ্লাস, ছোট মাদুর, টুকিটাকি আরও অনেক কিছু।

শুদ্ধানন্দ, আমাদের কি সত্যি পালাতে হবে?

আমি তো সেরকমই বুঝেছি। এসব গোছানোর জন্য আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে।

আমরা কোথায় যাবো?

তাকুমবাড়ি শরনার্থী ক্যাম্পে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা কেমন করে যাবো?

তোরা এখন ঘুমুতে যা। এতকিছু এখনই ভাবতে হবে না।

আজ রাতে আমরা হয়তো বেঁচে গেলাম। কাল কী হবে আমরা জানি না। আজ বৃহস্পতিবার রাত।

কাল শুক্রবার। কাল ওদের জুমার দিন। কাল ওরা নিশ্চয় আমাদের কিছু করবে না।

আর কেউ কোনো কথা বলে না। আসলে কথা বলার মতো মনের বল ওদের নেই। ছোটদের অনেকের ঘুমও পেয়েছে। ওরা এতক্ষণ জোর করে জেগে ছিলো। অনেক কিছুই তো ওরা বড়দের মতো করে ভাবতে পারে না। তারপরও ওরা কত অদ্ভুতভাবে বড়দের ভাবনায় ঢুকে পড়েছে। অন্য দলের ছেলেরা যখন পাহারা দিচ্ছে, আশ্রমের প্রাঙ্গণে পায়চারি করছে, পেয়ারা বাগান কিংবা লিচু বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকছে তখন ওদের মাথার উপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যায়। ওরা পাখা ঝাপটানির শব্দ পায়। ভাবে আশ্রমের পেছনে জঙ্গল। ক্রমাগত জঙ্গল ঘন হয়। কোথাও কোথাও জঙ্গল এত ঘন যে রাতদিনের পার্থক্য বোঝা যায় না। বোয়ালখালতে যে নদী আছে তার নাম মাটনি [১০] নদী। দীঘিনালাকে মাটনি ভ্যালি বলে। পাহারা দিতে দিতে শুদ্ধানন্দ ভাবে, আজ রাতেই বোধহয় আশ্রমের শেষ রাত। ওর মন বলছে এমনই ঘটবে। ও আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, বিদায় বোয়ালখাল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে, বিদায় মাটনি নদী।

একজন পাশ থেকে বলে, কার সঙ্গে কথা বলছিস রে? শুদ্ধানন্দ উত্তর দেয় না। দু'পা এগিয়ে অন্য পাশে যায়। ওর তো উত্তর জানা নেই। সত্যি তো ও কার সঙ্গে কথা বলছে? কার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে? যাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে ওরা তো উত্তর দিতে জানে না। কোনোদিন উত্তর দেবেও না। ওর বুক ভেঙে যায়। ওর ভীষণ কান্না পায়। ও নিচের দিকে নেমে যায়। ও দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে বলে, তোমাদের কাছে আমার কোনো অন্যায় হয়ে থাকলে তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও। মাটনি ভ্যালির সব মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি। সব প্রাণীর কাছে ক্ষমা চাইছি। বিনা অপরাধে আমাকে যে দানবের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছে। দানবদের বাঁধা দিয়ে আমি কারো জন্যই কিছু করতে পারলাম না।

পাশের গাছের কান্ড জড়িয়ে ধরে ও ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। ওর অন্যদের কথা মনে থাকে না। একটু পরে বুঝতে পারে অন্যরা ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকে কাঁদছে। একটি দলে ওরা বিশ থেকে পঁচিশ জন আছে হয়তো। কান্নার শব্দ জোরালো নয়, তবু তার ধ্বনি আছে। সেই ধ্বনি পাহাড়ে ধ্বনিত হয়। ধ্বনিত হয়

[১০] প্রকৃত নাম মাইনি নদী।

অন্ধকারে কিংবা আকাশে। অন্ধকার চৌচির হয়, কিন্তু বিপরীতে কোথাও আলো ফোটে না। এক সময় শুদ্ধানন্দ চোখ মুছে বলে, চলো আমরা গোল হয়ে বসি।

পরদিন তেরো জুন।

এদের অনেকে এখন থেকে পাঁচ বছর আগে এখানে এসেছে। এক-একটি বছর যায় আর কেউ কেউ ক্যালেন্ডারের একটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে সঞ্চয় করে। নিজের সঞ্চিত জিনিসের সঙ্গে রেখে দেয়। শুদ্ধানন্দও তাই করেছে। সকাল থেকেই ভিক্ষু-শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন। বুঝে গেছে অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আশপাশের গ্রামগুলোর বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। দাউদাউ আগুনের শিখা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। একটু পরে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। মানুষের চিৎকারের শব্দ আসছে। কান্না এবং আর্তনাদ মিলিয়ে অদ্ভুত শব্দ তৈরি হয়েছে মাটনি ভ্যালির চারদিক। শুদ্ধানন্দ ক্যালেন্ডার থেকে '১৯৮৬' লেখা একটি পৃষ্ঠা ভাঁজ করে পকেটে রাখে। ভিক্ষু-শিক্ষকরা ছেলেদের খাবার ঘরে এনে জড়ো করেন। যদিও সাতদিন ধরে আশ্রমে কোনো কাজ হয়নি, তবু খাবার ঘরের লেপাপোছা মাটির মেঝেতে ছেলেরা বসে পড়ে। ভিক্ষু-শিক্ষকরা বলেন, দানবরা যদি আমাদের মারতে আসে তবে পালানো ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তোমরা সবাই পেছনের জঙ্গলের ভেতর চলে যাবে।

তখন সকাল দশটা।

ছোটদের কোনো খাবার দেওয়া হয়নি। ছোটরা যারা বিষয়ের গুরুত্ব তেমন করে বুঝতে পারছে না তারা ক্ষুধায় কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারছে যে খাবার চেয়ে লাভ নেই। বড় একজন ছোট একজনকে বলছে, কাঁদিস না। একটু পরে আমরা মাটনি নদীর জল খাবো। পেট ভরে খাবে।

শুধু জলে কি পেট ভরে?

তখন ভয়ঙ্কর শব্দ হয়।

চমকে ওঠে সবাই। ভিক্ষু সত্যানন্দ বলেন, আমি দেখছি কী হচ্ছে। অল্পক্ষণ সময় মাত্র। এক মিনিটও নয়।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন, পালাও সবাই। ওরা আশ্রমের দিকে আসছে। হুঙ্কার করতে করতে ওরা ছুটে আসছে। ওদের হাতে রাম দা, কিরিচ, লোহার রড, কুড়াল, লাঠি এমন অনেক কিছু। ওদের কণ্ঠে হুম-হুম ধ্বনি।

ছোটরা পালাচ্ছে।

এই প্রথম আশ্রমের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। ওরা শান্ত, সৌম্য, নমিত নয়। ওদের আচরণে সারিবদ্ধ শৃঙ্খলার সঙ্গে নমনীয় মাধুর্য নেই। ঠেলাঠেলিতে বেশি ছোটরা উল্টে পড়ে যায়। ওদের ডিঙিয়ে পার হয়ে যায় খনিকটুকু বড় যারা, তারা। ছোটদের চিৎকারে আশ্রমের বাতাস ভারী হয়ে গেছে। ঘাতকেরা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার আগেই পাহাড়ের বিপরীত দিকের ঢালু বেয়ে নেমে যায় একটা দল। অসংখ্য ছেলে ঘরের ভেতরে আটকা পড়ে। ওদের ঘিরে ফেলে বাঙালি ঘাতকেরা।

যারা পালাতে পেরেছে তারা প্রাণপণে ছুটছে। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারলে ওরা আপাতত বেঁচে যাবে। ওরা বুঝতে পারে যে যারা আশ্রম আক্রমন করেছে তারা ওখানেই আছে। যারা পালিয়েছে তাদেরকে তাড়া করে জঙ্গলের দিকে আসছে না। ওরা প্রায় একশ জনের মতো দলটি ফাঁকা জায়গা খুঁজে বসে পড়ে।

ওরা ধুঁকছে।

ওদের দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। কেউ কেউ মাটিতে শুয়ে পড়েছে। কেউ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে। কাঁদতে কাঁদতে কারো গলা দিয়ে হেঁচকি উঠছে। প্রত্যেকেই বোঝে ওদের আর শক্তি নেই। ওরা সবাই মাটির উপর গড়িয়ে পড়ে। এখানে মাথার উপরে গাছের পাতার ঘন বিস্তার। নিচে শুধু ছায়া নয়, মাটিও স্যাঁতসেঁতে। ঘাস সবুজ হয়ে বিছিয়ে নেই। এবড়ো-থেবড়ো। ঘাসের ফাঁকে মাটি বেরিয়ে আছে। সেদিকে কারো কোনো খেয়াল নেই। ওরা গুটিসুটি শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না। চোখ বুজলে দু:স্বপ্ন প্রবল হয়। যাদের ফেলে এসেছে তাদের কথা মনে হয়। কচি মুখগুলো বুকের ভেতর গেঁথে গেলে ওদের মনে হয় সামনে মৃত্যু। ফেরার কোনো পথ নেই। নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা ওদের নেই। তবু ওরা বুঝে যায় যে দেশ ছাড়ার জন্যই ওরা বেরিয়েছে। ওদের লক্ষ্য শরণার্থী ক্যাম্প এবং সেটা ভারতের মাটিতে। আপাতত বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই।

কোন্ পথে পালাতে হবে তার একটি ম্যাপ জোগাড় করে রেখেছিলো ভিক্ষু সরলানন্দ। সঙ্গে আছে ভিক্ষু সুমোহন। এই দু'জনই এদের দলে বড়। কে কোথায় কোনদিকে গেছে তার কোনো হদিস নেই। যারা এখানে আছে তারা মরার মতো পড়ে আছে। দু'জনে ম্যাপ দেখে যাত্রাপথ ঠিক করে।

বিকেল গড়িয়েছে। পাতার ফাঁকে সূর্যের নরম আলো বনভূমিকে রহস্যময় করে রেখেছে। সুমোহন বলে, আমি এই লম্বা গাছটায় উঠে দেখি আশ্রমের অবস্থা কী?

হ্যাঁ, ওঠো। দেখার এখনই সময়। অন্ধকার হয়ে গেলে আর কিছু দেখা যাবে না।

সুমোহন ভয়ার্ত চোখে সরলানন্দের হাত ধরে বলে, দেখা যাবে। যদি আশ্রম পুড়িয়ে দিয়ে থাকে তাহলে আগুনের শিখা দেখা যাবে। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ পাবো।

সরলানন্দ দু'হাতে মুখ ঢাকে। শুদ্ধানন্দ এগিয়ে এস বলে, আমি গাছে উঠি? আপনাদের উঠতে কষ্ট হবে। আশ্রমে তো আমি লিচু পারার সময় সবচেয়ে তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে পারতাম। গাছ বাইতে আমার কোনো ভয় হয় না।

দু'জন ভিক্ষু-শিক্ষক ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই দলে বারো বছর বয়সী বা তারচেয়ে একটু বড় যারা আছে শুদ্ধানন্দ তাদের দলে। ও বেশ বুদ্ধি রাখে। চটপটে। সংসারে ওর কেউ নেই। এক গভীর রাতে ওদের বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে ওর বাবা-মা তিন ভাইবোন সবাই মারা যায়। ও তখন চার বছরের শিশু। বাড়ির বাইরে বেশ খানিকটা দূরে রাস্তার বাইরে পড়ে ছিলো। দু'দিন পরে কেউ একজন ওকে এই আশ্রমে পৌঁছে দেয়। কীভাবে সেদিন ও বাড়ির বাইরে আসতে পেরেছিলো সে

স্মৃতি ওর নিজেরও নাই। ও তখন দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করে তরতর করে বড় গাছটায় উঠে যায়। গাছের উপর থেকে পাহাড়ের উপড়ে তৈরি-করা আশ্রমের বাড়িগুলো দেখতে পায়। সব পুড়ছে। আনন্দ ভবন, করুনা ভবন, পালকধন ভবন, মন্দির, রান্নাঘর, কারিগরি বিদ্যালয় সব। তবে আগুনের শিখা উজ্জ্বল নয়, ধিকিধিকি জ্বলছে। টুকরো টুকরো আগুনের খন্ড। ছড়ানো-ছিটানো। কোনো জায়গা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোনো জায়গা ধিকিধিকি জ্বলছে। দূর থেকে পুরো আশ্রমের ল্যান্ডস্কেপ চেনা যায় না। জীবনের কতগুলো বছর ও এখানে কাটিয়েছে সেটা ভাবা ভীষণ কষ্টের। দমকা বাতাসে চামড়া পোড়ার গন্ধ এসে নাকে লাগে। তখন ওর ভেতরটা ওলট-পালট হয়ে যায়। ভবন পুড়ে যেতে দেখে যে কষ্টটা হয়নি তার চেয়েও দ্বিগুন কষ্টে ওর ক্ষুদ্র জীবনের সবটুকু ছারখার হয়ে যায়। ও চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

সুমোহন ঘাড় উঁচিয়ে ওকে ডাকে।

নেমে এসো শুদ্ধানন্দ।

ওর দিকে থেকে সাড়া নেই। কাঁদতে কাঁদতে ও গাছের ডালে মাথা ঠুকছে। বুক চাপড়াচ্ছে। পা ছুঁড়ছে।

তুমি উপর থেকে পড়ে যেতে পারো। শান্ত হও। সরলানন্দ চিৎকার করে কথা বলে।

নিচে পড়ে থাকা সেই দলটার সবাই উঠে বসে। ওরা নিচ থেকে শুদ্ধানন্দের দিকে তাকিয়ে আছে। শুদ্ধানন্দের বয়সীরা ছুটে এসে গাছে উঠতে চাইলে সরলানন্দ আর সুমোহন ওদের বাধা দেয়।

আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা উঠবো। কী হয়েছে দেখবো।

ওরা দু'জন ওদের হুঙ্কার দিয়ে থামায়।

তোমরা বাড়াবাড়ি করলে আমরা জীবন নিয়ে পালাতে পারবো না। আমরা তোমাদের বাঁচাতে চাই। তোমরা চুপ করে বসো।

ধমক খেয়ে ছেলেরা চুপ করে যায়, কিন্তু বসে না। ওরা শুদ্ধানন্দের দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকে। শুদ্ধানন্দ নামতে থাকে। ওর বন্ধুরা ওকে ঠাট্টা করে বানর বলতো। গাছ ওর কাছে এমন সহজ জায়গা ছিল। কোন ডালটা ধরে ঝুলতে হবে, কোন ডালে পা রাখতে হবে এটা ও খুব সহজে বুঝে যেতো। আজও এত লোকের মাঝে ঠিকঠিক গাছ থেকে নেমে পড়ে। চোখের জলে ওর গাল ভিজে আছে।

কী দেখলে?

আশ্রমের ওপর এখন বাঙালিরা চাষ করবে। ফসল ফলাবে। ওদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবে।

আমাদের ভবনগুলো?

ছাই হয়ে গেছে। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

পেয়ারা বাগান?

আছে। কিছু কিছু ডালপালা আগুনের তাপে পুড়েছে।

আমাদের মন্দির?

ভেঙে ফেলেছে। খানিকটা অংশ দাঁড়িয়ে আছে। মাটির সঙ্গে মিশে যায়নি।

আর–। কেউ একজন 'আর' বলে চুপ করে যায়।

অন্য একজন বলে, আমাদের খেলার মাঠ, কারিগরি স্কুল, রান্নাঘর, ফুল বাগান–।

ওহ্ হো, একটা কথা তোমরা বারবার কেন জিজ্ঞেস করো? কেন বুঝে নাও না সবকিছু?

সরলানন্দ আর সুমোহন ওর মাথায় হাত রেখে বলে, তুমি শান্ত হও শুদ্ধানন্দ। তোমার কাছে আমাদের আরও কিছু জানার আছে।

আমি জল খাবো।

আমাদের আশেপাশে জল নেই। আমাদেরকে একটি ছড়া খুঁজতে হবে।

তাহলে একটি ছড়া খুঁজুন। আমি পুরো ছড়ার জল খাবো।

তুমি শান্ত হও শুদ্ধানন্দ।

কেমন করে শান্ত হবো?

হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে গোটা দল। অনেক্ষণ ধরে কান্নার শব্দ পাহাড়ি নদীর মতো ক্রমাগত গড়াতে থাকে। ওই জলের ধারা বনভূমি পার হয়ে লোকালয় প্লাবিত করবে কি?

কাঁদতে কাঁদতে উৎপল বলে, তুমি কি অরুণকে দেখতে পেয়েছো?

দেখেছি।

জ্যোতিকে দেখেছো? জ্যোতি একটা সবুজ রঙের জামা গায়ে দিয়েছিলো।

পেয়েছি।

তুমি সন্দিকে দেখেছো?

দেখেছি।

তাহলে ওদের কথা তুমি বলছো না কেন?

ওরা কী করছে?

ওদের সবাইকে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

তারপর? তারপর কী হলো?

গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিলো। দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠলো। দাউদাউ আগুন।

শুদ্ধানন্দের চোখ বড় হয়ে যায়। চোখ লাল হয়ে যায়। এই মুহূর্তে ওই চোখ মাটনি নদীর সব জল শুষে ফেলেছে। রূপোলি নদীতে কোনো জল নেই যে তা দিয়ে শুদ্ধানন্দের চোখের আগুন নেভানো যায়।

তখন গোটা দল একসঙ্গে বলে, তুমি শান্ত হও শুদ্ধানন্দ। আমরা তোমার কাছে আর কিছু জানতে চাইবো না। আমরা সারা জীবন বোবা হয়ে থাকবো।

শুদ্ধানন্দ থামে না। চিৎকার করে বলতে থাকে, ওরা যারা ছোট ছিলো, যারা ঠেলাঠেলি করার সময় বড়দের সঙ্গে পেরে ওঠেনি তারা ঘরের ভেতর পুড়ে মরেছে। ওরা কালো কালো পিঁপড়ের মতো আশ্রমের চারদিকে পড়ে আছে। ওরা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। আমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করিনি। ওদেরকে বাঁধা দেয়নি। তারপরও ওরা আমাদেরকে পিঁপড়ে বানিয়েছে, কাক বানিয়েছে। ওরা আমাদের শিশুদের ছাই বানিয়েছে। আমাদের শরীরের ছাই বৃষ্টির জলে মাটিতে মিশে গেলে ওরা সেই জমিতে চাষ করবে। ফসল ফলাবে। ওদের শিশুরা সেই ফসল খেয়ে বড় হবে।

স্তব্ধ হয়ে থাকে দলটি। এমনকি সরলানন্দ এবং সুমোহনও কথা বলে না।

শুদ্ধানন্দ বনের ভেতরে এগিয়ে যায়। পায়ের নিচে শুকনো পাতা মচমচ করে। কখনো লতায় পা আটকে যায়। ও বনভূমিতে দৌড়াদৌড়ি করে বুক হালকা করতে চায়। পারে না। মোটা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে বলে– তুমি আমার কষ্ট ভুলিয়ে দাও। আমি কেমন করে সারাজীবন এই দৃশ্য মনে রাখবো? ও গিমা লতা, আমার দুঃখ শুষে নাও। তোমার লতার রসে ভিজিয়ে দাও আমার স্মৃতি। ও ঘাস বন্ধু, তোমার ঘন বনে আমাকে ডুবিয়ে দাও। আমি আশ্রমের পোড়া-স্মৃতি ভুলতে চাই। ও বাবা-মা, তোমরা কোথায় আছো? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?

শুদ্ধানন্দ পাগলের মত ঘুরতে থাকে। কখনো চিৎকার করে কাঁদে। কখনো ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করে। কখনো দু'হাতে চোখ মোছে। কখনো গাছের কান্ডে কপাল ঠুকলে ওর রক্ত মাখামাখি হয়ে যায়। তখন সুমোহন এসে ওর হাত ধরলে শুদ্ধানন্দ নেতিয়ে পড়ে। ও জ্ঞান হারিয়েছে।

=দুই=

দলটি এসে একটি ছড়ার ধারে পৌঁছে।

ওরা ওখানে থেমে যায়। জল পেয়ে ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'হাত ভরে জল খায়। শরীর ভেজায়। ওরা জল থেকে উঠতে চায় না। এদিকে শুদ্ধানন্দ অসুস্থ। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে। ডাকলে চোখ খোলে। সামান্য সাড়া দেয়। আবার নেতিয়ে পড়ে। গামছা ভিজিয়ে ওর কপালে জলপট্টি দেয় কিছুক্ষণ সুমোহন, কিছুক্ষণ সরলানন্দ। বুদ্ধজয় কচুপাতায় করে জল এনে শুদ্ধানন্দের মুখে জল দেয়। ও জল শুষে নেয়।

সুমোহন বলে, ওর তেষ্টা পেয়েছে। আরও জল নিয়ে আয়।

সরলানন্দ বলে, জল ছাড়া ওকে আর কী খাওয়াবো? ঔষধ নেই, পথ্য নেই। ওকে কি বাঁচাতে পারবো?

এমন অলুক্ষণে কথা বলো না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমার জীবন নিয়ে ভগবান যেন শুদ্ধানন্দকে বাঁচিয়ে দেয়। ও বড় ভালো ছেলে। আতঙ্কে ছেলেটা এমন অসুস্থ হলো।

মাগো এমন দৃশ্য দেখা কি সোজা কথা!

দু'জনে শুদ্ধানন্দের দু'পাশে বসে থাকে। দু'জনের বুক তোলপাড় করে। কেমন করে এই জঙ্গল পার হয়ে একটি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাতে পারবে? শুদ্ধানন্দ অস্ফুট স্বরে কিছু বললে ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে।

পাপ, ভীষণ পাপ করেছি আমরা।

শুদ্ধানন্দ! সরলানন্দ ওর কপালে হাত রাখে।

শুদ্ধানন্দ তুমি ভাল হয়ে যাবে।

আমাদের পাপের জন্য আমাদের কোনো ক্ষমা নেই।

দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে ছেলেটা অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে।

আমরা ওদের রেখে পালিয়ে এলাম কেন? কেন ওদের বাঁচাতে চেষ্টা করলাম না? ওদের সঙ্গে নিয়ে না আসতে পারলে আমরা কেন ওদের নিয়ে মরলাম না? হায় ভগবান, আমরা কি মানুষ!

থেমে থেমে অস্ফুট স্বরে বলছে কথাগুলো। ওর কথাগুলো দু'জন ভিক্ষু-শিক্ষকের বুকের ভেতরে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। শুদ্ধানন্দের মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারে না। ওদের ঘাড় ঝুলে যায়। ওদের মনে হয় শুদ্ধানন্দের কথাগুলো বনভূমিতে ছড়িয়ে গেছে। প্রতিটি বৃক্ষ, প্রতিটি পোকামাকড়, প্রতিটি বন্যপ্রাণী, প্রতিটি ছড়ার জল ওদের ধিক্কার দিচ্ছে। পাখিগুলো উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে অন্য কোথাও। আর ওই সব অবোধ শিশুরা কোনোকিছু না বুঝেই এই জঙ্গলে ছুটে এসেছে– ওদের জন্য যথেষ্ট খাবার নেই, সব জায়গায় সুপেয় জল নেই, ওদের একপ্রস্থ কাপড় ছাড়া কোন কাপড় নেই। দৌড়ে পালিয়ে আসার সময় ওদের পায়ের জুতো কোথায় ছিটকে পড়েছে ওরা জানে না। কাঁটা ওদের পায়ে বিধতে পারে। পাহাড়ি জোঁক ওদের রক্ত চুষে খাবে। এইসব শিশুদের বাঁচানো কি সহজ হবে? এদের কারো কারো বাবা-মা গাঁয়ে রয়েছে। তাদের কাছ থেকে আলাদা করে শিশুদের ওরা কোথায় ঠাঁই দেবে? এক্ষুনি তো ওরা জল থেকে উঠে এসে বলবে আমাদের খিদে পেয়েছে। তখন কী হবে?

কেমন করে যেন বনের ভেতর সূর্যের আলো নামে– গাছের ডাল ছুঁয়ে, পাতার ফাঁক গলিয়ে, বানরের কিচিরমিচিরের সঙ্গে, পাখিদের ডানা ঝাপটানির শব্দে আর কীটপতঙ্গের উড়ে বেড়ানোর আনন্দে। কেমন করে যেন সূর্যটা দিনভর বনের মধ্যে হামাগুড়ি দেয়। শুদ্ধানন্দ সুস্থ হয়ে যায়। দু'দিন ঝিম মেরে থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। জলে ভেজানো একটু চিড়া খায়, খানিকটুকু কলার থোর সেদ্ধ। তারপর ওর চেহারায় ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে। ওর চোখজোড়া চকচক করে। সুমোহন ভাবে, ও নতুন জীবন পেয়েছে। তাই ওর চোখে অমন দ্যুতি।

ছোট তাপস ওর হাত ধরে বলে, দাদা তোমার যখন অসুখ করেছিলো তখন মনে হয়েছিলো কেউ বুঝি আমাকে বেঁধে রেখেছে। আমি আর কোনোদিন তোমাকে দেখতে পাবো না।

কেউ বেঁধে রাখলে দড়ি ছিঁড়ে ফেলবি।

কেমন করে ছিঁড়বো?

জোরসে টান দিবি। পারবি না?

পারবো, পারবো। তুমি শুধু আমাদের সাহস দিও।

অজয় মুখ উদ্ভাসিত করে বলে, তুমি এত সাহস কোথা থেকে পাও দাদা?

এই বুকের ভেতর থেকে। কিন্তু সাহসের কিছুই তো দেখাতে পারলাম না রে। শেয়ালের মতো লেজ তুলে পালিয়ে এলাম।

বুদ্ধজয় কথা কেড়ে নেয়। বলে, পালিয়ে না এলে তো ওরা আমাদের মেরে ফেলতো। শুধু শুধু ওদের হাতে মরবো কেন? একদিন আমরা বড় হবো। লড়াই করবো। আমাদের দিন তো সামনে।

উৎপল চেঁচিয়ে বলে, সামনের দিনগুলোতে আমরা আর পালাবো না। আমরা একটা কিছু ঠিকই করতে পারবো।

তখন ওদের মনে হয় কারা যেন আসছে। কারও পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কণ্ঠস্বরও ভেসে আসছে। কাউকে কিছু বলতে হয় না। প্রত্যেকে যে যার মতো বিভিন্ন গাছের আড়ালে চুপ করে বসে থাকে। কেউ কেউ ছড়ার জলে নেমে নাক উঁচু করে বসে থাকে। পদশব্দ এগিয়ে আসে। বোঝা যায় অনেক জনের পায়ের শব্দ। ছোটখাটো একটি দল হবে হয়তো। সুমোহন নিশ্চিত হয় যে বুটের শব্দ না। যারা আসছে তারা খালি পায়ের মানুষ। পায়ে জুতা নেই। একসময় দলটি দাঁড়িয়ে পড়ে। অনুচ্চ কণ্ঠে কেউ একজন ডাকে: হেমরঞ্জন তুই কি আশপাশে আছিস?

মনিভাই আমি তোকে খুঁজছি। তুই কি কাছে ধারে আছিস?

সমেশ্বর? অমরজীব? প্রিয়তোষ?

সরলানন্দ চেঁচিয়ে বলে, তোমরা এগিয়ে আসো। আমরা সবাই এখানে আছি।

ছেলেদের মধ্যে হুটোপুটি পড়ে যায়।

বাবা, ও বাবা।

সে এক দৃশ্য। বাবারা ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরে। ছেলেরা বাবাদের বুকের জামা চোখের জলে ভিজিয়ে দেয়। যারা বাবা পায়নি কিংবা যাদের বাবা নাই তারাও ভেউভেউ করে কাঁদে। কে কাকে সান্তনা দেবে! কান্নাকাটি শেষ হলে অনিলচন্দ্র হাঁটু গেড়ে বসে বলে– ভগবানের অশেষ কৃপা যে আমরা ছেলেগুলোকে ফেরত পেয়েছি। আশ্রম পুড়িয়ে দেওয়ার আগে ওরা আমাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছিলো। টের পেয়ে আমরা আগেই পালিয়ে এসেছিলাম। জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম ছেলেটা বেঁচে গেলে ওর সঙ্গে আমার ঠিকই দেখা হবে।

হেমরঞ্জন কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার মা কই? দিদি? বিকাশ, প্রকাশ?

সবাই আছে বাবা। ওদেরকে একটা জায়গায় রেখে আমরা তোমাদেরকে খুঁজতে বেরিয়েছি। বাড়িঘর গেছে যাক, পরিবারের সবাই যে বেঁচে আছে এটাই সবচেয়ে বড় সান্তনা। ভগবান আমাদের সকলের সহায় হোন।

দীপঙ্কর বলে, আমরা দু'পোঁটলা চাল এনেছি। চলো ভাত রান্না করি। সবাই মিলে খাবো।

শুদ্ধানন্দ বলে, তিনদিন ধরে আমরা ভাত খাইনি।

সেটাই তো আমরা অনুমান করেছিলাম।

মাটি খুঁড়ে চুলা বানানো হয়। ছেলেরা শুকনো লাকড়ি সংগ্রহ করে। জল আনে। কলাগাছ কেটে থোড় বের করে সেটাও কেটে রান্নার জন্য তৈরি করে। হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়। বাঁশের চোঙায় রান্না হয়। ছেলেরা গোল হয়ে বসে। কলাপাতা ছোট ছোট করে সবার সামনে দেয় হয়। তর সয় না ছেলেদের। পেট ভরে খাওয়া হয় না। তবু তো ভাত খাওয়া হলো। সবাই ভীষণ খুশি। মঞ্জুলাল বলে, আবার কবে ভাত খাওয়া কবে আমরা জানি না।

আবার কোনো বাবা তার ছেলেকে খুঁজতে বের হলে সঙ্গে চাল নিয়ে আসবে। তারা জানে তাদের ছেলেরা জঙ্গলে ভাত খেতে পাবে না।

ঠিক বলেছো। তারা জানে ভাতের জন্য তাদের ছেলেদের প্রাণ আইঢাই করে। ভাত পেলে ছেলেরা ভীষণ খুশি হয়।

আহ্ তোমরা কারা এমন করে কথা বলছো?

সবাই নিশ্চুপ। চারদিক স্তব্ধ।

তোমরা কি জানো না, ভাত না খেয়েই তোমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে?

আমরা আমাদের আসার কথা বলেছি। আমরা চাই যাদের বাবা আছে তারা তাদের ছেলেদের খুঁজতে আসুক।

আবার চুপ করে থাকে সবাই।

ছেলেরা নিজের নিজের কলাপাতাগুলো ছড়া থেকে ধুয়ে নিয়ে আসে। যারা বাবাদের সঙ্গে চলে যাবে তারা তাদের পাতাগুলো নিয়ে শুদ্ধানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এগুলো কি ফেলে দেবো?

আমাকে দে।

তুমি কী করবে?

ওই পাতাগুলোর উপর তোদের নাম লিখে গাছে ঝুলিয়ে রাখবো। তোরা যে এখান থেকে বিদায় নিয়েছিস তার চিহ্ন থাকবে।

কয়দিন পর তো পাতাগুলো শুকিয়ে যাবে।

যাবেই তো। তবু এটাই আমাদের আনন্দ যে তোরা আমাদের সঙ্গে ছিলি।

অন্য ছেলেদের চোখ ঝলমল করে। বিদায় আনন্দ এবং দুঃখের। বারোজন এই দল থেকে বিদায় নিচ্ছে।

রামপাল বলে, শরণার্থী ক্যাম্পে তোমাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে।

কি দেখা হবে?

অবশ্যই হবে। তোমরা যে ক্যাম্পেই থাকো না কেন আমরা খুঁজে বের করবো।

দীপঙ্করের গলা ধরে আসে। অমর এসে বাবার হাত ধরে। হেমরঞ্জন অনিলচন্দ্রের। এভাবে ছেলেগুলো প্রত্যেকের বাবার হাত ধরলে ওরা দল থেকে আলাদা হয়। অন্যরা কাঁদতে শুরু করে।

অনিলচন্দ্র বলে, তোমরা কেঁদো না। তোমরা আমাদের হাসিমুখে বিদায় দাও। মনে করো ওদের সঙ্গে লড়াই করে আমরা জিতেছি।

আমরা তো লড়াই করিনি। আমরা কেন লড়াই করতে পারলাম না?

আমরা আবার ফিরে আসবো। সদ্দেংমোন পাহাড় পার হয়ে আমরা ত্রিপুরার রইস্যাবাড়িতে যাবো। ওখান থেকে অন্য কোথাও।

কেউ আর কথা বলে না। নি:শব্দে চোখের জল মুছতে থাকে কেবল। সুমোহন বলে, প্রার্থনা করি তোমরা ভালোয় ভালোয় পৌঁছাতে পারো যেন। তোমাদের মঙ্গল হোক।

ছেলেরা বাবাদের হাত ধরে হাঁটতে থাকে। অল্পক্ষণে ওরা গাছপালার আড়ালে চলে যায়। ওদের কথা শোনা যায় না। পায়ের শব্দও না।

সরলানন্দ পকেট থেকে কাগজটা মেলে ধরে বলে, আমাদের আজ আর যাত্রা করা হবে না। কাল সকালে আমরা এ জায়গা ছেড়ে যাবো। সামনে পাহাড় পড়বে। সেটা ডিঙাতে হবে। তারপরে দুই পাহাড়ের মাঝে সরু পথ পাবো। সেই পথ পার হয়ে পড়বে গহিন জঙ্গল। ওই জঙ্গলে ঢুকলে রাতদিন বোঝা যাবে না। তোমরা প্রস্তুত তো?

হ্যাঁ আমরা প্রস্তুত।

ওদের সমবেত কণ্ঠ ধ্বনিত হয় বনে। কেউ কেউ দ্রুত হাতে কলাপাতার টুকরোগুলো গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। বেশ লাগে দেখতে গাছের গায়ের বাড়তি শোভা।

দলটি আবার চলতে শুরু করেছে।

জঙ্গল ঠেলে এগোতে ওদের কষ্ট হচ্ছে। কারো মাথা আটকে যাচ্ছে গাছের ডালে, কারো হাত বেঁধে যাচ্ছে লতায়। কারো পায়ের নিচে কাঁটা ফুটছে।

কিছুক্ষণ চলার পরে সবচেয়ে ছোট দেবু বলে, আমি আর হাঁটতে পারছি না। আমাকে কোলে নাও আমি জল খাবো।

কথা বলতে বলতে দেবু উল্টে পড়ে যায়। হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। সবাই ওকে ঘিরে বসে থাকে।

শুদ্ধানন্দ জল খুঁজতে যায়। পাগলের মতো পাহাড়ি ঝরনা খোঁজে কিংবা ছড়া। হাঁটতে হাঁটতে ও কতদুর আসে তা ঠাহর করতে পারে না। নিজের বিপদের চেয়েও দেবুর মুখটা মনে পড়ে। ও হঠাৎ করে খেয়াল করে বন্য শুকর ওকে তাড়া করে

আসছে। শুদ্ধানন্দ হাতের গ্লাস ফেলে গাছ বেয়ে উপরে উঠে যায়। উপর থেকে দেখতে পায় সামনে অনেকগুলো গরু। মানুষ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। প্রথমে ওর ভয় হয়। ওটা আর্মির ক্যাম্প নয় তো? পরক্ষণে ভাবে, আর্মির ক্যাম্পের মতো মনে হচ্ছে না। এভাবে এতো ঘর নিয়ে আর্মির ক্যাম্প হয় না। ও তো ক্যাম্প কেমন তা জানে। শুদ্ধানন্দ তাকিয়ে দেখে বুনো শুকর চলে গেছে। ও দ্রুত গাছ থেকে নামে। আর একটু এগোলে ক্ষীণ একটি জলের ধারা পায়। পাহাড়ের গা চুঁইয়ে নেমে আসা খুবই ক্ষীণকায় ধারা। ও নিজে সেই ধারায় মাথা ভেজায়, গ্লাস ভরে। তারপর দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসে দলের কাছে। দেবু তখনো ছটফট করছিলো। জল খেয়ে ও শান্ত হয়। ওর নির্মিলিত চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বুদ্ধজয় বলে, তুই কি এখন হাঁটতে পারবি দেবু ?

না, আমি হাঁটতে পারবো না। তোমরা আমাকে ফেলে রেখে যাও কিন্তু হাঁটতে পারবো না। তোমরা আমাকে ফেলে রেখে যাও, কিন্তু হাঁটতে বলো না।

সরলানন্দ বলে, আজ রাতে আমরা এখানে থেকে যাই। কাল সকালে আবার যাত্রা শুরু হবে।

আমি অনেক দূরে বেশ কতগুলো ঘর দেখেছি পাহাড়ের উপরে। আমার মনে হয় ওখানে গেলে আমরা কোনো সাহায্য পেতে পারি।

তখন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে উৎপল, আমাকে জোঁকে ধরেছে। দ্যাখো আমার দু'পায়ে জোঁক। ছোট সরু আকারের কালো কালো জোঁকগুলো ভীষণ রক্তচোষা।

অমর জ্যোতি একটি কাঠি দিয়ে উৎপলের পা থেকে জোঁক ছাড়ায়। অন্যদের বলে, তোরাও দেখ গায়ে জোঁক আছে কিনা।

সুমোহন বলে, অমর জ্যোতি ঠিক বলেছে। এইসব জোঁক কামড়ালে তো টের পাওয়া যায় না। এরা শরীর থেকে রক্ত খেয়ে ফুলেফেঁপে নিজেরাই ঝরে পড়ে। তারপর শুরু হয় যন্ত্রনা।

ওমা আমাকে জোঁকে ধরেছে।

আমাকেও।

আমাকেও।

আমার পায়ে তিনটা। চিৎকার করে ওঠে শশীকান্ত।

প্রত্যেকের গায়ে জোঁক, কে কাকে দেখবে। একে অন্যের জোঁক ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে যায় সবাই। সারা রাত ওরা ছটফট করে। ওদের কাছে যেটুকু নুন আছে তা রান্নার জন্য লাগবে। নুন দিয়ে জোঁকের ঘা বন্ধ করবে এমন অবস্থা ওদের নয়। বাচ্চাদের কান্নাকাটিতে বনভূমিতে ভৌতিক পরিবেশ তৈরি হয়। এখানে তো পশুপাখির ডাক শোনা যাবে, গর্জন শোনা যাবে, পোকামাকড়ের কিচিরমিচির ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে থাকবে। কিন্তু এমন শব্দ শোনা যাচ্ছে কেন যেটা বনভূমির নিজস্ব শব্দ নয়? সবার গা ছমছম করে, কিন্তু কাউকে থামাতে পারে না। প্রত্যেকের দম আটকে আসতে চায়, প্রত্যেকের বুকের ভেতরে গুমগুম ধ্বনি হয়। আস্তে আস্তে শব্দ নিথর হয়। ছোটরা মাটির উপরে কিংবা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমুতে শুরু করে।

ঘুম আসে না সরলানন্দ ও সুমোহনের। দু'জনের একটাই ভাবনা– এইসব ছেলেদের নিয়ে দেশের সীমান্ত পার হতে পারবে তো? ওরা কতদূর পর্যন্ত হাঁটতে পারবে? কতজন টিকে থাকবে? পেছন থেকে কেউ ওদের তাড়া করে আসবে না তো? দু'জনে উঠে পায়চারি করে। দু'জনেই নরম-সরম মানুষ। সাত চড়ে রা করে না। রাগে না। উত্তেজিত হয় না। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলায়। সমস্যায় পড়লে ঘাবড়ে যায়। এমন মানুষ দু'জনের সামনে এখন ভীষন বিপদ। কী করবে তা ভাবতে পারে না। শুধুই পায়চারি করে।

শুদ্ধানন্দ মাথার নিচে পোঁটলা দিয়ে শুয়ে আছে। ওর ঘুম আসে না। মাথার ভেতরে অজস্র চিন্তা। নিজের বয়সের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে হয় ওকে। কারণ আশ্রমের শেষ দৃশ্যটি এই দলের মধ্যে ও একাই দেখেছে। নিজেকে এই দলের সবচেয়ে বয়সী মানুষ বলে মনে হয় কখনও কখনও। দু'জন ভিক্ষু-শিক্ষকও কেমন করে যেন ওর সামনে থেকে আড়াল হয়ে যায়। জেগে থাকে কতগুলো জীবন্ত শিশুর পুড়ে-যাওয়া শরীর। কালো মাটি এবং বিশাল ধ্বংসস্তুপ। ও চিৎ হয়ে শুয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে বলে– আকাশ তুমি তো দেখেছিলে তোমার দিকে উঠে যাচ্ছে আগুনের শিখা, কালো ধোঁয়া এবং মানুষের চিৎকার। তাহলে তুমি বৃষ্টি পাঠাওনি কেন? কেন তোমার এলাকাজুড়ে জড়ো করোনি কালো মেঘ, ঘন কালো মেঘ– মুষলধারে ঝড়ে পড়তো অঝোর ধারা। বেঁচে যেতো–। না, বেঁচে যেতো কি? ওরা আবার আগুন দিতো। যতবার দরকার ততবার দিতো, পুড়ে ছাই না-হওয়া পর্যন্ত।

শুদ্ধানন্দ জোর করে চোখ বুজার চেষ্টা করে, কিন্তু চোখ বন্ধ করতে পারে না। তখন ও দু'হাতে চোখের উপর দিযে জোর করে চেপে রাখে। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যায়। আস্তে ধীরে বনভূমির শব্দ থেমে যায়। ভৌতিক স্তব্ধতা নেমে আসে চারদিকে। ভীষণ ভয় করে শুদ্ধনন্দের। ও এখন বালক মাত্র, বড় কোনো কিছু সামাল দেয়ার বয়স হয়নি। ভয়ে ওর দু'চোখ জুড়ে ঘুম নামে। ভয়ে ওর শরীর অবশ হয়ে যায়। শুনতে পায় সরলানন্দ আর সুমোহন বলছে– আমরা বেঁচে গেছি যে পুড়ে-যাওয়া আশ্রম আমাদের দেখতে হয়নি। তবে শুদ্ধানন্দের মুখ দেখলে ওর কষ্ট আমরা বুঝতে পারি।

বনজুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় ওদের কণ্ঠ:

ভগবান ওর সহায় হোন।। ওর মনে শান্তি থাকুক। ও দীর্ঘজীবি হোক। ও যেন আমাদের কথা শতমুখে বলতে পারে।

=তিন=

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই বৃষ্টি নামে।

ওরা যে যার মতো বড় বড় গাছগুলোর নিচে যতোটা সম্ভব গুটিয়ে বসে থাকে। বৃষ্টির তোড়ে গাছের কান্ডে উঠে এসেছে শামুক। ছোট ছোট কাঁকড়া। গাছের ডালে

বাসা বেঁধেছে লাল পিঁপড়া। পিঁপড়াকে এভাবে বাসা বাঁধতে ওরা দেখেনি। পাতার পিঠে পাতা জোড়া দিয়ে চমৎকার ঘেরাটোপ। বৃষ্টির তোড়ে ভিজে চুপসে যাচ্ছে সবাই। পায়ের নিচে দিয়ে বয়ে যায় জলের স্রোত। জলের মধ্যে উল্টে পড়ে যায় দেবু, একটু পরে স্বরূপ। সুমোহন আর সরলানন্দ ওদের কোলে তুলে নেয়। যার কাছে যা কাপড় ছিলো তার সবকিছু দিয়ে ওদের ঢেকে রাখে। কিন্তু দু'জনেই হিহি করে কাঁপছে। ওদের মুখে গোঙানির শব্দ। মাঝে মাঝে হেঁচকি উঠছে। শরীর একদম শীতল হয়ে গেছে। ওদের বুকে জড়িয়ে ওম দেওয়ার চেষ্টা করে সুমোহন আর সরলানন্দ। কিন্তু কিছুই ঘটে না। ওরা ক্রমাগত শীতল হতে থাকে। ভয়ে কুঁকড়ে যায় দু'জনে। প্রার্থনা করে শিশুদের জন্য। অনেকক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে যায়। ছেলেরা নড়েচড়ে ওঠে। নড়ে না দেবু আর স্বরূপ। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে সুমোহন আর সরলানন্দ বুঝতে পারে যে ওরা আর বেঁচে নেই। খবরটা ওরা হঠাৎ করে কাউকে বলতেও পারে না। বৃষ্টির পানি গোল্লা গোল্লা বৃত্তের মতো এখানে-ওখানে জমে আছে। ছেলেরা সেসব পানির মধ্যে ছটোছুটি করছে। একে অন্যের গায়ে পানি ছিটাচ্ছে যেন ওরা বর্ষার পানিতে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। হঠাৎ শুদ্ধানন্দ সবাইকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে। ধমক দেয় এবং আঙুল দিয়ে দেখায় যে বেশ বড়সড় একটি সাপ খানিকটা দূর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ও মানুষের এই দলটির দিকে তাকায়নি। ছেলেরা হি-হি করে কাঁপে ঠিকই, কিন্তু মুখে শব্দ নেই। ওদের বিস্ফারিত দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে আছে। চোখের পলক পড়ে না। সাপটা অনেকক্ষণ ধরে যায়। ওদের সামনে সময়কে স্তব্ধ করে ফেলে। প্রকৃতিকে নি:শব্দ করে ফেলে। প্রাণীকুলের মধ্যেও প্রাণের সাড়া নেই। সাপটা ওদের চোখের সামনে থেকে আড়াল হয়ে গেলে বুদ্ধজয় বলে, ও যদি রাতের বেলা আমাদের মধ্যে চলে আসতো আর গুটলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে যেতো তাহলে কেমন হতো?

বাজে কথা বলবি না বুদ্ধ।

সুহাংশু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আমার ভেতরটা এখনো কাঁপছে মাগো, আমি এতবড় সাপ কখনো দেখিনি।

শুদ্ধানন্দ সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমরা কেউই এতবড় সাপ কখনো দেখিনি। আমাদের ভাগ্য বলে। সামনের দিনগুলো আমাদের খুব ভালো যাবে।

সাপ তো খারাপ প্রাণী। মানুষকে কামড়ে মেরে ফেলে। সাপ দেখলে ভাগ্য ভালো হবে কেন? তুমি ঠিক কথা বলোনি শুদ্ধ দাদা।

আমি ঠিকই বলেছি। সাপটা আমাদের কামড়াতে আসেনি। আমাদের দিকে তাকায় নি। আমাদের বলেছে, তোদের ভয় নেই।

হি-হি করে হেসে ওঠে কেউ কেউ। শুভরাজ বলে সাপটা কি আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে?

পেতে পারে। কে জানে।

ওটা কি আবার আসবে?

আসতেও পারে।

এখন ও কোথায় গেলো?

ওর বাড়িতে।

ওর বাড়ি কোথায়?

হয় গাছের কোটরে, নয়তো মাটির গর্তে।

ওর কয়টা বাচ্চা আছে?

বিশ-পঁচিশটা হবে হয়তো।

ইশ্, এতগুলো! মিছে বলছো।

সবাই মিলে হি-হি করে হাসে। হাসতে হাসতে ওদের চোখ পড়ে দু'জন ভিক্ষু-শিক্ষকের ওপর। দেবু আর স্বরূপের কী হয়েছে? ওরা এখনো কোলের ভেতরে কেন? ওরা ওদেরকে ঘিরে ধরে।

কী হয়েছে দেবু আর স্বরূপের?

ওরা কেন ঘুমিয়ে আছে?

ওদের কি জ্বর এসেছে?

দু'একজন ওদের হাত ধরে টান দিতে গিয়ে শিউরে উঠে বলে। মাগো কী ঠান্ডা!

শুদ্ধানন্দের বুকটা ধক করে ওঠে। ও দ্রুতহাতে ওদের শরীর থেকে কাপড় সরায়। মুখের কাপড় সরালে দেখতে পায় ফ্যাকাশে বিবর্ণ চেহারা বৃষ্টিধোয়া। আশ্চর্য, ওদের বুক উঠানামা করছে না। ওরা নি:শ্বাস ফেলছে না। ও মুখের কাপড় টেনে নিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলে, দেবু আর স্বরূপ মরে গেছে।

মরে গেছে!

মরে গেছে!

ওরা আর আমাদের সঙ্গে হাঁটবে না!

এবার আর ওরা কাঁদে না। কেননা ওরা অনেক কেঁদেছে। ওদের ভেতরে আর চোখের জল নেই। সুমোহন আর সরলানন্দ ওদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। আশ্চার্য, ওরা কেমন করে এত শক্ত হয়ে গেলো! ওরা কান্নার কথা ভুলে গেছে।

শুদ্ধানন্দ কয়েকজনের হাত টেনে বলে, চলো গর্ত করতে হবে। ওদের কবর দিতে হবে।

ওরা কবর খোঁড়ার সময় খেয়াল করে দু'টো বানর নেমে এসেছে গাছ থেকে। কিচিরমিচির করে ওদের সঙ্গে। ছোটরা প্রথমে ভয় পেলেও পরে বুঝতে পারে বানর দু'টো ওদের বন্ধু হবে। নভোরাজ বলে,এই বানর দু'টোকে আমি গাছের ডালে দেখেছি। আমাদের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে বসেছিলো।

ওরা বোধহয় প্রথমে আমাদেরকে ভয় পেয়েছিলো। পরে বুঝতে পেরেছে আমরা ওদের বন্ধু হবো।

তোমরা ওদেরকে আদর করো। ভয় পেয়ো না।

কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়ায়। বানরের গায়ে হাত বুলোয়। এগুলো ওদের স্পর্শে শান্ত থাকে। কারো গায়ে আলতো করে সামনের পা উঠিয়ে দেয়। যেন কিছু বলতে চায়।

কোনো রকমে মাটি চাপা দেয়া হয় দু'জনকে। ছোটরা বুনোফুল খুঁজে এনে কবরের উপর ছড়িয়ে দেয়। ওরা শুকনো কাঠে ফুটে থাকা রঙিন ছত্রাক নিয়ে আসে কাঠসহ। সাদা, কমলা, হলুদ রঙের অপূর্ব ছত্রাক ফুটেছে মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো ডালে। কী সুন্দর করে সেসব ডাল কবরের চারপাশে পুঁতে ঘিরে দেয় ছোটরা! মনে মনে ওদের প্রশংসা না করে পারে না সুমোহন আর সরলানন্দ। এ সবই তো আশ্রমের শিক্ষা। যেভাবে বাগানে ফুল ফোটাতো ওরা সেভাবেই শিখেছে। এই গহিন বনে নিজেদের সে শিক্ষা কাজে লাগিয়েছে। বানর দু'টো গাছের মাথা থেকে ছিঁড়ে আনে সবুজ পাতা। ছড়িয়ে দেয় কবরের উপর।

ওদের আবার যাত্রা শুরু হয়।

ঝলমলে দিন। গাছের ফাঁকে নীল আকাশের খন্ড খন্ড অংশ দেখা যায়। বন থেকে পুরো আকাশ দেখার উপায় নেই। তবু সকলে খানিকটুকু স্বস্তি নিয়ে এগোতে থাকে। দিনের বেলায় বৃষ্টি-ধোয়া গাছের পাতা চকচক করে। বৃষ্টির ফোঁটা টুপ করে ঝরে পড়ে গাছের পাতা থেকে। আটকে থাকে কারো চুলের উপর, কারো পিঠে, কারো জামার নকশায়। বানর দু'টো ওদের পিছে পিছে আসে। কখনো এক লাফে গাছে উঠে যায়। কিচিরমিচির করতে করতে এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফায়। ছেলেদের মাথার উপর পাতা ফেলে। ওদের মনে হয় ওদের যাত্রা হাসি-আনন্দে ভরে তোলার জন্য বানর দু'টো সঙ্গী হয়েছে। বেশ লাগছে ওদের।

দুপুর গড়িয়ে গেলে ওরা একটা ঝিলের ধারে থামে। সবাই জলে হাত ডুবিয়ে জল খায়। সুমোহন বলে, চলো আমরা জঙ্গলে আলু খুঁজে আনি। আজ আমাদের আলু সেদ্ধ খেতে হবে।

ওরা খোঁজাখুঁজি করে আলু নিয়ে আসে। একগাদা আলু জড়ো হয়ে যায়। এত আলু একবেলায় দরকার হবে না। অর্ধেক আলু সেদ্ধ করে পেট পুরে খায় সবাই। শুধুই সেদ্ধ। নুন নেই, তেল নেই। তারপরও কেমন অদ্ভুত তৃপ্তি সবার চোখেমুখে। বানর দু'টো কোথায় যেন উধাও হয়েছে।

নভোজ্যোতি বিষন্ন কণ্ঠে বলে, ওরা কি আমাদের ছেড়ে চলে গেলো? আর কি আসবে না ?

ওরা থাকলে আমাদের মন ভালো থাকে।

ওরা আমাকে বাবা-মায়ের স্নেহ দিয়েছে। পোমাংপাড়ার বাঁশ, বেত আর টিনের তৈরি ঘরটার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ওই বাড়ির ছাদে হলুদ ধুন্দল ফুল ফুটে থাকতো। ওই ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতাম ছাদটা আকাশ আর শত শত তারা নেমে ভাসছে আমাদের বাড়ির উপরে।

আমাদের বাড়িতে অপরাজিতা ফুলের গাছ ছিল। নীল রঙের, সাদা রঙের অপরাজিতা ছিল। মা বলতো, অপরাজিতার মতো ফুল হয় না। কী সুন্দর! পুজোয় অপরাজিতাই ছিলো মায়ের প্রিয় ফুল।

আমার কিন্তু বাড়ির কথা মনে নেই। আমার আশ্রমের কথাই বেশি মনে পড়ে।

সুমোহনের কণ্ঠ ভরী হয়ে যায়। আমি যখন আশ্রমে থাকতে যাই তখন আমার বয়স দশ বছর। আমার এখানে ভালোই দিন কাটছিলো। লংগদু আক্রমন করার পরে আমার বাবা-মা-ভাইবোন আশ্রয়ের জন্য ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিলো। পালানোর সময় জঙ্গলের ভেতরে সেনাবাহিনীর গুলিতে আমার বাবা মারা যায়। এসব কথা আমি জেনেছি অনেক পরে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে আমরা মাত্র পঁচিশজন ছিলাম। শুরুটায় বেশ কঠিন অবস্থা ছিলো। লেখাপড়া শেখো। কষ্ট করে মানুষ হলে তার মূল্য বেশি হয়। ঠিকই তুমি একদিন বড় হবে। আমি বাবার কথা সব সময় মনে করতাম। ফলে কষ্ট তেমন করে মনে করতাম না। সপ্তাহে দু'দিন আমরা গ্রামে ভিক্ষা করতে যেতাম। খালি পায়ে কাঁধে ঝোলা নিয়ে ভিক্ষা করা। গ্রামের লোকজন আমাদের চাল দিতো, কেউ কেউ টাকা-পয়সা দিতো। সেসব জিনিস দিয়ে আমরা মাসের খরচ ওঠাতাম। জানো, গ্রামের বাড়ির সামনে গিয়ে আমরা ঘন্টা বাজিয়ে লোকদের ডাকতাম! আমাদের ঘন্টার শব্দ শুনে মানুষজন বেরিয়ে আসতো। বেশ ছিলো দিনগুলো। প্রতিদিন আমরা ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠতাম। তারপর প্রার্থনা, প্রাত:রাশ খাওয়া, বাগানে পানি দেওয়া, ক্লাসে যাওয়া, বিকেলে খেলা, সন্ধ্যায় পড়া, সময়মতো ঘুমুনো। নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হতো না। ভিক্ষু-শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের সর্ম্পক ছিলো পরিবারের লোকদের মতো। কী যে সুন্দর সময় ছিলো তখন! ভুলতে পারি না। বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকার চেয়ে কম ভালো ছিলো না আশ্রমের জীবন। হায় আশ্রম!

বলতে বলতে সুমোহনের চোখ চিকচিক করে। জল ভরে যায় চোখে। কিন্তু সুমোহন জল মোছে না চোখের জল গাল বেয়ে গড়ায়। তারপর উৎফুল্ল হয়ে বলে, আমার পড়ালেখা যখন প্রায় শেষ তখন আশ্রমের অবস্থা বদলাতে শুরু করলো। আমরা কিছু কিছু বিদেশি সাহায্য পেতে শুরু করলাম। সাহায্য আসতো ফ্রান্স থেকে। তখন আমাদের আর ভিক্ষা করতে যেতে হতো না। বিদেশি টাকা দিয়ে আশ্রমের জন্য জমি কেনা হলো। জমিতে কৃষিকাজ হতো। টিউবওয়েল বসানো হলো। জলের ব্যবস্থ হলো। ধানভানার মেশিন এলো। ফলের বাগান গড়ে উঠলো।

সত্যি,আপনারা কতো ভাগ্যবান ছিলেন!

আমার মনে হচ্ছে আমিও যদি মানুষের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চেয়ে আনতে পারতাম। তাহলে আমি আশ্রম গড়ার আনন্দ পেতাম। সবকিছু একেবারে হাতের কাছে পেতে ভালো লাগে না।

তখন একজন চেঁচিয়ে বলে, দ্যাখো, দ্যাখো।

বানর দু'টো এক ছড়া প্রায় পাকা কলা ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। ওদের কাছে এনে কলার ছড়াটা নামিয়ে রাখে। তারপর দাঁত বের করে হাসে। ছেলেরা মহাফুর্তিতে হাততালি দেয়। শুদ্ধানন্দ হাসতে হাসতে বলে, বলেছিলাম না সাপ-দেখে ভাগ্যের লক্ষণ। দেখেছো কেমন কলার ছড়া এসে গেলো। এইটা খেয়েই আমরা এদিনটা কাটিয়ে দিতে পারবো।

ছেলেরা সবাই মিলে গান করে। দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ওরা নিজেদের পুণ্যজন্মের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

=চার=

ওরা দিনের শেষে পাহাড়ের গায়ে লাগানো সেই ঘরগুলোর কাছে এসে পৌঁছে যেগুলো শুদ্ধানন্দ গাছের উপর থেকে দেখেছিলো। ওখানে পৌঁছে ওরা দেখতে পায় একটি লাঠির মাথায় লেখা আছে–'এখানে জলের ধারা শুকিয়ে গেছে। আমরা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি'। কাগজের উপর লেখাটা প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে। কবে এরা চলে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। দু'একটা ছোট গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে। ছেলেরা ছুটোছুটি করে বিভিন্ন ঘরে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। ঘরগুলোর দরজা নেই, বেড়া ভাঙা, চাল ঝুলে পড়েছে। ভেতরে সাপ থাকতে পারে এমন আশঙ্কায় সরলানন্দ ছেলেদের সাবধান করে দেয়।

এক সময় খানিকটা জায়গা পরিস্কার করে সবাই সুস্থির হয়ে বসে। কয়েকজন ছেলে এখানে বাস করা কারো কারো ভাঙা চুলো ঠিক করে আলু সেদ্ধ করতে বসায়। আজ ওরা আলু সেদ্ধ খেয়ে রাতটা এখানে কাটিয়ে দেবে। কয়েকজন ছেলে ঘরের ভেতরে সাপ আছে কিনা তা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে। কিন্তু তেমন কিছু নেই। ওরা এখানে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

বুদ্ধজয় বলে, আমরা এখানে একটা আশ্রম করতে পারি না? ঘরগুলো আমরা ঠিক করে নেবো।

আশপাশে তো গ্রাম নেই। আমরা ভিক্ষা করবো কোথায়?

কে আমাদের চাল দেবে?

তাছাড়া এখানে জলের উৎস শুকিয়ে গেছে। আমরা জল পাবো কোথায়?

তাই তো জল পাবো কোথায়? নাহ্ আমাদের এখানে থাকা হবে না।

জল পেলেও আমরা থাকতে পারবো না। বনের পশুরা আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে।

ওই, ওই দেখো একটা গয়াল যাচ্ছে।

ওহ্ কি সুন্দর দেখতে! কালো রঙের গরুটার অর্ধেক পা সাদা। মনে হয় মোজা পড়ে আছে।

হি-হি করে হাসে সবাই। বানর দু'টো ঘরের চালে বসেছিলো। ওগুলো ওদের পিছু ছাড়ছে না। কখনো এদিক-ওদিকে যায়, আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে। ওদের হাসতে দেখে হাততালি দিয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গি করে।

সরলানন্দ আর সুমোহন কলাপাতায় ছোটদেরকে আলুর টুকরো দেয়। তেলহীন-নুনহীন আলু ছোটরা খেতে পারে না। কেউ চুপ করে বসে থাকে, কেউ ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে। সুমোহন নরম গলায় বলে, খাও সোনারা।

আমার খিদে নেই। স্মৃতি বিকাশ মুখ নিচু করে মিনমিনিয়ে বলে।

না খেলে তো ঘুম আসবে না। তোমার ভীষণ খিদে পাবে। কান্না পাবে। তোমার কান্না শুনলে আমরাও ঘুমুতে পারবো না।

স্মৃতি বিকাশ ফিক করে হেসে এক কামড় আলু খায়। এ আলু তো ওরা খায়ই, কিন্তু বাড়িতে রান্না হলে এর স্বাদ হয় আলাদা। মায়েরা তেল-মশলা দিয়ে সুন্দর করে রান্না করে, এমন সেদ্ধ নয়। কেমন করে খাবে ওরা? কবে ওরা এমন গহিন জঙ্গলে পথ হাঁটা থেকে মুক্তি পাবে?

স্মৃতিকে আলু খেতে দেখে অন্যরাও যে শুরু করে ফেলবে তা হয় না। চুপ করে বসেই থাকে কেউ কেউ। কলাপাতার উপর আঁকিবুকি কাটে। বানর দু'টো খানিকটা দূরে চুপ করে বসে আছে। সরলানন্দ বলে, আমি কি তোমাদেরকে একটা গল্প বলবো? গল্প শুনতে শুনতে আলু খেতে খুব মজা লাগবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা গল্প শুনবো।

ছেলেরা কয়েকজন কলাপাতা নিয়ে সরলানন্দের কাছে এসে বসে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ওদের মুখগুলো কী অপূর্ব দেখাচ্ছে! ছোট পাহাড়ের উপর ক্ষেতে জঙ্গলের সবুজ স্নিগ্ধ পাতায় সূর্যের আলো চিকচিক করে। বনভূমি এখানে তেমন ঘন নয়।

সরলানন্দ সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখো চারদিকে কী সুন্দর আলো! একটু পরে এই আলো ফুরিয়ে যাবে। সন্ধ্যা হবে। তোমাদের ঘুম পাবে। তার আগে তোমাদের একটু কিছু খেয়ে নিতে হবে। না– খেলে তোমরা তো হাঁটতে পারবে না। তোমাদের অনেকদূর হেঁটে যেতে হবে।

আমাদের আর কতদিন হাঁটতে হবে?

যতদিন না আমরা সীমান্তে পৌঁছাতে পারি।

আমরা গল্প শুনবো।

তোমাদেরকে আমি শেয়াল আর কচ্ছপের গল্প বলবো। তোমরা খেতে শুরু করো। এমন হবে যে তোমাদের খাওয়া শেষ হবে, আর আমার গল্পও শেষ হবে। ঠিক আছে?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

ছেলেরা ছোট্ট করে কামড় বসায় আলুর টুকরায়।

সরলানন্দ দূর বনভুমির দিকে তাকিয়ে গল্প শুরু করে– এক বনে ছিল একটি শিয়াল ও একটি কচ্ছপ। একদিন শিয়ালটি খাবার খোঁজার জন্য বনের ভেতর ঘুরছিলো। পথে দেখা হলো পাহাড়ি কচ্ছপের সঙ্গে। ভাবলো, আজ এটা খেয়েই দিন শেষ করা যাবে। কিন্তু শেয়ালকে দেখেই কচ্ছপটি নিজের খোলের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে, হাত-পা ঢুকিয়ে বসে রইলো। ও শিয়ালের মতলব টের পেয়ে গেছে। শিয়াল পা দিয়ে, মুখ দিয়ে বেশ কয়েকবার কচ্ছপকে উল্টেপাল্টে দেখলো, কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। কচ্ছপের শক্ত খোল কামড়ে ওটাকে আর বের করতে পারে না। কচ্ছপ যদি নিজের থেকে খোলের ভেতর থেকে বের না হয়। তাহলে উপায়? সারাদিন কি না–খেয়ে বসে থাকতে হবে? এটাকে এখানে রেখে গেলে কচ্ছপটা পালিয়ে যাবে। কী করা? শিয়াল কচ্ছপকে ছেড়ে নড়ে না। এদিকে ভীষণ খিদেও পেয়েছে। বেলা যায়। তখন কচ্ছপ খোলের ভেতর থেকে বলে, আমার শক্ত খোল ফুটো করেও তুমি আমাকে খেতে পারবে না। আমিও বের হবো না। তারচেয়ে তোমাকে একটা বুদ্ধি বলে দিই শোনো।

অবাক করলে কচ্ছপ! তুমি আমাকে তোমাকে খাওয়ার বুদ্ধি বলে দেবে? বেশ মজা তো!

শিয়াল হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কচ্ছপ গম্ভীর স্বরে বলে, তোমাকে বুদ্ধি না বলে দিলে তো তুমি আমাকে রেহাই দেবে না। আমিই বা আর কতক্ষণ এখানে পড়ে থাকবো। রোদে গরমে আমার মাথা ঘোরাচ্ছে শিয়াল।

তো তোমার বুদ্ধিটা কী শুনি।

কচ্ছপ হে-হে করে হেসে বলে, তুমি আমাকে ছড়ার ধারে নিয়ে যাও। সেখানে নিয়ে আমাকে জলে ভিজিয়ে রাখো। জলে ভিজলে আমার খোল নরম হয়ে যাবে। তুমি কামড়ে খেয়ে ফেলবে।

বাহ্, দারুণ বুদ্ধি তো! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে কচ্ছপ। এখুনি আমি তোমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি জলের ধারে। তোমাকে কতক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে?

এক ঘন্টা।

কচ্ছপ উত্তর দিয়ে জোরে জোরে হাসে। শিয়ালের মাথায় ঢোকে না যে কচ্ছপ হাসছে কেন। মরার আগে কেউ কি এমন করে হাসতে পারে? আসলেই কচ্ছপটা ভীষণ বোকা, শিয়াল এটা ভেবে মনে মনে হাসে। তারপর কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে ঠেলে, কিছুক্ষুণ পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে কচ্ছপকে ছড়ার ধারে নিয়ে আসে। জলের ধারে এসে কচ্ছপ একলাফে জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁই করে অনেকদূরে চলে যায়। তারপর জলের উপর

নাক উঁচিয়ে বলে, বিদায় বন্ধু। আবার দেখা হবে। এখন তুমি জল আর বাতাস খেয়ে পেট ভরাও।

গল্প শুনে ছেলেরা চেঁচিয়ে বলে, বোকা শেয়াল, বোকা শেয়াল।

কচ্ছপটার তো ভীষণ বুদ্ধি। এমন বুদ্ধি দিয়েই বেঁচে থাকতে হয়।

বাহবা কচ্ছপ, হুয়ারে কচ্ছপ।

হাসতে হাসতে কেউ কেউ আলুর শেষ টুকরাটা মুখে পোরে। কোঁৎ করে গিলে জল খায়। সরলানন্দ ছেলেদের হাসি শুনে খুব উদ্বুদ্ধ হয়। বলে, দেখেছো, মানুষই বলো, আর পশুপাখি বলো, সবাইকে বেঁচে থাকার জন্য বুদ্ধি বের করতে হয়। বোকাদের খাওয়া জোটে না। বোকারা হেরে যায়।

আমরাও এখন থেকে তাই করবো। খেয়ে সুস্থ থাকবো। আমরা যেন অনেকদূর পর্যন্ত হাঁটতে পারি।

বুদ্ধ জ্যোতি হাসতে হাসতে বলে, আমরা কখনো বোকামি করবো না। বনের সব প্রাণী আমাদের বন্ধু হবে। চলো পাহাড়ের নিচে যাই। ঘুরে আসি।

ছেলেরা সবাই সরু পথ ধরে হুড়মুড়িয়ে নামে। যেন ভীষণ মজার খেলা। আকাশে চাঁদ থাকলে শিশুরা এমন মজার খেলায় মেতে ওঠে। চাঁদের সঙ্গে ওদের একটি সহজ সর্ম্পক আছে। ওরা হাত ধরাধরি করে ছড়া বলতে থাকে, হাত ধরাধরি করে ঘুরতে থাকে। ওরা ভবিষ্যতের মানববন্ধন তৈরি করে। ফলে ওরা ভুলে যায় পালিয়ে যাওয়ার কষ্ট।

পরদিন চমৎকার সকাল ফোটে বনভূমিতে।

ছেলেরা খেয়াল করে নরম আলো স্নিগ্ধ করে রাখে চারদিক। কী অপূর্ব দেখাচ্ছে কুয়াশামাখা দূরের পাহাড়ি টিলা! যেন নীলাভ পর্দায় জুড়ে আছে সবকিছু। ওটার আড়ালে আছে স্বপ্নপুরী। ওখানে পৌঁছানোর হাতছানি নিয়ে পথে নেমেছে ওরা। শুদ্ধানন্দ বিস্ময়ে বলে, কী অপূর্ব দ্যাখো! ওই পৃথিবী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা ওখানে যাবো।

উৎপল বিষন্ন কণ্ঠে বলে, আমরা এত ভাগ্যবান নই। এই রিজার্ভ ফরেস্ট আমরা পার হতে পারবো না।

সকলে ওর দিকে ঘুরে তাকায়। ওর কণ্ঠে বিষন্ন আর্দ্রতা ওদেরকে ছুঁয়ে যায়। এই কয়দিনের অভিজ্ঞতা , প্রায় নির্ঘুম রাত জঙ্গলের পথে কষ্টকর যাত্রা, ঠিকমতো না-খেতে পেয়ে বেঁচে থাকার তিক্ততায় ওরা তো মুষড়ে পড়েছে। ওরা কি আবার ফিরে পাবে আশ্রমের আশ্চর্য সুন্দর দিনগুলো?

রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে থাকে পোকামাকড়, নানা রঙের ফড়িং ও প্রজাপতি। যতক্ষণ রোদ না ওঠে ততক্ষণ ওরা পাতার আড়ালে থাকে। ছোট ছোট পোকামাকড়ের ঘুঙুরের মতো ডাক ওদেরকে চমকিত করে। ওরা খুশি হয়ে ওঠে। ফড়িং ও প্রজাপতির অপরূপ ডানায় দৃষ্টি আটকে যায়। ওরা বিস্মিত মুগ্ধতায় হাঁ করে

দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের মনে হয় এমন দৃশ্য ওরা আগে কখনো দেখেনি। জঙ্গলে না এলে এ দৃশ্য ওদের দেখা হতো না। ওরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চারপাশে উড়ে বেড়ানো কীটপতঙ্গের উড়ে বেড়ানোর আনন্দ দেখতে থাকে।

রোদ বাড়ে। দিন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বানর দু'টো কোথায় যেন গেছে। ওরা জানে ওগুলো আবার ফিরে আসবে। ওগুলো গাছের ডালে বসে ওদেরকে পাহারা দেয়। ওরা চমৎকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

একটু পরে শিশির চেঁচিয়ে বলে, দ্যাখো দ্যাখো কারা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে।

সকলে মুহূর্তে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। মাথা বের করে দেখে ওদের। চারজন নারী-পুরুষ। পাঁচটি ছোটবড় ছেলেমেয়ে আছে ওদের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে পোঁটলা-পুঁটলি আছে। ওদের একজনের হাতে লাঠি। পাহাড় বেয়ে উঠতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনি একজন নারী। খানিকটুকু উঠে বসে পড়ে, দম নেয়। আবার উঠে দাঁড়ায়। সুমোহন আর সরলানন্দ খানিকক্ষণ আড়াল থেকে দেখে বুঝে যায় যে ওরাও আগুন-পোড়া ঘরের মানুষ। পালিয়ে এসেছে কোনো গ্রাম থেকে। টিলার মাথায় ঘর দেখে আশ্রয়ের আশায় এগিয়ে আসছে। পরক্ষণে শিশির আর মনীষ চিৎকার করে বলে,ওরা তো আমাদেরই বাবা-মা। আমাদের ভাইবোন।

সবাই মিলে ছুটে ওদের কাছে যায়। শিশিরের বাবা নিখিল আর মা চন্দ্রাবতী। মনীষের বাবা পরিতোষ আর মা অপরাজিতা। ওরা পাশাপাশি বাড়িতে বাস করা দুই পরিবার। বাঙালিরা ওদের তাড়িয়ে দিয়ে ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছে। ওরা তিন মাস ধরে এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবছে, আবার ফিরে যাবে গ্রামে। দেশ ছেড়ে যেতে ওরা চায় না।

সবাই মিলে ওদের উপরে উঠতে সাহায্য করে। নিখিল সরলানন্দকে বলে,আমার বউয়ের বাচ্চা হবে। টিলার উপরে ঘরগুলো দেখে আমরা এদিকে এসেছি আশ্রয়ের আশায়। একটু ঘরের নিচে না থাকলে তো আমার যে বাচ্চাটা হবে তাকে বাঁচাতে পারবো না। কী করবো এখন?

আমরা সবাই মিলে আপনাদের একটা ঘর তৈরি করে দেবো। ছেলেরা এসো।

সবাই কাজে লেগে যায়।

শিশির আর মনীষ বাবা-মাকে পেয়ে ভীষণ খুশি। ওদেরকে আশ্রমে দেওয়ার পরে ওদের বাড়িতে আগুন দিয়েছিলো বাঙালিরা। বাবা-মা জঙ্গলে পালিয়ে গেলে আর দেখা হয়নি। এখন এই গভীর জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বাস করা বাবা-মা বুক থেকে ওদের সরাতে চায় না। শিশির ওর বাবাকে বলে, আমি শরণার্থী ক্যাম্পে যাবো না বাবা। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো। দেশ ছেড়ে যাবো না।

আমিও যাবো না। আমিও দেশে থাকবো।

মনীষ দু'হাত উপরে তুলে চেঁচিয়ে বলে।

যারা ঘর তোলা কাজ করছিলো ওরা ওদের দিকে তাকায়। ভাবে, দল থেকে আরও দুজন কমলো।

এভাবে যদি কমতে থাকে তাহলে দলে আর কয়জন থাকবে? সুধাংশু প্রাঙ্গণের এককোণে দাঁড়িয়ে মাথা গুনতে থাকে।

কাজ শেষ হলে সরলানন্দ বলে, ঘরটা মোটামুটি ঠিক হয়েছে। একজন মানুষ থাকার জন্য যথেষ্ট। আপনারা থাকুন, আমরা আবার যাত্রা শুরু করি।

আজ রাতটা থেকে যান অনুগ্রহ করে। আপনাদের দেখে মনে হয়েছে জীবন ফিরে পেয়েছি। সবাই মিলে আরও কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকি না কেন?

পরিতোষও একই অনুরোধ করে। ওদের চোখমুখ দেখে মনে হয় ওরা যেন কয়'শ বছর পরে মানুষের চেহারা দেখছে। ওরা চলে গেলে বিরান বনভূমিতে আর কোনো মানুষ দেখা যাবে না। পরিতোষ ভেজা কণ্ঠে বলে, আমাদের অনুরোধ রাখুন। আজকের দিনটা থেকে যান। আমাদের ছেলেমেয়েগুলো ওদের সঙ্গে কেমন আনন্দ করছে, ভাবছে এখানেই বুঝি একটা পাড়া গড়ে উঠেছে।

সরলানন্দ আর সুমোহন ওদের অনুরোধ ফেলতে পারে না। বলে, ঠিক আছে আমরা কালই যাত্রা করবো। কিন্তু এখানে তো আপনারাও বেশিদিন থাকতে পারবেন না, কারণ জল নেই।

আমরা খাবার জল এইসব টিনে করে বয়ে বেড়াই। সঙ্গে খানিকটুকু জল আছে। তবে আমি আর পরিতোষ জলের খোঁজে বেরিয়ে পড়বো। আমাদের যে শিশুটি জন্মাবে তার জন্য তো জল চাই।

চলুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাবো।

সরলানন্দ আর সুমোহন ওদের সঙ্গী হয়। ছোট ছোট পাত্র যা ছিলো তা নিয়ে শুদ্ধানন্দ আর বুদ্ধজয় জল আনার জন্য তৈরি হয়। ওদের বিশ্বাস জল খোঁজার জন্য বেশিদুর যেতে হবে না। পাহাড়ি ঝরনা বা ছড়ার জল না পেলেও কোথাও-না-কোথাও জমে-থাকা বৃষ্টির জল ঠিকই পাওয়া যাবে। এখন তো বর্ষাকাল। যখন-তখন বৃষ্টি হয়। আকাশে রঙধনু ফুটে ওঠে। ঝকঝকে রোদ গাছের পাতার উপর বিছিয়ে থাকে। যেন পাখিদের ডেকে বলে, এখনই তোমাদের পা ফেলো। তোমাদের পায়ের ছাপ ফুটে উঠুক গাছের পাতায়। ছোটরা সেইসব পাতা দিয়ে পিঁপড়ের মতো ঘর বানাবে। তারপর ঘরের চালে ঝুলিয়ে রেখে অন্যদের ডেকে বলবে, দ্যাখো কী সুন্দর নকশা!

পুরুষরা পানি আনার জন্য পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে চন্দ্রাবতীর মনে হয় ব্যাথা বাড়ছে। অপরাজিতার দিকে তাকিয়ে বলে, দিদি কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে–

বুঝেছি, আয় ঘরে আয়।

অপরাজিতা চন্দ্রাবতীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে ঘরের ঝাপটা টেনে দেয়। ছুটে আসে শিশির। দু'হাতে ঝাঁপটা ধরে বলে, মায়ের কী হয়েছে? আমি মায়ের কাছে যাবো।

তুমি তোমার ছোটবোনকে দ্যাখো। তোমার মাকে আমি দেখবো।

শিশির দু'হাতে চোখ মোছে। মনীষ ওর হাত ধরে বলে, আয়। দেখ, তোর হাতের উপর কী চমৎকার একটি ছোট্ট মাকড়সা। মাগো এত সুন্দর মাকড়সা আমি কখনো দেখিনি।

দু'জনে ছুটোছুটি করে ফড়িং ধরতে চায়। একটাও ধরতে পারে না। প্রজাপতিগুলো অনেক উঁচুতে চলে যায়। মনীষ বলে, আমি তো লোপাকে একটা ফড়িং ধরে দিতে ছেয়েছিলাম। হলো না। ফড়িংটাকে লোপার চুলের ফিতায় বেঁধে ওর পিঠে ঝুলিয়ে দিতাম। মনে হতো লোপার চুলে একটা সুন্দর ক্লিপ।

শিশির মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি করে।

আমি অতো নিষ্ঠুর হতে পারবো না। ফড়িংকে ফিতে দিয়ে বেঁধে আমি কষ্ট দিতে চাই না।

মনীষ চুপ করে থেকে বলে, আমি তো লোপাকে খুশি করতে চেয়েছিলাম। লোপা যে মায়ের কাছে যাবো বলে কাঁদছে।

কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে শান্ত হয়ে যাবে। চলো, লোপাকে নিয়ে আমরা নিচে যাই। দেখি কোন সুন্দর ফুল খুঁজে পাই কি না।

দু'জনে লোপাকে নিয়ে টিলা বেয়ে নামার সময় দেখতে পায় ঝোপে আটকে আছে ছোট্ট একটা বনমোরগ। কাঁটালতায় ওর পা জড়িয়ে গেছে। সেজন্য আর কোথাও যেতে পারেনি। ওদের দেখে হয়তো ঘাপতি মেরে আছে। ডাকাডাকিও করছে না। দু'জনে বনমোরগের বাচ্চাটা কাঁটালতা থেকে ছড়িয়ে নিয়ে এসে দেখতে পায় ওটার পায়ে ক্ষত। সেজন্য ওটা হাঁটতে পারছে না। মনীষ বলে, চলো উপরে নিয়ে যাই। এখানে রেখে গেলে এটাকে বনবেড়াল খেয়ে ফেলবে।

বনবেড়াল খাবে না, শেয়াল খাবে।

লোপা হাত বাড়িয়ে বলে, ওটা আমাকে দাও আমি পুষবো। আমি পোকামাকড় ধরে ওটাকে খাওয়াবো। ভাত দেবো, চাল দেবো।

ভাত? ভাত কোথায় পাবি?

ভাত না পেলে বুনো আলু দেবো।

ও কি বুনো আলু খাবে?

এত কথা বলছো কেন? দাও না আমাকে।

দু'জনে বনমোরগের বাচ্চাটা লোপাকে দিলে ও বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একছুটে টিলার উপর উঠে যায়। ওটাকে একটা ভাঙা ঘরের কোণায় আটকে রাখে। ভাবে, বাবা জল নিয়ে ফিরলে একটু জল খেতে দেবে। ওর নিশ্চয় ভীষন পিপাসা পেয়েছে। আহা, সোনার বাচ্চা। লোপা কান্না ভুলে বনমোরগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছোটরাও

মোরগটাকে কীভাবে বাঁচানো যায় সে চিন্তা করতে থাকে। ওটা এখন ওদের ভীষন মজার একটা খেলার জিনিস।

পুরুষরা পানি নিয়ে ফিরে এলে অপরাজিতা দরজা খুলে সবাইকে বলে, সুখবর আছে।

তখন নবজাতকের কান্না ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। ছোটরা ছুটে এসে জড়ো হয় ঘরের দরজার সামনে।

নিখিল এগিয়ে এসে হাসিমুখে বলে, সুখবরের বার্তা আমরা পেয়ে গেছি। কী হয়েছে? মেয়ে না ছেলে?

অপরাজিতা হাসিমুখে বলে, তোমার মেয়ে হয়েছে নিখিল দাদা। সবাই মিলে নাম ঠিক করো।

পরিতোষ বিষন্ন কণ্ঠে বলে, রীতি অনুযায়ী তো নাম রাখা যাবে না। তবে আমরা নিজেরা একটা নাম ঠিক করে ফেলবো। নিখিলদার আর একটা মেয়ের নাম রাখার সময় আমর ভেজানো সলতে সবচেয়ে বেশিক্ষণ জ্বলেছিল। লোপমণির নাম আমি রেখেছিলাম। এবারও নামটি আমি রাখবো।

কী নাম রাখবেন কাকা?

শিশির এসে প্রিয়তোষের গলা জড়িয়ে ধরে।

ওর নাম রাখবো নিপুণিকা।

ওহ, নিপুণিকা, নিপুণিকা।

লোপা শিশিরের হাতে বনমোরগের একটা পালক দিয়ে বলে, ওই পালকটা বনমোরগের বাচ্চার ডানা থেকে ছুটে পড়েছে। তুমি ওটা দিয়ে ধুলোর উপরে নিপুণিকার নামটা লেখো।

হ্যাঁ, তাই করো শিশির। গাঁয়ে থাকলে তো আমরা কলাপাতার উপর সুতার তৈরী সলতে তেলে ভিজিয়ে জ্বালিয়ে দিতাম। যার সলতে বেশিক্ষন জ্বলতো তার রাখা নামটাই সবাই মেনে নিতো। এখন তো সেসব কিছু হবে না। এখন আমাদের তেল নেই, সলতে নেই। তাই বলে কি আমরা বসে থাকবো? লোপা যা বলেছে তাই করা হোক। ধুলোয় নামটা কতদিন লেখা থাকবে আমাদের নিপুণিকা--।

থাক, আর বলতে হবে না। গাঁয়ে যে সলতে আমরা জ্বালাতাম তার একটা কারণ ছিলো। যে সলতেটা বেশিক্ষন জ্বলতো তেমনই দীর্ঘজীবী হতো বাচ্চাটি। ধুলো কি তেলের মতো জ্বলবে? ওটা মাটিতে মিশে যাবে অল্পক্ষনে।

হয়েছে, আমরা এসব ভাববো না। আমরা বনমোরগের রঙিন পালকের মতো সুন্দর জীবন চেয়ে নিপুণিকার জন্য প্রার্থনা করবো।

শুদ্ধানন্দের একথায় সবাই খুব বেশী খুশি হয়। ছেলেরা মুরগির পালক দিয়ে নিপুণিকার নাম লেখার জন্য জায়গা পরিষ্কার করতে থাকে। নিখিল এক গ্লাস জল দিয়ে বুদ্ধজয়কে বলে, যাও মাসিকে দিয়ে এসো। তোমার মাসির বোধহয় ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে।

পরিতোষ অবাক হয়ে নিখিলের মুখের দিকে তাকায়। ও কেমন করে বুঝলো যে চন্দ্রাবতী এখন জল খাবে? খুব কষ্ট করে জল সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে। সরলানন্দ আর সুমোহন নিখিলের দিকে তাকালে দেখতে পায় নিখিলের চোখ চকচক করছে। একমাত্র বাবা হলেই মানুষের চোখ এমন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সরলানন্দ আর সুমোহন আশ্রম পুড়ে যাওয়ার পর এই প্রথম ভীষণ খুশি হয়। ওরা খানিকক্ষনের জন্য দুঃখ ভুলে যায়।

ছেলেরা উঠোনে নিপুণিকার নাম লেখা শেষ করে। প্রত্যেকে নাম লেখে। উঠোন ভরে যায় নামে। একটু পরে ওরা দেখতে পায় দু'হাতে দুটো পাকা পেঁপে নিয়ে বানর দুটো লাফিয়ে লাফিয়ে টিলার উপরে উঠে আসছে। ছোটরা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দেয়। শুদ্ধানন্দ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওর হাতে পেঁপে দিয়ে দেয় বানর দু'টো। তারপর লাফ দিয়ে কাছের একটি ডালে গিয়ে বসে। নিখিল অবাক হয়ে বলে, তিন মাস ধরে বনে পালিয়ে আছি, কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেনি। তোমরা ভাগ্যবান। ভগবান তোমাদের সহায় আছেন।

পরিতোষও নিজের বিস্ময়ের ভাব কাটাতে পারে না। বলে, মানুষ-পশুতে এমন বন্ধুত্ব হয়?

সরলানন্দ হাসতে হাসতে বলে, শুদ্ধানন্দ এসো ওই দু'টোর নাম রাখি। শুধু বানর শুনতে ভালো লাগে না।

নাম? হ্যাঁ, খুব ভালো হয় নাম রাখলে। কিন্তু কী নাম রাখবো? ওদের তো আলাদা পরিচয় আছে। মানুষদের যে নামে ডাকা হয় ওদেরকে সেই নামে ডাকবো না।

তাহলে আমরা নাম পাবো কোথা থেকে? গাছের নামে ডাকবো?

না কি পাহাড়ের নামে ডাকবো?

না কি নদীর নামে?

ওরা সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। শেষে সরলানন্দ বলে, আমরা এখন বনে-জঙ্গলে দিন কাটাচ্ছি। ওদের একজনের নাম রাখলাম মাটনি, ও আমাদের নদী। ও পুরুষ। আর যে স্ত্রী বানর তার নাম রাখলাম গিরি। ও আমাদের পাহাড়। নদী দেবে আমাদের জল, আর পাহাড় দেবে শস্য।

নিখিল সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, দারুণ বলেছো। মাটনি আর গিরি চমৎকার নাম হয়েছে। আমার মনে হয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাই। তোমাদের সঙ্গে থাকলে মন ভালো থাকবে। আমার নিপুণিকা ছেলেদের হাসি শুনে হাসিখুশিতে বড় হবে। আমরা বড়রা তো কেবল দুঃখের কথা বলি। দুঃখের কথা শুনতে শুনতে আমার মেয়েটা চিররুগ্ন হয়ে যাবে।

অপরাজিতা সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে বলে, ছি ছি নিখিলদা আপনি এভাবে কথা বলবেন না। আমরা নিপুণিকাকে যত্ন দিয়ে বড় করবো। ও একটি শক্তিশালী মেয়ে হবে। দুঃখ ওকে ছোঁবে, কিন্তু ঘায়েল করতে পারবে না। ও আমাদের মাটনি হবে- জল

দেবে। ও আমাদের গিরি হবে- শস্য দেবে। ও আমাদের শিমুল হবে - তুলা দেবে। ও আমাদের কমলা হবে - ফলপাকুড় দেবে। ওকে আমায়....বলতে বলতে কেঁদে ফেলে অপরাজিতা। তারপর ফিক করে হেসে বলে, ওর জন্মদিন উপলক্ষে আজ আমি সবাইকে আলুসেদ্ধ খাওয়াবো। আর এই পাকা পেঁপে কেটে দেবো। সবাই ঠিক এক টুকরা পাবো। আমাদের মাটনি এবং গিরিও পাবে।

অপরাজিতার কথা শুনে সবাই মাটনি ও গিরির দিকে তাকায়। হাততালি দেয়। ওরাও গাছের উপর থেকে চিঁচি শব্দ করে আর হাততালি দেয়। লাফিয়ে গাছ থেকে নামে আর গাছে ওঠে। তখন শিশির বলে, বাবা আমার এই বনমোরগটার একটা নাম রাখতে হবে। এটাকে আমি পুষবো। দেখবে মাটনি আর গিরির মতো ও আমাদের ছেড়ে যাবে না। ওর কী নাম রাখা হবে?

সবাই সরলানন্দের মুখের দিকে তাকায়। সরলানন্দ একটুক্ষণ ভেবে বলে, ও আমাদের জাগরণী। প্রতিদিন আমাদের ভোরে জাগিয়ে দিয়ে বলবে, ওঠো। আর ঘুমিও না। দিনের শুরু করো। দ্যাখো কী সুন্দর দিন তোমাদের সামনে।

ছোটরা চেঁচিয়ে ওঠে - জাগরণী, আমাদের জাগরণী। খুব সুন্দর নাম হয়েছে। ওকেও আজ আমরা আলু সেদ্ধ আর পাকা পেঁপে খেতে দেবো।

শুদ্ধানন্দ বলে, আজ আমাদের অনেকগুলো ভালো কাজ হলো। আমাদের মাঝে নতুন মানুষ এসেছে। আমাদের বন্ধুদের নাম রাখা হয়েছে। আমরা একটি জন্মদিন পালন করবো। নিপুণিকা ভাগ্যবতী মেয়ে। আমরা সবাই ওর নাম লিখেছি। নিপুণিকা হাজার বছর বাঁচবে। জয় নিপুণিকার জয়।

সবাই একসঙ্গে বলে- জয়, নিপুণিকার জয়।

পাহাড়ে, ঝরনায়, ছড়ায়, গাছে, সমতলে ধ্বনিত হয় কণ্ঠস্বর। সবাই ভাবে, আজ একটি দারুন দিন। গহিন জঙ্গলে এমন দিন সহজে আসে না।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে সবার ঝিমুনি আসে। ওরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়। বিকেলের মধ্যেই ওদের যাত্রা শুরু করতে হবে। চারদিক সুনসান। ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। তাই কেউ ওদের বিরক্ত করতে চায় না। ওদের অনেক দূরে যেতে হবে। ওরা দূরযাত্রার পথিক।

সবার আগে ঘুম ভাঙে শুদ্ধানন্দের। টিলার উপর দাঁড়িয়ে ও চারিদিকে তাকায়। কী মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! দূরে পাহাড়ের মাথায় কুয়াশা জমে আছে- উড়ে যায় সাদা মেঘ, বর্ষাঋতু বলে মুহূর্তে দেখা যায় কালো মেঘের রেখা। রঙের মিশ্রনে ভিন্ন রঙ তৈরী হয়। ওর ইচ্ছে করে সবাইকে ডেকে ওই অপরূপ দৃশ্য দেখাতে। পরক্ষণে মনে হয় সবাইকে ডাকলে হট্টগোল হবে। হট্টগোলে মনোযোগ ছুটে যাবে। এমন দৃশ্য মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়। ও হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে- দেশ ছাড়ার আগে ওই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখবে কি দেশটা কেমন, কত তার নদী, কত ঝরনা, কত পাহাড়? কেমন করে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ আর বন্যপ্রাণী? আহা রে মানুষও কখনো কখনো বন্যপ্রাণী হয়ে যায়- বোবা এবং অসহায়। ওরাতো এ মুহূর্তে এই অসহায়

মানুষের দলে। ওদের বাড়ি নেই, ঘুমানোর জায়গা নেই, চুলো নেই, ঠিকমতো রান্না হয় না, কাপড় শুকোনোর দড়ি নেই, নিপুণিকার মতো নবজাতকের দোলনা নেই, রান্নার হাড়িকুড়ি নেই, থালা বাসন নেই, ওদের স্কুলে যাওয়ার জন্য বইখাতা নেই এবং জুমচাষের জন্য পাহাড় নেই, ফলের বাগান নেই, তরিতরকারির মাচান নেই। এত কিছু না থাকলে কি বেঁচে থাকা হয়?

শুদ্ধানন্দ মাটনি আর গিরির দিকে তাকায়। ওরা লেজ ঝুলিয়ে গাছের ডালে বসে আছে। নিশ্চুপ, যেন ওদের শান্ত-সুবোধ জীবনে এতগুলো বাচ্চা মৌমাছির মতো উড়ে এসেছে। বাচ্চাগুলোকে ঠিকঠাক রাখার দায়িত্ব ওরা নিয়েছে। ওরা যেখান থেকে পারে কিছু না কিছু ওদের জন্য খুঁজে আনে। শুদ্ধানন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক লাফে নিচে নেমে আসে। ওর গা ঘেঁসে দাঁড়ায়, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। শুদ্ধানন্দ হাসতে হাসতে বলে, এত আদর কেন? যেতে হবে একথা বলছো? চলো যাই।

শুদ্ধানন্দ সবাইকে ডাকে। বলে, মাটনি আর গিরি বলছে আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। ওঠো, সবাই।

যে যেখানে বসে ঝিমুচ্ছিলো সে যেখান থেকে জেগে ওঠে। সবার সামনে আশ্চর্য বিকেল প্রতিভাত হয়। বনমোরগ কক্‌কক্ শব্দ করতে থাকে। শিশির ছুটে এসে ওটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, জাগরণী, এখন সবাইকে বিদায় নিতে হবে। দল থেকে খসে পড়বো আমি আর মনীষ। জানিস আমাদের খুব খুশি লাগছে বাবা-মাকে পেয়ে আর আমাদের মন খারাপ লাগছে দলের সঙ্গে যাবো না বলে। তোকে পাওয়া আমাদের ভাগ্যের কথা।

শিশিরের বাবা নিখিল ছেলের হাত ধরে বলে, ওদের সঙ্গে আমাদের আবার একদিন দেখা হবে। এই দেশেই ওরা ফিরে আসবে। আমাদের দিন তো আর এমন হবে না। এসো ওদের বিদায় দিই।

সবাই পাহাড় বেয়ে নামার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, সুস্থ থাকুক নিপুণিকা।

চন্দ্রবতী ঘর থেকে বের হতে পারে না। বাকিরা ওদেরকে বিদায় দেয়। মাটনি আর গিরি দলের সামনে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামে। ওরা ভীষণ খুশি।

রাত হওয়ার আগে ওরা পৌঁছে যায় গিরিপথের মুখে। খুব সাবধানে গিরিপথটুকু পার হতে হবে। কারণ পাহাড়ের মাথায় আর্মির ক্যাম্প আছে। এই ক্যাম্পে যারা থাকে তাদের জন্য হেলিকপ্টারে চাল-ডালসহ অন্যান্য জিনিস আসে। দূর্গম পথ। পাহাড় থেকে নেমে জঙ্গল ঠেলে বের হতে ওরা পারে না। তার ওপর বিদ্রোহী পাহাড়িদের সংগঠন শান্তিবাহিনীর আক্রমনের ভয় আছে। তাই ওরা পাহাড়ের ওপর থেকে নামে না। ওখানে বসেই চারদিকে পাহাড়া দেয়। সময়মতো রেশন না এলে জঙ্গলের আলু-কচু খেয়ে দিন কাটায়। এই এলাকায় এক ধরনের বিষাক্ত মশা আছে। সে মশার কামড়ে জ্বর হলে খুব কম লোকই বাঁচে।

সুমোহন আর সরলানন্দ এখানে পৌঁছার আগে ছেলেদেরকে এসব কথা বলে সাবধান করে দিয়েছে। ছেলেরা ভয়ে তটস্থ। কারো মুখে কোন কথা নেই। আজ ওদের রাতের খাবারও কোন ব্যবস্থা নেই। মাথা নিচু করে জঙ্গলের আড়ালে পার হয়ে যেতে হবে এই রাস্তা। রাতই রাস্তা পার হওয়ার জন্য ভালো সময়। দিনের বেলায় আর্মির চোখে পড়ে গেলে ওদের গুলি করে দেবে। ওরা সংকীর্ন গিরি পথে সারিবদ্ধভাবে এগুচ্ছে। সবার সামনে সুমোহন, সবার পেছনে সরলানন্দ। দু'জনেই ছোটদের সামলে এগোচ্ছে। খানিকটুকু যেতে পা-পিছলে পড়ে যায় দেবপ্রিয়। ও ক্যাক করে শব্দ করার আগেই বুদ্ধজয় ওর মুখ চেপে ধরে। ও দু'হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে নিজেকে সামলায়। দু'পাহাড়ের মাঝখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। একজন আর একজনের ঘাড়ে হাত দিয়ে রেখেছে। যেন একজন অন্যজন থেকে আলাদা হয়ে না যায়। অন্ধকারে তেমন কিছু চোখে পড়ে না। মাটনি আর গিরি ওদের সঙ্গে আছে কি না ওরা বুঝতে পারে না। শুদ্ধানন্দের ধারনা নেই। কারণ ওরা এই সরুপথে আসতে পারবে না। ওরা ঠিকই গাছের ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ওদের পথ খুঁজে বের করবে। ওরা হয়তো সকালের অপেক্ষায় আছে।

একটু পরে পেছন থেকে সুখব্রত বলে, আমি আর হাঁটতে পারছি না। আমরা এই পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে একটুক্ষণ বসি না কেন?

নিম্নস্বরে কেউ একজন বলে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা সায় দেয়।

আমিও একটু বসতে চাই।

আমিও। আমার তেষ্টা পেয়েছে।

এখানে জল নেই।

মাটনি আর গিরি থাকলে আমাদের জন্য জল এনে দিতে পারতো।

তোমরা চুপ করো। কথা বলবে না।

চুপ করে থাকতে থাকতে আমার দম আটকে আসছে।

আমার কান্না পাচ্ছে।

সুমোহন মৃদু ধমক দিয়ে বলে, তোমরা হট্টগোল করছো। শান্ত হও।

আকস্মিক নীরবতা নেমে আসে। কারণ পাহাড়ের উপর থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। যারা ক্যাম্প পাহাড়া দিচ্ছে তারা হয়তো মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। ওরা সবাই পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। দম ছাড়ে, দম নেয়। কেউ মশার কামড় খায়। কারো জামার ভেতরে পোকা ঢুকে যায়। ওরা উশখুশ করে। হাত-পা নাড়াচাড়া করে মশা তাড়ায়। ওদের মনে হয় এই জীবনে বুঝি আর এখান থেকে বের হওয়া যাবে না। ওদের বুক ফেটে যায় চিৎকার করে কান্নার জন্য। কিন্তু কাঁদা যাবে না। কান্নার শব্দ শুনলে শব্দ লক্ষ্য করে গুলি ছুটে আসতে পারে। চারদিকে প্রবল পোকার শব্দ। কানে তালা লেগে যাচ্ছে যেন। ছোটরা নেতিয়ে যায়। কেউ কেউ এতকিছুর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। শুদ্ধানন্দের মনে হয়, আজ যদি এই পথে একটি বিশাল

অজগর সাপ আসে? কী হবে তখন? ওর শরীর শিউরে ওঠে। ও বাম হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে রাখে। পাশে বসে থাকা ছেলেটির ঘাড়ে মাথা এলিয়ে দেয়। ছেলেটি কে তাও জানে না। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না। পরক্ষণে ছেলেটি ওর মাথা সোজা করে দেয়। শুদ্ধানন্দ জিজ্ঞেস করে, তুই কে রে?

শুভজ্যোতি। আমি জানি তুমি শুদ্ধ দাদা। একটু আগে ডানপাশ থেকে তপনের মাথা বারবার আমার ঘাড়ে এসে পড়ছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মাথার ভার বইতে।

অন্ধকারে হেসে ওঠে শুদ্ধানন্দ। বলে, বেশ বলেছিস শুভ। এমন গভীর অন্ধকার রাতে মাথাও বোঝা হয়ে যায়। এই পথে হাঁটতে গিয়ে এতকিছু শেখা হলো আমাদের! শুভ তোর ঘুম পাচ্ছে না?

না। চোখ বুজতেই পারছি না।

কেন? কী হয়েছে?

ভয় করছে।

আমাদের সবারই ভয় করছে। তবু আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমের কাছে ভয় হেরে যাচ্ছে।

আমার কেবল মনে হচ্ছে, এই রাত আর কাটবে না। প্রভাত দেখা হবে না আর।

বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করে শুভজ্যোতি। ফোঁস ফোঁস শব্দ কখনো চাপা, কখনো উঁচুতে উঠতে গিয়ে আবার থেমে যায়। শুদ্ধানন্দ বুঝতে পারে যে ও প্রাণপনে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। তারপরেও উঠে হালকা করে ঠেলা দিয়ে বলে, কাঁদছিস কেন?

কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি কিছু যে বুঝতে পারছি না এ জন্য কাঁদছি।

তুমি আমাকে কাঁদতে বারণ করো না শুদ্ধ দাদা।

ঠিক আছে কাঁদ, কিন্তু শব্দ করবি না।

শুদ্ধানন্দের সহানুভূতিতে ওর কান্নার শব্দ বেড়ে যায়। ওপাশ থেকে সুমোহন থামার জন্য মৃদু ধমক দেয়। কিন্তু কাজ হয় না। সরলানন্দ রেগে ধমক দেয়, কিন্তু শুভজ্যোতি নিজেকে সামলানোর আগেই পাহাড়ের উপর থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হয়। আকাশের দিকে উড়ে যায় গুলি। ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় নিচে বসে থাকা দল। যাদের ঘুম পাচ্ছিলো তাদের ঘুম ছুটে যায়। প্রত্যেকে সোজা হয়ে বসে এবং পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে। বাকি রাত নির্ঘুম কেটে যায় ওদের।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওরা আবার হাঁটা শুরু করে। আগের মতো সারিবদ্ধ। এক জনের পেছনে অন্যজন। গিরিপথের সংকীর্ণ পথ থেকে বের হওয়ার মুখেই গহিন জঙ্গলের অন্যরকম চেহারা দেখা যায়। সরলানন্দের নির্দেশে ওরা ডান দিকে হাঁটতে শুরু করে। সবাই যখন বেরিয়ে গুটিগুটি পায়ে জঙ্গলের ভেতরে প্রায় ঢুকে পড়েছে তখন পাহাড়ের উপরের আর্মির ক্যাম্প থেকে গুলিবর্ষণ হয়। সরলানন্দসহ পাঁচটি ছেলে লুটিয়ে পড়ে। আহত অবস্থাতেই সরলানন্দ চেঁচিয়ে বলে, তোমরা পালাও। জঙ্গলের আরো গভীরে চলে যাও। এখানে একমুহূর্ত অপেক্ষা করবে না। যাও, চলে যাও।

সুমোহন মাথা নিচু করে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বলে, তোমাদেরকে রেখে এভাবে আমি যেতে পারবো না। কিছুতেই না।

আহ্, কথা বাড়িও না। যাও। ছেলেদের সাবধানে নিয়ে যাও। আমাদের যা হয় হবে, কিন্তু ওরা যেন বেঁচে থাকে।

তখন আবার একঝাক গুলি ছুটে আসে। অল্পের জন্য বেঁচে যায় সুমোহন। ও হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে। গাছের আড়ালে-আবডালে কিংবা ঝোপ গাছের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ছেলেরা অনেকটা দূরে সরে গেছে। শুদ্ধানন্দ ওদের সাহায্য করছে, কিন্তু এর মধ্যে অনেকের হাত-পা কাঁটায় ছিঁড়ে গেছে। গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে কপাল ফুলে উঠেছে। পঁচা শামুকের খোসায় পা কেটে গেছে। ছোটরা বিহ্বল, বিপর্যস্ত। পাহাড়ের উপর থেকে আর গুলির শব্দ ভেসে আসছে না। বোধহয় বিপরীত দিক থেকে আক্রমন না আসার কারণে আর্মি ক্যাম্প নীরব হয়ে গেছে। ছেলেরা আর কেউ এগোতে পারছে না। যে যেখানে ছিলো সে সেখানেই এলিয়ে পড়ে।

একটু পরে কান্নার শব্দ শুরু হয়। প্রথমে আস্তে, ফোঁস ফোঁস শব্দ থেমে থেমে শোনা যায়। পরে সেটা একটানা এবং আস্তে আস্তে জোরালো হতে থাকে। ঘন গাছের নিচে প্রায় আলোহীন জায়গাটিতে পড়ে থাকা ছেলেরা কিছুতেই আর নিজেদের শান্ত রাখতে পারে না। সুমোহন একবার ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলে, তোমরা থামো।

না। আমরা থামতে পারবো না।

কান্নার শব্দ শুনে গুলি ছুটে আসতে পারে।

আসুক। আমরা আর মৃত্যুকে ভয় পাই না।

কেউ কাউকে আর থামতে বলে না। কেঁদে-কেটে ছেলেরা শান্ত হয়ে যায়। এক সময় একদম স্তব্ধ হয়ে যায়। একটু পরে একে-দুয়ে উঠে বসে। চারদিকে তাকায়। দুপুর গড়িয়েছে। পাতার ফাঁকে হালকা রোদের পরশ এসে গায়ে লাগে। সবার ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। শুদ্ধানন্দ উঠে যায়। কাছাকাছি লতা-বাঁশের ঝোপ থেকে বাঁশফুল ছিঁড়ে আনে। ছেলেরা কাঁচা বাঁশফুল খেতে শুরু করে। বেশ লাগে খেতে। কী খাচ্ছে সেটা ওদের মনে থাকে না। শুধু মনে হয়, খেতে তো ভালই লাগছে। বেশ অনেকক্ষণ বাঁশফুল খেয়ে ওরা ভাবে, এ যাত্রায় বোধহয় ওরা বেঁচেই গেলো। কান্নাকাটিতে প্রত্যেকের চোখ-মুখ ফুলে গেছে। কারও নাক দিয়ে সমানে পানি ঝরছে। তখন সুমোহন ভেজাকণ্ঠে বলে, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি দেখে আসি।

আমরাও যাবো।

সবাই গেলে বিপদ হবে। পাহাড়ের উপর থেকে ওরা দেখে ফেলতে পারে।

ওরা আমাদের কান্নার শব্দ শুনতে পাইনি।

কান্নার শব্দ শুনতে পেলে ঠিকই গুলি করতো।

ওরা হয়তো ভেবেছিলো শেয়াল ডাকছে। হয়তো ভেবেছিলো বনের পশুদের ডাকাডাকি।

আহ্ , তোমরা থামো। ওরা কী ভেবেছিলো তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। ওরা আমাদের দল থেকে ছয় জন কমিয়ে ফেলেছে।

বলতে বলতে সুমোহন আবার কেঁদে ফেলে। তারপর দ্রুত চোখ মুছে বলে, আমি দেখে আসি ওদের। নি:শব্দে যাবো আর আসবো।

আর্মির কেউ যদি লাশের খোঁজে নিচে আসে?

ওই জঙ্গলে ভরা পাহাড় থেকে ওরা নামে না। নামতে ভয় পায়। ওরা নামবে না। আমি যাবো আর আসবো। তোমরা কেউ এখান থেকে নড়বে না।

ওদেরকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সুমোহন অদৃশ্য হয়ে যায় বড় গাছের আড়ালে। যে পথে ওরা এসেছিলো সেই পথের ডাল-পালা ভেঙেছে, পায়ের নিচে ঘাস ছিঁড়ে সরু পথের মতো চিহ্ন হয়েছে। শুকনো পাতা ভেজা মাটিতে পায়ের চাপে দেবে গেছে। এই সব নমুনা ধরে সুমোহন এগোতে থাকে। ও জানে ছেলেরা বেঁচে নেই। বেঁচেছিলো সরলানন্দ একা। এখনও কি বেঁচে আসে সরলানন্দ? ওর ভয়ও করে। বুকের ভেতরে ঢুপঢাপ শব্দ। যে কোন সময় বন্যপশুর আক্রমন হতে পারে কিংবা ক্যাম্পের পাহাড়াদারের নজরে পড়তে পারে। কিছুই বলা যায় না। ও গাছের পাতা বেশী নড়ায় না। ঘনঝোপ হলে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। বনে একটা ফাঁক পেলে আড়ালে আড়ালে সোজা হয়ে হাঁটে। সুমোহনের তেষ্টা পায়, ভীষণ তেষ্টা। কিন্তু ঝরনার শব্দ কোথাও নেই কিংবা ছড়ার লক্ষন।

কাছাকাছি এসে দেখে সরলানন্দ জীবিত নেই। ওর চোখ খোলা। পাথরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আসে। বুক ফুটো করে গুলি বেরিয়ে গেছে। ছেলেদের লাশের দিকে তাকানো যায় না। জমাট রক্ত শক্ত হয়ে আছে স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর। নিষ্পাপ সরল চেহারার পাঁচটি বালকের ফুটফুটে মুখগুলো অক্ষত আছে। ওদের চোখ বোজা। কেউ উপুর হয়ে বা কাৎ হয়ে পড়ে নেই। প্রত্যেকে চিৎ হয়ে আছে, শুধু রক্তে ভেসে গেছে শরীর। ওদের অদ্ভুদ দেখাচ্ছে, যেন লাল রঙের জলের রেখা আঁকাবাঁকা নদী বানিয়ে ওদের শরীর চিত্রিত হয়েছে। ওরা এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু পৃথিবী ওদের ধরে রেখেছে নদীর ছবিতে কিংবা পাহাড়ী ঝরনার স্বচ্ছতোয়া ধারায়। ওরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সুমোহন হাত ছোঁয়ালেই বলবে, আমরা কি পৌঁছে গেছি সীমান্ত এলাকায়? কোন্ শরনার্থী ক্যাম্পে আমরা থাকবো? তার চেয়ে আমরা এই বনে থেকে যাই না কেন একদল বুনোমানুষ হয়ে? যেমন আদিমকালের মানুষেরা বনে থাকতো, ফল-মূল খেয়ে জীবন কাটাতো। আমরা তো এখন তেমন সময়েই আছি।

সুমোহন সরলানন্দের পাশে হাটু গেড়ে বসে ওর হাতটা ধরে। মৃদু স্বরে বলে, বিদায় বন্ধু।

তারপর আশেপাশে থেকে ছেলেদের লাশগুলো টেনে এনে সরলানন্দের পাশে সারি করে রাখে। যেন একজন পিতার পাশে শুয়ে আছে সন্তানেরা। ওরা একই গন্তব্যে

চলে গেছে। ওদের আর কোন পিছুটান নেই।ওদের সামনে রেখে হতভম্বের মতো বসে থাকে সুমোহন। যেন ওর কিছু করার নেই। যেন ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই। যেন ওর জন্য ছেলেরা অপেক্ষা করে নেই। ওর কী করতে হবে তাও ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তখন আকস্মিকভাবে নিজের চারপাশে ছেলেদের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে উঠে ও। বিস্ময়ে অবাক হয়ে বলে, তোমরা?

আমরা থাকতে পারলাম না। আমরা ভীষণ নি:শব্দে এসেছি।

আমাদের শিক্ষককে, আমাদের বন্ধুদের আমরাও শেষ বিদায় জানাতে চাই।

ওরা লাশের চারপাশে জড়ো হয়ে বসে।

বিদায় অলক।

বিদায় সুশীল।

বিদায় নভোজ্যোতি।

বিদায় মৃদুল।

বিদায় তাপস।

আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে শব্দ, বিদায়, বিদায়।

কাজটা শুদ্ধানন্দ প্রথমে শুরু করে।

আশেপাশে জমে থাকা শুকনো পাতা দিয়ে মৃতদেহগুলো ঢাকতে শুরু করে। সবাই একই কাজে লেগে যায়। তারপর ওরা গাছের চিকন ডাল ভেঙ্গে ওদের চারপাশে পুতে দেয়। লম্বা ডাল দিয়ে শরীর ঢেকে লতা ছিঁড়ে এনে চারপাশে শক্ত করে গিট্ঠু দেয়। সুমোহন ভাবে, এভাবে কি শেষ রক্ষা হবে? হয়তো না। বুনো পশুরা ওদেরকে খাওয়ার জন্য ছুটে আসতে পারে।

বুদ্ধজয় বলে, আমরা কি ওদের জন্য একটা কিছু করতে পারলাম?

অনেকেই চুপ করে থাকে। উৎপল বলে, হ্যাঁ একটা কিছু তো হয়েছে।

শেয়াল ওদের খেতে পারবে না। পাতাগুলো সরাতে পারবে না শেয়াল।

এসব কথা থাক এখন। আমরা অবশ্যই ওদের জন্য কিছু একটা করতে পেরেছি। এর চেয়ে বেশি আমরা আর কী করতে পারতাম।

শুদ্ধানন্দ খানিকটা জোর দিয়ে কথা বলে।

সুমোহন ওদের তাড়া দিয়ে বলে, আমাদের এখানে আর বেশিক্ষন থাকা উচিত নয়। তোমরা এগুতে থাকো। আমি সবার পেছনে থাকবো।

ছেলেরা বুনো পথে শব্দ না করে পা ফেলে এগুতে থাকে। যেন কতগুলো ইঁদুর ওরা। এই মুহুর্তে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বেড়াল। ওকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে ওদের। সেই কৌশলে ওরা এখন শব্দ না করে পা ফেলতে শিখেছে। যে জায়গাটি ওরা ছেড়ে গিয়েছিলো সেখানে পৌঁছে ছেলেরা বিভিন্ন গাছের কান্ডে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। বলে, আমরা আর হাঁটতে পারবো না। আজ রাতটা এখানে থাকবো।

সুমোহন সায় দেয়। বলে, ঠিক আছে তোমরা বিশ্রাম করো। আমি জেগে থাকবো। তোমাদের পাহাড়া দেবো। বুনো জন্তুর ভয় আছে।

সুমোহন গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে লাঠি বানায়। শুদ্ধানন্দকে সঙ্গে নিয়ে আশেপাশের বেশ খানিকটা জায়গা ঘুরে আসে। না, তেমন বিপদের কিছু চোখে পড়ে নি। স্বস্তি নিয়ে ফিরে আসে ওরা। সূর্য ডোবার আগেই গহিন জঙ্গলে রাত হয়ে যায়। সূর্যের শেষ আলো পাতার ফাঁকফোকরে ঢোকে না। গা ছমছম করা ভৌতিক স্তব্ধতায় চারদিক নিবিড় হয়ে আছে। ছেলেদের মুখে কথা নেই। পাতা ঝরার শব্দেও কেউ কেউ চমকে উঠে। চিৎকার করে ওঠে। তারপর নিজের হাত দিয়েই নিজের মুখ চেপে ধরে। যেন নির্ভয়ে পার হয়ে যেতে পারে এই বন।

শেষ রাতে ঝিমুনি আসে সুমোহনের। ঘুম যখন ভাঙে তখন আলো দেখে মনে হয় এই বুঝি ভোর হলো। কিন্তু হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বেলা এগারোটা। বনের ফাঁকে সূর্যের অপূর্ব স্নিগ্ধ আলোয় ও মুগ্ধ হয়ে যায়। ভাবে ছোটদের ডেকে বলে, দ্যাখো, দ্যাখো ভগবানের কী অসীম ক্ষমতা। সূর্য এবং বন দিয়ে তৈরী করেছেন রহস্যময় জ্যোতি। আমাদের কী সাধ্য এ স্বরূপ বোঝার। সুমোহন প্রার্থনা করে। ক্লান্ত, বিপর্যস্ত শিশুদের ঘুম থেকে টেনে তোলার ইচ্ছা হয় না ওর। ওরা যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে ততক্ষনই ওদের শান্তি। যতক্ষন জেগে থাকে ততক্ষণ দু'চোখ ভরে এতকিছু দেখতে হয় যে, ওরা ভুলে যায় নিজেদের ফেলে আসা গ্রাম, আশ্রম, পরিবার ইত্যাদি অনেককিছু। ওরা তটস্থ থাকে, ভয়ার্থ থাকে এবং জীবনের ঝুঁকির প্রশ্নে জড়বৎ হয়ে যায়। তারপরেও এসব শিশুরা দীর্ঘ একটি পথ হেঁটে আসার মতো সাহসী ছিলো। এখন ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ওদের সামনে অনিশ্চিত যাত্রা নেই। সুমোহন প্রবল মমতায় সবার মুখের দিকে তাকায়। মনে হয় ছোটদের নির্মিলিত চোখের তারায় স্বপ্ন আছে। দুঃখের পরে পাওয়া সুখের স্বপ্ন।

এক সময় গহিন বনে রোদ খানিকটুকু গাঢ় হয়। একে-দুয়ে ছেলেদের ঘুম ভাঙে। প্রত্যেকে কলকল করে নিজেদের স্বপ্নের কথা বলতে চায়। বুদ্ধজয় হাসতে হাসতে বলে, আমি স্বপ্ন দেখেছি মাটনি আর গিরি ফিরে এসেছে। দু'জনের মাথায় দুই ঝুড়ি কমলা। ওরা নিজেরাই আমাদের একটা একটা করে কমলা দেয়। মাটনি বলে, খাও, খুব মিষ্টি। গিরি বলে, এই ঝুড়িটা থাকুক। পরে খেয়ো। যখন জলতেষ্টা পাবে তখন।

শুদ্ধানন্দ বলে, আমিও সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি আমরা আশ্রমে আছি। পাঠদান চলছে। মাঠে ফুটবল খেলছি। আমাদের লিচু গাছগুলোতে লিচু দিয়ে বোঝাই হয়ে গেছে। পাতা নেই। শুধুই লিচু। আমাদের আনন্দ দেখে শিক্ষকেরা বলছেন, আমাদের সামনের দিনগুলো খুব ভালো যাবে।

বুদ্ধজয় শুদ্ধানন্দকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি দেখেছি আমি একটি ঘোড়ার পিঠে চরে মাটনি নদীর ধার দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছি। আমি রাজার পোশাক পরে আছি। আমার পেছনে সৈন্য-সামন্তের অভাব নেই। চারদিকে ঢোলবাদ্য বাজছে। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। কে যেন আমাকে বলে, আরও সামনে গেলে তুমি একটি রাজ্য পাবে। তুমি সেই রাজ্যের রাজা হবে। তুমি তোমার প্রজাদের ভীষণ ভালোবাসবে।

স্বপ্নের কথা বলতে বলতে বুদ্ধজয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছেলেরা হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, তাহলে আমরা সবাই তোমার রাজ্যের প্রজা হবো। তোমার ভালোবাসা নিয়ে আমরা ঠিকমতো খেতে পারবো, ঘুমুতে পারবো।

আমরা কেউ গরীব থাকবো না।

আমরা সবাই স্কুলে যেতে পারবো।

কেউ আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবে না।

আমাদের আশ্রমও কেউ পোড়াবে না।

আমাদের কেউ গুলি করে মেরে ফেলবে না।

সত্যি, এমন একটি রাজ্য আমাদের জন্য কি তুমি বানাতে পারবে বুদ্ধজয়?

ধুত, এটা তো স্বপ্নের কথা।

আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি। খুব সুন্দর স্বপ্ন।

আমিও দেখেছি।

আমিও।

আমিও।

সবাই চেঁচাতে থাকে। নিজেদের স্বপ্নের কথা বলার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। সুমোহন দু'কান ভরে ছেলেদের কথা শোনে। ওরা নিজেদের কথা বলার জন্য চেঁচামেচি করছে। যে যার মতো করে বলে যাচ্ছে। সুমোহন কান পেতে শুনে খেয়াল করে যে, প্রত্যেকে ভালো স্বপ্নের কথা বলছে। এসব স্বপ্নের গল্পে দু:স্বপ্ন নেই। প্রবল স্বস্তিতে ও আশ্বস্থ হয়। ওদের চুপ করতে বলে না। ওদের কলকল শব্দ বনজুড়ে জেগে থাকুক। পাহাড়ের উপরের ক্যাম্পে পাহারারত আর্মির কানে ওদের কণ্ঠস্বর পৌঁছাবে না।

=পাঁচ=

আবার যাত্রা শুরু।

মাথার উপরে সূর্য। রোদের তেজ বেড়েছে, কিন্তু বনের স্নিগ্ধ বাতাস গরমের অনুভব কমিয়ে দিচ্ছে। ছেলেরা হেসেখেলে এগিয়ে যাচ্ছে। কখনো দৌড়ে গিয়ে ফুল ছিঁড়ে আনছে, কখনো গাছের বড় গোটা পায়ের কাছে ফেলে ফুটবলের মত গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আশ্রমে ওদের ফুটবল খেলার মাঠ ছিলো। বিকেল হলেই ওরা মাঠে ভিড় করতো। একদল ছিল খেলোয়ার, অন্যদল দর্শক। সে মাঠটায় এখন সেটেলার বাঙালীরা ঘর তুলবে। ডেরা বাঁধবে, গাছ লাগাবে, ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে জন্ম নেবে। একদিন ভরিয়ে তুলবে মাঠের সবটুকু। আগামী দিনের মানুষেরা জানতেও পারবে না যে এখানে একদিন একটি খেলার মাঠ ছিলো। ভীষণ মন খারাপ হয় সুমোহনের। তখন একটি ছেলে চিৎকার করে ওঠে, দ্যাখো, দ্যাখো।

সবাই ওর দেখানো গাছের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে। কেউ কেউ দু'হাতে মুখ ঢাকে। গাছে তিনটা মানুষের খুলি ঝুলছে। বাতাসে একটার সঙ্গে আর একটার ধাক্কা লেগে টুং করে শব্দ হয়। ছেলেরা হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ওদের ভয় কেটে গেছে। শুদ্ধানন্দ বলে, আমরা কি এগুলো খুলে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেবো?

ও বাব্বা, কে খুলতে যাবে। আমি তো পারবো না।

আমিও না।

আমিও না।

প্রত্যেকের মুখে 'আমিও না' ধ্বনি।

শুদ্ধানন্দ বুক চিতিয়ে বলে, আমি পারবো। মানুষের মাথার খুলি এভাবে ঝুলতে দেখে আমার খারাপ লাগছে।

উৎপল বলে, এগুলো বোধহয় কাঠুরিয়াদের মাথার খুলি। নিশ্চয় বনে গাছ কাটতে এসেছিলো তখন কেউ ওদের মেরে ফেলে।

থাক, আমরা ধারনা করে কথা বলবো না। সুমোহন সবাইকে তাড়া দেয়।

এখানে আর দাঁড়াতে হবে না। চলো, সবাই এগিয়ে চলো। এখনো আমাদের সামনে আরও কয়েক দিনের পথ আছে।

এভাবে যেতেই আমাদের ভালো লাগছে। থেমে থেমে বিশ্রাম নিয়ে।

আমার আর হাঁটতে ভাল লাগছে না, সুগত কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে।

তুমি হাঁটতে না পারলে-

না না, আমি কারও ঘাড়ে উঠবো না।

সবাই ওর লাজুক ভঙ্গি দেখে হাসতে থাকে। ওর নিজের ও মিটিমিটি হেসে বলে, আমি হাঁটতে পারবো, দৌড়াতেও পারবো। বলেই ও ছুট লাগায়। অন্য ছেলেরাও ওর সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করে। খানিকটা যাওয়ার পর সুগতই চেঁচিয়ে বলে, দ্যাখো, দ্যাখো।

থমকে দাঁড়ায় সবাই। খানিকটা দূরে একটি ছড়ার দশ-বারোটা হরিণ শুয়ে আছে। ছোট দু'একটা বাচ্চা একটি আর একটির সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করছে। লাফাচ্ছে। জলের ধারে ছুটে যাচ্ছে।

ছেলেরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুমোহন দৌড়াতে পারে নি, তাই পিছিয়ে আছে। ও কাছে এলে শুদ্ধানন্দ বলে, আমরা এখানে বসে পড়ি। আরও এগিয়ে গেলে হরিণগুলো পালিয়ে যাবে।

কিন্তু আমরা বসে থাকবো কেন? আমরা আমাদের মতো চলে যাই। হরিণগুলো এখানে থাকুক বা না থাকুক তাতে তো আমাদের কিছু এসে যায় না।

সুগত গোঁ ধরে বলে, হরিণগুলো যতক্ষণ থাকবে আমরাও ততক্ষণ থাকবো। আমি ওদের খেলা দেখবো।

আমরাও দেখবো।

আমরাও থাকতে চাই।

ছেলেদের এমন সরল-নিষ্পাপ আচরণে খুশি হয় সুমোহন। এমন দৃশ্য দেখার সুযোগ ওদের জীবনে কমই হবে। জীবনের এই সময়ও ওদের জন্য থাকবে না। একটি করে দিন গড়ায় আর ওরা বড় হয়। প্রতিদিনই ওরা একটু একটু করে হারিয়ে ফেলছে শৈশবের সময়। আস্তে আস্তে ওরা ঢুকে যাচ্ছে বয়সের জটিল সময়ে। জটিল সময়ে!

সুমোহন থমকে যায়। ওরা যে সময় পার হচ্ছে এর চেয়ে জটিল সময় ওদের জীবনে আর কী হতে পারে? এই বয়সেই মানুষের নিষ্ঠুর আচরণ ওদেরকে ভয়াবহ গুহায় ছুঁড়ে দিয়েছে, যেখানে ঢুকলে মানুষের বেঁচে থাকার সাধ ফুরিয়ে যায়।

তখন ছেলেরা চেঁচিয়ে বলে, গেলো, গেলো।

ওরা দৌড়ে যায় ছড়ার ধারে। হরিণের যে ছোট বাচ্চাগুলো ছড়ার ধারে গুঁতোগুঁতি করছিলো তার একটি পড়ে গেছে ছড়ায়। বড় হরিণগুলো ছড়ার ধারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে। অসহায়ভাবে চারদিকে তাকায়। দু'তিন জন ছেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চটাকে টেনে উপরে তোলে। অগভীর পাহাড়ি ছড়া বলে ওগুলোকে টেনে তুলতে কষ্ট হয় না। বাচ্চাটাকে পেয়ে মা-হরিণ কী যে খুশি! আদরে ভরিয়ে দেয়। অন্যগুলো খুশিতে গা চেটে দেয় বাচ্চাটার। ওটা মায়ের পেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

ছোটরা বলে, আজ আমরা এই ছড়ার মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করবো। অগভীর ছড়ায় আমরা কেউ ডুবে যাবো না।

আমরা গামছা দিয়ে মাছ ধরবো।

ছড়ায় অনেক কাঁকড়া আছে। আমরা কাঁকড়া ধরবো।

এসব বলতে বলতে ওরা জলে নামে। সুমোহনের নিজেরও নামতে ইচ্ছে হয়। টলটলে জল। ও ওদের ছাড়িয়ে আরও সামনে যায়। হরিণগুলো অনেকটা দূরে গিয়ে জায়গা নিয়েছে। সুমোহন জলে নামার আগে সামনে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে যায়। দূরে ফুরামোন পর্বতশ্রেনী। নীলাভ কুয়াশায় জড়ানো হালকা মেঘের সমান্তরালে অবস্থিত পর্বতচূড়া থেকে দৃষ্টি সরাতে পারে না সুমোহন। যেন অপার রহস্য ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই কৈশোর থেকেই ও পর্বতের ডাক শুনতে পায়। অনেকদিন ভেবেছে পর্বতের কাছে কোথাও গিয়ে থাকবে। কোনদিন ফিরে আসবে না লোকালয়ে। ফলমূল খেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। আজ কি এমন হয় যে, এই সব ছেলেদের দুদুকছড়ি সীমান্তের পথটা দেখিয়ে দিয়ে নিজে চলে যাবে পর্বতের দিকে? একটি গুহা খুঁজে নিয়ে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবন? না, তা হবে না। ও একপা দু'পা করে পানিতে নামে। ও জানে ফুরোমোনের সঙ্গে আছে রামপাহাড় আর ভাঙামুড়া পর্বত। ফুরামোনের পূর্বদিকে আছে ধলাগিরি পর্বত শ্রেণী। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম লংট্রাই শৃঙ্গ। গোটা পার্বত্যভূমির পর্বতগুলোর নাম ওর মুখস্থ। নানাভাবে এগুলো সম্পর্কে জেনেছে। কোন কোন পার্বতের পাদদেশে গিয়েছে। চূড়ায় ওঠা হয়নি। বান্দরবান জেলার কেওক্রাডং পর্বতে

ওঠার ইচ্ছে আছে ওর। কখনো সময় হলে দেশে এই সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের চুড়ায় উঠে দেশটাকে দেখবে।

এই দেশটাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।

বলতে বলতে হাঁটু সমান জলে নামে সুমোহন। বুকের কাছে হাত জড়ো করে ঈশ্বরের কাছে বেঁচে থাকার কৃতজ্ঞতা জানায়। ওর চোখ ছাপিয়ে জল গড়ায়। এই পথযাত্রায় যারা মারা গেছে তাদের স্মরণে ও শোকার্ত হয়ে যায়। ভাবে, আমাদের মায়েরা আমাদের জন্ম দিয়েছে বেঁচে থাকার জন্য। মানুষ কেন আমাদেরকে মেরে ফেলবে। যারা মারা গেছে তাদের কারো মায়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি কী বলবো? মায়েরা যদি প্রশ্ন করে, কেন তোমারা আমার ছেলেকে বন্দুকের গুলির সামনে থেকে আড়াল করে রাখতে পারো নি? তোমরা কী এতই বোকা, নাকি বুদ্ধিহীন? ও কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমাদের ক্ষমা করে দিন অদৃশ্য মায়েরা। আমরা আপনাদের ছেলেদের জন্য যোগ্য কাজ করতে পারি নি। আমরা ওদের প্রতি ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারিনি।

তখন হঠাৎ ওর মনে হয় পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ও ভয় পায়। তারপর ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে হরিণগুলো ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের অপূর্ব মায়াবী চোখে ওর জন্য মমতার ভাষা ছায়ার মতো লেগে আছে। সুমোহন মাথা ঝুকিয়ে বলে, জল যদি সব অপরাধবোধ ধুয়ে দেয়, তাহলে এই জীবন একটু সময়ের জন্য গ্লানিমুক্ত থাকতে পারবে। বেশ কিছুক্ষণ জলে থেকে ওর শরীর শীতল হয়ে যায়। ও পর্বতের চুড়ার দিকে তাকিয়ে জল এবং পাহাড়ের মধ্যে বেঁচে থাকার স্বপ্ন খোঁজে। উপরে ওঠার জন্য পেছনে ফিরলে দেখে হরিণগুলো আবার দূরে চলে গেছে। উপরে উঠে কাপড় শুকানোর জন্য রোদে বসে থাকে। ছেলেরাও জল থেকে উঠে ওর চারপাশে এসে বসে। রোদে গা শুকিয়ে নিলে শীতের ভাব কমে যায়।

শুদ্ধানন্দ বলে, আজ এখানে আমরা কলার থোড় সেদ্ধ করবো। খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকে আবার যাত্রা শুরু হবে আমাদের।

ঠিক, ঠিক বলেছে শুদ্ধ দাদা।

আমরা এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাই।

ঠিক আছে থাকো।

সুমোহন সায় দেয়।

ওরা যখন কলার থোড় সেদ্ধ করার তোড়জোড় করছে তখনই ওরা আসে। শান্তিবাহিনীর পাঁচ জন সদস্য, পিঠে বন্দুক ঝোলানো। কাঁধে কয়েকটা ঝোলা। ঝোলায় কী জিনিস আছে তা বোঝা যাচ্ছে। একজন বন্দুক তাক করে ধরে বলে, তোমরা কারা? কোথায় থেকে এই বনে এসেছো?

সুমোহন এগিয়ে আসে। আশ্রম পুড়িয়ে দেয়ার কথা বলে। ছেলেরা কাঁদতে থাকে। বলে, আমরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাবো।

যাবি তো ভালো কথা। কাঁদছিস কেন? চুপ কর সবাই। তোরা জানিস আমরা কে?

ছেলেরা চেঁচিয়ে বলে, শান্তিবাহিনী।

আমরা কেন জঙ্গলে দিন কাটাই জানিস?

সুমোহন মৃদুস্বরে বলে, জানি। তোমরা কঠিন কাজ করছো। আমাদের সবার জন্য তোমরা লড়াই করছো।

হ্যাঁ, লড়াই। ওরা আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের এলাকা করতে চায়, আমরা সেটা হতে দেবো না। লড়াই করে নিজেদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে হবে।

আর একজন বলে, আসার পথে কয়েকটা মাথার খুলি দেখেছিস না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছি। গাছে ঝুলে আছে মাথার খুলি।

ওরা আমাদের গাছ কাটতে জঙ্গলে ঢুকেছিলো। ওদেরকে কেটে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছি। আমাদের গাছ ওদেরকে কাটতে দেবো না।

ঠিক আছে। গাছ কাটতে হলে আমরা কাটবো। যতটুকু দরকার ততটুকু কাটবো। ওরা তো আমাদের বন কেটে উজাড় করে দিচ্ছে।

তখন শান্তি বাহিনীর একজন বলে, বন উজাড় হয়ে যাচ্ছে বলে, আমাদের পার্বত্যভূমির কোন কোন এলাকায় পানির উৎস শুকিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমাদের জনজীবনের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে।

ছেলেরা দু'হাতে চোখের জল মুছতে থাকে। তখন পার্বতভূমির বিপ্লবী সদস্যরা সুমোহনকে নিজেদের পরিচয় দেয়।

আমার নাম দীপকরাগ।

আমি সুবিনয়।

আমি হরিগোপাল।

আমি অলকানন্দ

আর আমার নাম সুবিমল। আমি বুঝতে পারছি আপনি বোধহয় ভিক্ষু-শিক্ষক ছিলেন।

হ্যাঁ। আমার নাম সুমোহন।

দুঃখ করবেন না । আমরা ঠিকই একদিন আমাদের দিন ফিরে পাবো।

আমাদের এইসব বোঝায় চাল আছে। চলুন রান্না করি। ছেলেরা বোধহয় কয়েকদিন ভাত খায়নি।

আমরা ভাত না খেয়ে থাকতে পারবো। এই যে কলার থোড় সেদ্ধ করছি ওতেই আমাদের চলবে।

ওগুলো রাতের জন্য রেখে দাও।

এই দুপুরে সবাই মিলে ভাত খাবো।

আপনাদের তো লাগবে।

আমরা আবার কোন বাজার থেকে সংগ্রহ করে নেবো।

আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমাদের লোকেরা সবসময় আমাদেরকে সহযোগিতা করে। আমরা চাইলেই জিনিস পাই। এসো কাজে লাগি।

ওরা কাঁধের বন্দুক মাটিতে নামায়। ঝোলাগুলো তো আগেই নামিয়েছিলো। ঝোলায় চাল আর আলু আছে। চাল-আলু দেখে ছেলেরা তো মহাখুশি। ফিসফিস করে বলে, আজ আমাদের ভোজের আয়োজন।

তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করলাম।

আমিও তোমাকে নেমন্তন্ন করলাম।

একজন আর একজনকে নেমন্তন্ন করে মজা করে। ছোট দু'জন হরিণগুলোকে বলে, তোমাদেরও নেমন্তন্ন রইলো। খেতে আসবে কিন্তু!

হরিণগুলো তখন আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা ওদের দিকে তাকিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে যায়। ছোটরা মন খারাপ করে। ভাবে, হরিণগুলো কোন কারণে দুঃখ পেয়েছে। তাই ওরা চলে যাচ্ছে।

আমরা কি হরিণদের দুঃখ দিয়েছি?

না তো। একদমই না। এত লোক দেখে ওরা সরে যাচ্ছে। মানুষ তো ওদের বন্ধু হয় না।

দীপকরাগ ওদের ধমক দিয়ে বলে, তোরা এতো হট্টগোল করিছ কেন? চুপ করে থাক।

তমসুক বসেছিলো। তিড়িৎ করে লাফিয়ে উঠে বলে, আমরা চুপ করে থাকবো না। আমরা যুদ্ধ করবো।

যুদ্ধ করবি? অলকানন্দ চোখ বড় করে।

করবোই তো! তোমরা করলে আমরা করবো না!

তোরা বড় হবি, যুদ্ধ করবি, ততদিন আমরা কি এই জঙ্গলে শুয়ে-বসে কাটাবো। তোরা যেন যুদ্ধমুক্ত পার্বত্যভূমি পাস আমরা তার চেষ্টা করবো। আমরাই যুদ্ধের অবসান ঘটাব। তোদের যুদ্ধ করতে হবে না। কি, মন খারাপ হলো?

নাহ্, তোমরা পারলেই তো ভালো।

ওর কথার ভঙ্গিতে সবাই হো হো করে হাসে।

সুবিমল চোখ পাকিয়ে বলে, তুই আমাদের ওপর ভরসা করতে পারছিস না?

পারছি তো। আমি কি বলেছি যে পারছি না।

ভ্যাঁ করবি না কিন্তু। কাঁদলে মেরে নাক উড়িয়ে দেবো।

ইশ, সাহস কত!

ফোঁস করে ওঠে অনুপ।

আমাদের হাতে বন্দুক দিয়ে দেখো না তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারি কি না? হয়ে যাক এক হাত।

বাব্বা, বুঝেছি তোরা বেশ পোক্ত হয়ে গেছিস। আয় ভাত খেয়ে নিই।

সবাই হৈ হৈ করে কলাপাতা নিয়ে বসে। অলকানন্দ আলুভর্তা বানায়। মরিচ, তেল, নুন দিয়ে ভর্তা। ওদের ঝোলায় অনেক কিছু আছে। ছেলেরা ভীষণ ফুর্তি করে পেট ভরে ভাত খায়। ওদের খুশির অন্ত নেই।

ভাত খেয়ে অনুপ বলে, আমরা তোমাদের কী ডাকবো? দাদা না কাকু।

দাদা ডাকবি। কাকু ডাকার মত বয়স হয়েছে না কি আমাদের?

আর কি দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে?

বোধহয় না। আমাদের এই ঝোলায় যা আছে সব দিয়ে দিলাম। নিয়ে যা।

তোমরা কোথায় যাবে?

এত কথা তোমাদেরকে বলা যাবে না।

সুমোহন তখন ওদেরকে বলে, চলো আমরা যাত্রা শুরু করি।

ছেলেরা শান্তিবাহিনীর সদস্যদের দেয়া ঝোলা কয়টা ঘাড়ে তুলে নেয়।

ওজন দেখে বুঝতে পারে যে, ওরা আরও দু'বেলা ভাত খেতে পারবে।

বিকেলের ছায়া নেমেছে গাছের মাথায়। নরম আলো চারদিকে। লড়াকু পাঁচজন ছেলে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওরা পেছন ফিরে ওদেরকে দেখতে পায় না। ওরা আবার নিজেদের পথে যাত্রা শুরু করে। প্রত্যেকের বুকের ভিতর থইথই আনন্দ। পেট ভরে ভাত খাওয়া হয়েছে। এই বনের ভিতর ভাত খাওয়া হবে- এমন চিন্তা তো ওরা কখনো করে নি। আজ বোধহয় একটা নতুন সূর্য উঠেছে আকাশে। পুরোনোটা ঠিকই মারা গেছে, তাই তো এমন অঘটন ঘটে গেলো ওদের জঙ্গলের জীবনে। ভাত খাওয়ার বাইরে প্রবল আশার কথা শুনেছে দীপকরাগ, হরিগোপাল, সুবিনয় ও অলকানন্দের কাছে। এদের মত আরও অনেক মিলে যদি পার্বত্যভূমি মুক্ত করতে পারে, তাহলে ওদেরকে আর বেশী দিন শরনার্থী ক্যাম্পে থাকতে হবে না। ওরা দেশে ফিরে আসতে পারবে।

শুদ্ধানন্দ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলে, ওহ্ দেশ! জন্মভূমি!

কী হলো তোমার?

স্বপ্ন দেখেছি।

জেগে জেগে কেউ স্বপ্ন দেখে?

এ স্বপ্ন তো ঘুমের ভেতরের স্বপ্ন না। এটা জেগে জেগেই দেখতে হয়।

ধুত, যত্তসব।

ঝাড়ি দেয়া অন্যায়। একসঙ্গে কথা বললে শব্দের তরঙ্গ ওঠে। সেই তরঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে সুমোহন মৃদু ধমক দেয়। বলে, তোমরা হট্টগোল করো না। তাড়াতাড়ি পা চালাও। বেলা থাকতে থাকতে আমরা অনেকটা পথ পার হয়ে যেতে চাই।

জঙ্গলের বিকেল তো খুব ছোট। হুট করে রাত হয়ে যায়।

হবেই তো। গাছ যে আলো খেয়ে ফেলে।

গাছের ভীষণ খিদে।

আমাদের লক্ষী ছেলের দল।

নিজেদের প্রশংসায় নিজেরা হো হো করে হাসে। একজন বলে, এত হেসো না। আশেপাশে আর্মির ক্যাম্প থাকতে পারে।

থাকুক। আমরা আর ভয় পাবো না।

বিষন্ন কণ্ঠে বুদ্ধজয় বলে, ওরা আমাদের সবাইকে একসঙ্গে মেরে ফেললে ভয় পাবো কেমন করে?

তাই তো ভয় পাওয়ার জন্য কেউই তো বেঁচে থাকবে না।

আবার বিষন্নতা ছড়ায় দলের মধ্যে। ওরা নির্বাক হয়ে যায়। ওদের পায়ের গতি কমে আসে। অকস্মাৎ ওরা ক্লান্তিবোধ করে। কিন্তু ওরা থামে না। মাথার উপর নরম আলো যতক্ষন পথ দেখাবে ততক্ষন ওরা হাঁটতে থাকবে। এই যাত্রায় ওরা কোথাও থামবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে। অরূপ এক সময় গা ঝাড়া দিয়ে নিস্তেজ কণ্ঠে বলে, আমার হাঁটতে খুব ভালো লাগছে।

আমারও। এবারও নিস্তেজ কণ্ঠ সুনীতের।

আমারও হাঁটতে ভালো লাগছে। আজ রাতে আমরা ঘুমাবো না। হাঁটতেই থাকবো।

অন্ধকারে হাঁটা যায় কি না সেটা আমাদের পরীক্ষা করতে হবে।

বেশ মজা হবে। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে বলতে পারবো যে আমরা অন্ধকারে হাঁটতে পারতাম।

ছেলে-মেয়ে?

অন্যরা হো হো করে হেসে ওঠে। তার অল্পক্ষনের মধ্যে হুট করে অন্ধকারে ভরে যায় জঙ্গল। কেউ আর এক পাও এগোতে পারে না। ওরা যতটুকু এসেছিলো সেখানে বোঁচকাবুঁকচি নামায়। কপাল ভালো যে জায়গাটা সুন্দর। বিশাল একটা গাছের নিচে ওরা ঠাঁই নেয়। গাছের ডালপালা মাটির নিচে ঝুঁকে আছে। মনে হয় গাছটা চারদিকে বেড়া দিয়ে মাঝখানটা ঘর করেছে। ওরা গুঁড়ির চারপাশে জায়গা করে শুয়ে পড়ে। অল্পক্ষণ পরেই ওরা ঘুমিয়ে যায়।

সকালে ঘুম ভাঙলে পিঁপড়ার বাসাটা প্রথমে নজরে পড়ে সুশান্তের। ও শুয়ে থেকেই দেখতে পায় পাতাগুলো একটার সঙ্গে আর একটা চমৎকার গেঁথে বাসা তৈরী করেছে লাল রঙের বড় পিঁপড়া। ওর মনে হয় এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়াই ভালো। এগুলো যদি কামড়ায় তাহলে তবে শরীর ফুলে উঠবে। বিষাক্ত পিঁপড়া এগুলো। ওগুলো কি দিনের আলো ফুটলে বাসা ছেড়ে বের হবে। কে জানে। ভয়ে সুশান্তের শরীর শিরশির করে। অন্যরা নি:সাড় ঘুমুচ্ছে। কিন্তু ঘুম আসে না সুশান্তের। ও ওঠে, বসে থাকে। পিঁপড়ার বাসাটার দিকে খেয়াল রাখে। পিঁপড়াগুলো বেড়িয়ে পড়ার আগেই ও সবাইকে জাগিয়ে দেবে। অল্পক্ষণ পরে সুমোহন ওকে বসে থাকতে দেখে বলে, কী হয়েছে? জেগে আছো কেন?

ও ফিসফিসিয়ে বলে, ওই যে ওদের মাথার উপর একটা পিঁপড়ার বাসা। যদি পিঁপড়ার ঝাঁক নেমে আসে নিচে! সুমোহন বাসাটা দেখে বলে, ওটার মধ্যে পিঁপড়া নাই।

নাই? আপনি কী করে জানলেন?

যতক্ষন পর্যন্ত পাতাটা সবুজ থাকে ততক্ষন ওগুলো বাসায় থাকে। পাতা শুকিয়ে খয়েরি হয়ে গেলে ওই বাসা ছেড়ে চলে যায়।

কেন?

কারণ যতক্ষন পাতাগুলো সবুজ থাকে ততক্ষণ পাখিরা বুঝতে পারে না যে ওগুলো গাছের পাতা না পাখির বাসা। খয়েরি হয়ে গেলেই পাখিরা বুঝতে পারে যে ওটা পিঁপড়ার বাসা। তখন ওরা ডিম খাওয়ার জন্য বাসাটা আক্রমন করে।

বাব্বা, এতকিছু! তাহলে আমি এই সুন্দর বাসাটা ডাল থেকে ছিঁড়ে নেবো।

কী করবে?

এমনি রেখে দেবো। নেবো?

নাও। এখনি ভেঙে নিয়ে নাও।

সুশান্ত লাফ দিয়ে উঠে। পুরো ডালটা ভেঙে বাসাটা নামায়। ওটা ফাঁকা। পিঁপড়েরা পালিয়েছে। ওরা হয়তো এখন অন্য জায়গায় বাসা বানাতে ব্যস্ত। ও ডালটা এক জায়গায় গুছিয়ে রাখে। যাওয়ার সময় ওটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে যাবে। বেশ হবে।

সবাই ঘুম থেকে উঠলেও ঘুম থেকে ওঠে না শুভজ্যোতি। কিশলয় ওকে আলতো করে ধাক্কা দিয়ে বলে, শুভ ওঠো। আমাদের যাওয়ার সময় হলো।

উঠতে গিয়ে আবার ঢুপ করে পড়ে যায় ও। চেঁচিয়ে বলে আমি তো পা নাড়াতে পারছি না। ভীষণ ব্যাথা। সুমোহন কাছে এসে দেখে শুভজ্যোতির পা ফুলে গেছে। ভয়ে ওদের গা হিম হয়ে যায়। এই ছেলেকে নিয়ে কেমন করে এগোবে ওরা? এখন কী হবে? সব ছেলেরা শুভজ্যোতিকে ঘিরে ধরে। শুভ কাঁদতে শুরু করে। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে। সবাই ওকে কাঁদতে নিষেধ করে, কান্না থামাতে বলে, কিন্তু শুভজ্যোতি কারো কথা শোনে না। ও কাঁদতেই থাকে। বনজুড়ে কান্নার ধ্বনি ছড়াতে থাকে।

কেউ একজন বলে, তুই এত কাঁদছিস কেন শুভ?

ও উত্তর দেয় না। কারো দিকে তাকায় না।

তোর খিদে পেয়েছে শুভ?

ও এ্যাঁ এ্যাঁ করতে করতে, না।

জল খাবি?

ও একই ভঙ্গিতে বলে, না।

তুই এবার থাম শুভ। আর্মির লোকেরা তোর কান্না শুনতে পেলে আমাদেরকে মেরে ফেলবে।

আমি তো মরে যাচ্ছি। আমি আর বাঁচবো না।

কান্না থামে না শুভজ্যোতির। মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে সুমোহন। অনেক্ষন পর শুদ্ধানন্দ ওর পাশে এসে বসে। বলে, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

সুমোহন ঘুরে তাকায়। ভুরু উঁচিয়ে বলে, কী?

আমরা একটা খাটিয়া বানাবো শুভকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কীভাবে খাটিয়া বানাবো? বাঁশ কই? দড়ি-দড়া কই?

বাঁশ লাগবে না। গাছের মোটা ডাল ভেঙে নেবো। আর ওই যে গিলাপটা ঝুলছে ওগুলো পেঁচিয়ে দড়ি বানাবো। বেশ মজবুত দড়ি হবে। মোটা ডালের মাঝখানটায় গিলাপটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধবো, যেন ওটার উপর ওকে শোয়ানো যায়। তারপর আমরা ওকে কাঁধে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করবো।

এসব করতে করতে দুপুর হয়ে যাবে।

তারও বেশী সময় লাগতে পারে। আজ রাতে আমাদের এখানেই থাকতে হবে। দুপুরের জন্য আমরা ভাত রান্নার ব্যবস্থা করবো।

সুমোহন শুদ্ধানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও বেশ বয়স্ক পুরুষের মতো সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। এই বুনো পথের যাত্রা ছেলেদের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের ডেকে শুদ্ধানন্দ এসব করার কথা আলাপ করলে ছেলেরা বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শুভজ্যোতির মুখে হাসি ফোটে। ও ম্রিয়মান স্বরে বলে, আমি ভেবেছিলাম সবাই বুঝি আমাকে ফেলে রেখে চলে যাবে। সে জন্যই আমার কান্না থামাতে পারছিলাম না।

বুদ্ধজয় হাসতে হাসতে বলে, তুমি দিব্যি আমাদের ঘাড়ে চড়ে বনের রাস্তাটা পার হয়ে যাবে।

ওকে খাটিয়ায় টানতে আমাদের একটুও কষ্ট হবে না। ও যে শুকনো-পাতলা।

ভাগ্যিস শুকনো-পাতলা হয়েছিলাম। নইলে আমার কী যে হতো! ফিক করে হেসে ফেলে শুভজ্যোতি।

ছেলেরা দুপুর পর্যন্ত খেটে-খুটে একটা খাটিয়া বানায়। চমৎকার খাটিয়া। এক একবার এক একজন ওটার ওপর ওঠে আর শুয়ে পরীক্ষা করে। লাফিয়ে দেখে ছিঁড়ে পড়বে কি না। এমন একটা সুন্দর জিনিস বানাতে পেরে ওরা সবাই খুশি। আর একদল ভাত রান্না করেছে। আলুভর্তা বানিয়েছে। শুভজ্যোতি ফোলা পা নিয়ে উঠে বসেছে। খানিকটুকু ব্যথা কমেছে বলে বলছে, কিন্তু পা নাড়াতে পারছে না। হাঁটতে পারবে কবে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। সুমোহনের ভীষণ ভাবনা হচ্ছে। ছেলেরা হুটোপুটি করে ভাত খায়। শুদ্ধানন্দ সবাইকে কলাপাতায় ভাত তুলে দেয়। মাথা গুনে আলুভর্তার গোল্লা বানানো হয়েছে। ভাতের সঙ্গে ওরা একটি করে গোল্লা পায়। খাওয়াটা যে কত আনন্দের হতে পারে এই জঙ্গল পাড়ি দিতে না হলে ওরা বুঝতে পারতো না। এখন খাওয়া মানেই উৎসব।

খেয়ে-দেয়ে ওদের আবার যাত্রা শুরু হয়। ছেলেরা প্রথমদিকে মহা উৎসাহে খাটিয়া টানে কিন্তু অনেকটা পথ যাওয়ার পরে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বার বার বিভিন্নজনে খাটিয়া টানার পরও ওরা বেশিদূর এগোতে পারে না। ওদের খিদে পায়। তৃষ্ণা পায়। হাঁপিয়ে ওঠে। সুমোহনের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে শুদ্ধানন্দ বলে, আপনি একটুও ভাববেন না। আমরা না হয় থেমে থেমেই যাবো। না হয় কয়েকদিন দেরী হবে আমাদের সীমান্তে পৌঁছাতে। কী হবে দেরী হলে? তবু তো আমরা শুভজ্যোতিকে নিয়ে যেতে পারবো।

আমরা একটু ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি মাত্র। কিন্তু আমরা বিরক্ত হইনি।

আর একজনে বলে। সুমোহন ওদের কথা শুনে লজ্জাই পায়। তাই তো, এ কথা ওর নিজেরই বলা উচিত ছিলো, কিন্তু বললো ছেলেরা। ছেলেদের উৎসাহে ও নিশ্চিত হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ও নিজে খানিকটা মুষড়ে পড়েছে। তখন কে যেন চেঁচিয়ে বলে, চলো আমরা মারফা খুঁজে আনি। আমি দূর থেকে মারফার লতা দেখেছি। নিশ্চয় দু'চারটে মারফা পাওয়া যাবে।

ছেলেরা মারফা খুঁজতে ছুটে যায়। মারফা শশার মতো খেতে পারবে ওরা। ভালোই হবে। সুমোহন শুভজ্যোতির কাছে বসে থাকে। গিলাপটার সবুজ বিছানায় ওকে দেবশিশুর মতো দেখাচ্ছে। সবাই দৌড়ে এদিক ওদিক চলে গেলে শুভজ্যোতি কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি ওদের সঙ্গে যেতে পারলাম না। আমি কি আর ভালো হবো? না কি ভালুক খেয়ে ফেলবে আমাকে?

এমন করে ভাবছো কেন তুমি? আমরা তো তোমাকে দেখা-শোনা করছি।

আমি তো সবাইকে কষ্ট দিচ্ছি।

তুমি এসব ভাবছো কেন? ধরো অন্য কেউ তোমার মতো অসুস্থ হলো, তখন তুমি তার জন্য করতে না?

করতাম। না করে থাকতেই পারতাম না।

তাহলে ভেবে দ্যাখো ওরা তোমার জন্য এমনই ভেবেছিলো। কী চমৎকার একটা খাটিয়া বানিয়েছে তোমার জন্য। আমার মনে হয় আমি এটার মধ্যে শুয়ে থাকি।

ফিক করে হেসে ফেলে শুভজ্যোতি। শিক্ষক এমন কথা বললে কে না মজা না পায়। তারপর আকস্মিকভাবে বিষন্ন হয়ে বলে, আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে? পুষ্টুমনি কি বেঁচে আছে? নাকি ও আগুনে পুড়ে গেছে। বাবা তো আমাকে আশ্রমে পাঠিয়ে ভেবেছিলো সবাই মরে গেলেও আমি বেঁচে থাকবো। কিন্তু কী হলো? একদম উল্টো ঘটনা ঘটলো। আমিই মরতে বসেছি। এই জঙ্গল থেকে আমি আর বের হতে পারবো না।

আমরা নিশ্চয় বের হতে পারবো। আমাদের পথ আর বেশী দূরে নয়। ছেলেরা ফিরলে আমি জঙ্গলের ম্যাপটা খুলে বসবো। দেখাবো আর কতটা পথ বাকি।

সবার হাতে একগাদা মারফা। ছেলেরা মরফা নিয়ে হৈচৈ করতে করতে ফিরে এসেছে।

এত মারফা এক জায়গায় হয় তা আমরা ভাবতেই পারছি না। এই মারফা খেয়ে আমরা দু'দিন কাটিয়ে দিতে পারবো।

দ্যাখো বেশিরভাগই কচি মারফা। খোসাসহ চিবিয়ে খেতে আমাদের একটুও অসুবিধে হবে না।

তুমি একটু খাবে শুভ?

হ্যাঁ খাবো। দেখে ভীষণ লোভ হচ্ছে।

একটা মারফা খেলে নিশ্চয় আমার পায়ের ব্যথা কমে যাবে। আমি ঠিকই উঠে দাঁড়াতে পারবো।

ছেলেরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, শুভজ্যোতির জয় হোক। আমাদের শুভ ভালো হয়ে উঠুক।

শুভ উজ্জ্বল চোখে সবার দিকে তাকায়। মারফায় কামড় দেয়ার আগে বলে, তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো?

আমরা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

নুনের মতো ভালোবাসি।

চিনির মতো ভালোবাসি।

মধুর মতো ভালোবাসি।

আমিও তোমাকে এই বনের মতো ভালোবাসি।

পাহাড়ি ছড়ার মতো ভালোবাসি।

পাহাড়ের মতো ভালোবাসি।

এই মারফার মতো ভালোবাসি।

সবাই মিলে মারফা খায় আর মজা করে। ওদের ইচ্ছা আজ রাতটা ওরা এখানে থেকে যাবে। শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাবে। সবাই মিলে আগুনে শুকনো পাতা ফেলবে। হাত ধরাধরি করে গান করবে। বলবে, ভগবান, আমাদের দিনগুলো ঠিক করে দাও। ভগবান, এইসব বোঝা টানার জন্য আমরা যথেষ্ট বড় হইনি। ভগবান, আমরা শান্তিতে থাকতে চাই। আমরা আমাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে আমাদের ছোটবেলার দিনগুলো কাটাতে চাই।

=ছয়=

ওরা এখন সীমান্তে পৌঁছে গেছে।

শুভজ্যোতির পায়ের ব্যথা ভালো হয়েছে। ও হাঁটতে পারছে। আর কারও কোন অসুবিধা নাই। সুমোহন খুশি যে ছেলেরা ভালো আছে। কারো শারিরীক সমস্যা নেই। ওদের মনও ভালো। বনের লম্বা পথ পার হয়ে সীমান্তে পৌঁছাতে পেরেছে। এখন সীমান্ত রক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে একে একে সীমান্ত পার করতে হবে। ওদেরকে একটু

দূরে একটা ঝোপের আড়ালে বসে থাকতে বলে সুমোহন। ছেলেরা একে অপরের দিকে তাকায়।

একজন বলে, আমার দেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমারও ইচ্ছে করছে না।

সময়টা ভারী অদ্ভুদ লাগছে। মনে হচ্ছে আমি কোথাও নেই। কোথাও ঠাঁই হবে না। শরনার্থী শিবিরে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগবে না।

আমার তো নিজের দেশ আছে। তাহলে আমরা শরনার্থী শিবিরে থাকবো কেন?

আমি যাবো না।

আমিও যেতে চাই না।

না গেলে আমাদের মরতে হবে।

এখন আর আমাদের ফেরার কোনো উপায় নেই।

আমরা ত্রিপুরা সীমান্তে পৌঁছে গেছি।

আমাদেরকে ত্রিপুরায় ঢুকতেই হবে।

নইলে আমাদের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই।

আবার মৃত্যুর কথা শুনে চুপ করে যায় সবাই। শব্দটা শুনে ওরা ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়ে। মনে হয় এক লাফে চলে যায় ওপারে-যেখানে তাকুমবাড়ি শরণার্থী ক্যাম্প আছে। সাবরুম, শিলাছড়ি, খরবুক, কাঁঠালছড়ি ক্যাম্পে ওদের আত্মীয়স্বজন আছে। কাকে যে কোথায় যেতে হবে তা ওরা জানে না। সবার ভীষণ মন খারাপ হয়। একজন পোঁটলা খুলে জংলি জাম বের করে বলে, আয় আমরা জাম খাই।

আমাকে একমুঠ দে।

আমাকেও।

আমি খাবো না।

আমার খিদে পায় নি। ভয় পেলে আমার খিদে পায় না।

আমার পেট ব্যথা করছে।

চুপ কর্। কেউ আর একটি কথা বলবি না।

সীমান্ত রক্ষীদের অবস্থান লুকিয়ে দেখে এসে সুমোহন বলে, আমরা বিকালটা এখানেই বসে থাকি। সন্ধ্যা হলে লুকিয়ে লুকিয়ে ওপারে চলে যাবো। কেউ টের পাবে না।

ছেলেদের অনেকে অবসন্নের মতো মাটিতে শুয়ে পড়ে। সুমোহন বলে, এটা মন্দ নয় যে তোমরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আমরা গভীর রাতে সীমান্ত পার হবো। তখন ওদের চোখেও ঘুম থাকবে। ওরা নিশ্চয় আমাদের তেমন করে খেয়াল করবে না।

ছেলেদের কথা শুনতেও ভালো লাগে না। ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। কেউ কেউ ভাবে, ক্ষুধা-দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ঘুমটাই একমাত্র উপায়। এখন ওদের আর কিছুই করার নেই।

গভীর রাতে ওরা জেগে ওঠে।

নি:শব্দ নড়াচড়ায় ওরা তৈরী। অনেকটা যন্ত্রের মতো হয়ে গেছে ওরা। সুমোহন ওদের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, তোমরা পরস্পরের হাত ধরে সামনে এগোতে থাকবে। আমি সবার পেছনে থাকবো। কেউ যেন দলছুট হতে না পারে সেটা খেয়াল করবো। তোমরা সবাই ঘুম থেকে জেগেছো তো?

হ্যাঁ, শব্দটা তরঙ্গের মতো বয়ে যায় দলের ভেতরে।

তাহলে চলো আমরা সীমান্ত পার হই।

ছেলেরা জানে সীমান্ত মানে দেশের সীমানা। ওটা পার হয়ে অন্য দেশে ঢুকতে হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত ধরেছে। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। বেশ খানিটা দূরে সীমান্ত গ্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। ওরা ওদের দেখতে পায়নি।

চারদিকে অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। শুধু লক্ষ তারা জ্বলজ্বল করছে। এ পথে বন নেই। তাই অন্ধকার গাঢ় নয়। তবু ওদের যেতে হচ্ছে। যেদিকেই যাক না কেন,একটা না একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবেই ওরা। সে জায়গাটা ওদের জন্য নিরাপদ হবে। অন্তত আগুন আর গুলি থাকবে না।

ছেলেরা কেউ কেউ কাঁদছে। ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাতের নিস্তব্ধতায় ওটা বড়বেশি স্পষ্ট। তবু কেউ ওদের ধমক দেয় না এবং কান্না থামাতে বলে না। সবার মনে হয় ওরা তো কাঁদবেই। এখন কাঁদারই সময়। একমসয় দেখা যায় কান্না থামছেই না, সেটা আরও বাড়ছে। একে একে সবাই কাঁদতে শুরু করেছে। চুপিচুপি শব্দহীন কান্না।

একসময় সুমোহন বলে, আমরা বোধহয় এখন বিপদমুক্ত। আমরা অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছি। তাকিয়ে দেখো সীমান্ত রক্ষীদের পোস্টের আলো কত ছোট দেখাচ্ছে।

ছেলেরা এক সঙ্গে সবাই বেশ শব্দ করে বলে- বিদায় স্বদেশ। আমরা একদিন ফিরে আসবো।

লেখক পরিচিতি

প্রথম অংশ

১. **কবিতা চাকমা :** অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আদিবাসী লেখক। জন্ম রাংগামাটিতে। বুয়েটে স্থাপত্য বিষয়ে পড়াশোনার পর অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চতর বিষয়ে আরও পড়াশোনা সমাপ্ত করেন।

২. **দেবাশীষ ওয়াংঝা :** লেখক চাকমা রাজা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের আইনজীবি ও ব্যরিস্টার (লিংকন্‌জ ইন লন্ডন) ও জাতি সংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্য।

৩. **"পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক গনজাগরণ এখন জরুরীভাবে প্রয়োজন"** জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল (জাক) এর সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকার [জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল সংক্ষিপ্তভাবে **'জাক'** নামে সবার কাছে পরিচিত। এটি- তিন পার্বত্য জেলার একটি বহুল পরিচিত সাংস্কৃতিক সংগঠন। তিন পার্বত্য জেলাতেই জাক এর সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সংগঠনের কর্মকান্ডও তিন পার্বত্য জেলাতেই বিস্তৃত।

৪. **অধ্যাপক ড. মানিক লাল দেওয়ান :** ড. মানিক লাল দেওয়ানের জন্ম ১ জানুয়ারী ১৯৩৫ খ্রীঃ, রাঙ্গামাটিতে। তিনি ১৯৫২ খ্রীঃ রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে School Final (Science side) পাশ করেন এবং ১৯৫৮ খ্রীঃ তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান কলেজ অব ভেটেরিনারি সাইন্স থেকে Bsc. (A.H) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৫৮ খ্রীঃ এনিম্যাল হাজবেন্ড্রী অফিসার, কুমিল্লা ও ১৯৫৯ খ্রীঃ পূর্ব পাকিস্তান ভেটেরিনারি কলেজে সহকারী প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৬১ খ্রিঃ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের USAID বৃত্তি লাভ করে ১৯৬৪ খ্রিঃ Texas A & M University থেকে M.S. in Pathology ডিগ্রী অর্জন করেন। Armed Forces Institute of Pathology, Washington DC থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষ করে ১৯৬৪ খ্রিঃ তদানীন্তন East Pakistan Agricultural University - তে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৮ খ্রিঃ তদানিন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের বৃত্তি লাভ করে মস্কো ভেটেরিনারি একাডেমী থেকে

১৯৭১ খ্রিঃ Ph. D in Veterinary Pathology ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭২ খ্রিঃ ড. দেওয়ান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৭৩ খ্রিঃ প্যাথলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৮১ খ্রিঃ অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে ১৯৮২-৮৪ খ্রিঃ ভেটেরিনারি ফ্যাকালটির ডীনের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে পশুসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০০৪ খ্রিঃ বাংলাদেশ একাডেমী অব এগ্রিকালচার কর্তৃক Dr. S. D. Chowdhury Gold Medal এ তাঁকে ভূষিত করা হয়। ড. দেওয়ানের স্মৃতি রক্ষার্থে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার ব্যবহৃত অফিস কক্ষটিকে Prof. M. L. Dewan Conference Room নামকরণ করে।

৫. **শান্তি কুমার চাকমা :** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,এ পাশ করার পর, লেখক বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক, পালি, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ। ইমেইল ঃ skc_bd@yahoo.com

৬. **প্রশান্ত ত্রিপুরা :** পেশাগত জীবনের শুরুতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানের শিক্ষ ছিলেন, পরে দীর্ঘ একযুগ ধরে উন্নয়নখাতে পরৈনকালীন কাজ করার পর নুতন করে আবার খন্ডকালীন শিক্ষকতা, সবস্তরে লেখালেখি ও গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। ইমেইল ঠিকানাঃ prashanta.tripura@gmail.com

৭. **ঝুমা দেওয়ান :** ঝুমা দেওয়ান বর্তমানে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি' প্রকল্পে জেন্ডার গুচ্ছের পরিচালক (ক্লাস্টার লিডার) হিসাবে কর্মরত। তিনি পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে অস্ট্রেলিযার ক্যানবেরাস্থ অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে এম,এ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। **সিনোরা চাকমা :** সিনোরা চাকমা একজন ফ্রিল্যান্স উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং বর্তমানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সাহায্যপুষ্ট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ক পরামর্শক হিসাবে কর্মরত। তিনি অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ বিশ্লেষন বিষয়ে এম.এ ডীগ্রি প্রাপ্ত।

8. **Arshi Dewan-Roy :** is PhD candidate at York University and currently lives in Toronto, Canada.

9. **Prof. Mong Shanoo Chowdhury :** Prof. Mong Shanoo Chowdhury taught several decades in Rangamati College in economics. Since his retirement, he remains involved a number of civil society organizations on the issues of civic awareness, peoples' access to land and natural resources and tenurial security over land by the CHTs' indigenous

peoples. He is Vice Chairperson of the CHT Citizen's Committee, a civil society platform that advocates for the rights of the CHTs' indigenous peoples.

10. **Sugata Chakma :** Sugata Chakma is an eminent writer in adivasis langua (chakma) and is the former Director of the Tribal Cultural Institute (TCI), Rangamati. He has more than a dozen publications in his name in Chakma, his native language and Bengali along with numerous articles, published in reputed journals in Bangladesh and abroad. He was written numerous poems and songs which are popular tunes across the Chittagong Hill Tracts.
11. **Meghna Guhathakurta :** Meghna Guhathakurta is Executive Director of Reearch Initiatives, Bangladesh (RIB). Prior to this, she was Professor of International relations at the University of Dhaka. Her area of specialization is development, gender, minority rights and South Asian politics. She has extensively published on Aid politics, women's movement and peace-building in post-conflict CHT. *The article was previously published in Contesting Nation: Gendered Violence in South Asia: Notes on the Postcolonial present edited by Angana P. Chatterji and Lubna Nazir Chaudhry published by Zubaan, New Delhi, 2012 pp.173-193.* It is re-printed here with the author's permission.
12. **Bina D'costa** is a research fellow at the Centre for International Governance and Justice at Australian National University.
13. **Ven. Bhikkhu Bodhi :** Ven. Bhikkhu Bodhi is an American Buddhist monk, well-known as a translator of Pali Buddhist texts. He is the president of BAUS (Buddhist Association of the United States) and also the founding chair of Buddhist Global Relief, an organization dedicated to helping communities worldwide afflicted with chronic hunger and malnutrition

দ্বিতীয় অংশ

1. **Ven. Mujin Sunim :** Ven. Mujin is a Buddhist nun from Switzerland and President of Douglas W. Campbell Foundation, USA.
2. **Pierre Marchand** is the founder director of the French non-governmental organization Partage.
3. **Sueti Zadjian** was adopted by a French family from CHT and currently lives in southern France.
4. **Elisabeth and Paul Nicholas :** The Nicholas' are a foster parents of a boy they adopted from CHT, from the refugee camp, India.
5. **Martine and Bernard Zadjian :** The Zadjians are the foster parent of Sueti Zadjian. They live a retiree life in Martigues, southern France.
6. **Marie-Claude and François Rubin** are foster parents of Arun Jyoti and Lakkhi Shanti, two boys they adopted from CHT. They also run the French voluntary association, "Peuples des Collines".
7. **সদ্ধর্মাদিত্য ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথের :** জন্ম ১৯২৫ সালে। তিনি এখন বাংলদেশের উপসংঘ রাজ। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম শহরের নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করছেন। তার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলায় বোয়ালখালী দশবল বৌদ্ধ রাজ বিহারকে কেন্দ্র করে ***পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম*** ও রাঙ্গামটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলায় রাঙ্গাপানি মিলন বিহারকে কেন্দ্র করে ***মোনঘর***'সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।
8. **ডাঃ পরশ খীসা :** রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জনের পর দীর্ঘদিন মোনঘরে আবাসিক চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে রাঙ্গামাটির "শেভরণ এন্ড ডক্টরস ল্যাব" এর সত্বাধিকারী।
৯. **ছানোঅং চাক :** মোনঘরের প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে নাইক্ষ্যংছড়ি ছালেহ আহমদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান এ সিনিয়র সহকারি শিক্ষক হিসাবে কর্মরত।
10. **সেলিনা হোসেন :** স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিক। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসের সংখ্যা দুই ডজনের বেশী। সাম্প্রতিক সময়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল তিনি। তাঁর লেখা গল্প উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর; গায়ত্রী সন্ধ্যা, হাঙর নদী গ্রেনেড, মগ্ন চৈতন্যে শীষ, যাপিত জীবন, পোকামাকড়ের ঘরবসতি ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সৃষ্টির তালিকায় ইতোমধ্যেই অন্তর্ভূক্ত।